সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)

কারওয়ানে মদীনা

(10) کاروانِ مدینہ از سید ابوالحسن علی ندویؒ

مترجم: شاہ دبدالحلیم حسینی

ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

অনুবাদঃ শাহ্ আবদুল হালিম হুসাইনী

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কারওয়ানে মদীনা
মূলঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.)
অনুবাদঃ শাহ্ আবদুল হালিম হুসাইনী

প্রকাশ কাল
অগ্রায়হণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
মহররম, ১৪৩৪ হিজরী
ডিসেম্বর, ২০১২ ঈশায়ী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোনঃ 02-712-11221; সেলঃ 01822-806163

কম্পিউটার কম্পোজ
মারজিয়া কম্পিউটারস্
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 978-984-90178-7-5

বিনিময় ঃ অফসেটঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র।
সাদা ঃ ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Karwanay Madina : Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi in Arabic, translated by Shah Abdul Halim Husatny into Bengali and Published by Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100; Bangladesh. Phone: 02-712-1121; Cell: 01822-806163
E-mail: roufster@gmail.com website: www.muhammadbrothers.com
Price: Tk. 300.00 (off-set) & 260.00 (white print); U.S. $ 12.00 only.

প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার। দরূদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদে আরাবী (সা) এর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সাহাবাদের উপর।

ঈসায়ী ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যখন বিশ্বব্যাপী সামাজিক বিপর্যয়, নৈতিক অবক্ষয়, মানব মনের চরম অস্থিরতা, আত্মবিকৃতি ও আত্মহত্যার সীমা ছাড়িয়ে যায়, ঠিক তখনই নবুওয়াতে মুহাম্মাদী (সা) এর সূর্য সর্বপ্রথম উদিত হয়। ফলে মাত্র তেইশ বছরের ব্যবধানে এ দৃশ্য পাল্টে যায়। পর্যায়ক্রমে এর আলো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বব্যাপী। আজ পৃথিবী জুড়ে যে চরম বিপর্যয় পরিলক্ষিত হচ্ছে গোটা মানবতা যেভাবে আর্তনাদ করছে এর একমাত্র কারণ মুহাম্মদ (সা)এর আদর্শ তথা কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিমুখতা। আজও যদি মানবজাতি মুহাম্মদ (সা) এর আদর্শ গ্রহণ করে তাহলে আবারও সেই সোনালী প্রভাত ফিরে আসবে। উম্মাহ ফিরে পাবে উত্তরণের রাজপথ।

কারওয়ানে মদীনা বইটি সীরাত বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধের সমন্বিত রূপ। এতে সীরাতে মুহাম্মাদীর বিভিন্ন দিক ও বিষয়, তার ইহসান ও অবদান, তার বিশ্বজনীন বিস্ময়কর প্রভাব ও ফলাফলের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। লিখেছেন একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ, আন্তর্জাতিক দাঈ ও মুবাল্লিগ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি তাঁর গভীর ইশক ও মহব্বত থাকার কারণে তিনি এতে সফল হয়েছেন শতভাগ।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এমন একটি বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। দীর্ঘদিন যাবত বাংলাভাষী মুসলমান ভাইবোনদের জন্য বইটি প্রকাশ করার আগ্রহ লালন করে আসছিলাম। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রশংসা করছি।

বইটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম, লেখক, অনুবাদক শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী। এজন্য তাকে ধন্যবাদ। এতে তিনি কতটুকু সফল হয়েছেন, পাঠকরা তা মূল্যায়ন করবেন।

সুপ্রিয় পাঠক! আমরা বইটিকে সার্বিকভাবে সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করেছি। এতদসত্ত্বেও ভুল ত্রুটি থাকা অবাস্তব কিছুই নয়। তাই বিনীত আরয থাকবে আপনার সুন্দর পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়ে আমাদের কৃতার্থ করবেন।

পরিশেষে দুআ করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তার হাবীবের সীরাতকে জীবন চলার পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার তাওফীক দান করেন। ইহকালীন ও পরকালীন সফলতার মাধ্যম বানান। আমীন।

৩০.১১.০৮ খ্রী.

প্রকাশক

অনুবাদকের আরয

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

'কারওয়ানে মদীনা' বা মদীনার কাফেলা। লিখেছেন মুফাক্কিরে ইসলাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)। মূলতঃ বইটি সীরাতুন্নবী (সা) বিষয়ক কয়েকটি আরবী প্রবন্ধের সমষ্টি। যা প্রথমত 'আত্ ত্বরীক ইলাল মদীনা' বা 'মদীনার পথে' নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তা উর্দু ভাষায় 'কারওয়ানে মদীনা' নামে প্রকাশিত হয়। বইটি আরব বিশ্বসহ গোটা পৃথিবীতে খুবই সমাদৃত হয়। এটা লেখকের এখলাস ও সীরাতের বরকত বৈ কিছুই নয়। এতে লেখক অত্যন্ত আবেগ ও দরদ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) এর শিক্ষা, পয়গাম, উপহার, ইহসান এবং তার বিশ্বজনীন ফলাফলের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রতিটি প্রবন্ধে রাসূল (সা) -এর প্রতি লেখকের ইশক ও মহব্বতের নিদর্শন ফুটে উঠেছে। বইটি পাঠ করলে যে কারো মধ্যে উথলে উঠবে নবী প্রেম, অজান্তেই গড়িয়ে পড়বে অশ্রু। মন ছুটে যাবে মদীনার সবুজ গম্বুজের আঙ্গিনায়, জাবালে নূর ও হেরা পর্বতের গুহায়। অনারব কবিদের কবিতা পাঠের কাল্পনিক আসরটিও আরো আপ্লুত করবে। বইটির প্রয়োজনীতা অনুভব করে আমি বইটির অনুবাদ করি। লেখকের কলবের উত্তাপ ও কলমের গতি আমার নেই। কিন্তু বলতে পারি চেষ্টার ত্রুটি করা হয়নি। অনুবাদের ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি থাকাই স্বাভাবিক। সেজন্য পাঠকদের সহানুভূতি ও নির্দেশনা কামনা করছি।

সীরাতুন্নবী (সা) -এর খেদমতের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদাবনত হচ্ছি।

নদভী (র)-এর বহু গ্রন্থের সৃজনশীল প্রকাশক জনাব মুহাম্মদ আবদুর রউফ সাহেব বইটি প্রকাশ করে আমাকে ধন্য করেছেন। এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা আইয়ুবুর রহমান ও মুফতী আমীরুল ইসলাম কাসেমীর প্রতি। আল্লাহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

বিনীত

৩০.১১.০৮ খ্রী. শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী

বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক আল্লামা আলী তানতাভী (র) -এর

ভূমিকা

বিসমিহী তা'আলা

মুহতারাম ভাই আবুল হাসান আলী নদভী!

আমাদের এখানে সিরিয়ার জনগণের মাঝে শিরোনাম দেখেই আসল ব্যক্তি বা বিষয় চিনে নেওয়ার একটি রীতি আছে। নদভী (র) এর কিতাবের নাম "আত তরীক ইলাল মদীনা"। তা খোলার পূর্বেই আমার ভেতরে জীবনের এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে দেয়। আমার কাছে মনে হয়, এই শিরোনাম আমাকে স্বীয় জীবনের দীর্ঘ সফরে তেত্রিশ বছর পিছনে নিয়ে গেছে। পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ শতক পিছনে। আমি দেখতে পেলাম, আমি হিজাযের মরুভূমিতে অবস্থান করছি। আমি এবং আমার বন্ধুরা সেখানে পঞ্চাশ দিন কাটিয়েছি। এই প্রস্ত রাকীর্ণ মরুপ্রান্তরে। উপরে ক্ষীপ্র সূর্য। নিচে উত্তপ্ত টগবগে বালি। এক টিলা দিয়ে আমরা অতিক্রম করছিলাম। সহসা এক বালুকাময় প্রান্তরে হারিয়ে গেলাম। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গেছে। পথ হারানোর ভয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত। আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা একই আশা-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। আর তা হল, আমরা যেন মদীনা শরীফ যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করি।

প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা মদীনার পথে আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিলাম। পথ হারিয়ে আমরা ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট-যাতনা উপভোগ করেছিলাম। চোখের সামনে মৃত্যু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। ক্লান্তি, অবসাদ ও ভীতির তিক্ত স্বাদ ঢোকে ঢোকে পান করছিলাম। এমনকি পূর্ণ দিন কেটে গেল। আমাদের সঙ্গে একজন বদ্দু রাহবার ছিলেন। যার মুখে তালা ঝুলতে থাকত। মাঝে মধ্যে নানা থিউরী নির্গত হত। সহসা তার ক্লান্ত চেহারায় চৈতন্য ও চঞ্চলতা ফিরে আসে। জিহ্বা নড়তে শুরু করে। তিনি একটি বাক্য আবৃত্তি করলেন। তখন যদি স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি উপহার দেওয়া হত, তবে আমার কাছে এই বাক্য অপেক্ষা বেশি প্রিয় হত না। সেই বাক্য, যা আমাদের আশঙ্কা-ভয়কে প্রশান্তি, আমাদর ক্ষুৎ-পিপাসাকে পরিতৃপ্ত ও প্লাবিত এবং আমাদের ক্লান্তি-অবসাদকে আরাম ও সুখে বদলে দিয়েছে –এ ছিল একটি যাদু। আরও ছিল তাতে অপার মোহিনী শক্তি। (যদি মনে করেন, শব্দমালায়ও যাদু থাকে!) ঐ গ্রাম্য লোকটির বাক্য ছিল- هذا لحد (এ হল উহুদ!) আপনি এবার একজন মরুপ্রেমিকের অবস্থা কল্পনা করুন। যার উপর কষ্ট ও পাথরের একটি দীর্ঘ যুগ অতিবাহিত হয়েছে। যাকে প্রেম-আবেগের ব্যাধি মুমূর্ষু করে দিয়েছে। তারপর হঠাৎ তাকে খবর দেওয়া হল, এই তোমার প্রিয়ের ঘর।

মনে রাখুন, তা মাটির দেহের সাথে সম্পৃক্ত প্রেম। আর এটি আত্মার প্রেম-আসক্তির ব্যাপার। তা পার্থিব আশা-চাওয়া-পাওয়ার প্রেম, যা নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এটি আসমানী আবেগ-আসক্তির কারুকার্য, যা শেষ কখনও হওয়ার নয়।

দুই-তৃতীয়াংশ শতকের পর্দার পিছনে আমার এখনও ভালভাবে স্মরণ আছে, কিভাবে এই বাক্যটি আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জীবনের তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল, নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল। প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের যানবাহনকে গতিশীল করতে থাকি। ড্রাইভারকে আরও দ্রুত চালাতে তাগিদ করছিলাম। কারণ, আমরা মোটরগাড়িতে আরোহী ছিলাম। আমাদের গাড়ি ছিল সর্বপ্রথম গাড়ি, যা সিরিয়া ও হিজাযের মরুভূমি পাড়ি দিয়েছিল। আর এই মরুভূমি তার ইতিহাসে প্রথমবার এই নতুন অভিজ্ঞতা (মোটরগাড়ি) এর সাথে পরিচিত হচ্ছিল। ড্রাইভারের চেতনা-চঞ্চলতা আসে। এমনকি আমরা অনুভব করলাম, আনন্দ-খুশির বান ও মিলনের অধীরতা যেভাবে আমাদেরকে ব্যাকুল করে দিয়েছে, অনুরূপভাবে গাড়িগুলোতেও দ্রুততা, চঞ্চলতা ও আগ্রহের এক তরঙ্গ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

যখন আমরা উহুদ পাহাড়ের পাশ দিয়ে ঘুরে এলাম এবং সবুজ গম্বুজের উপর প্রথমবার দৃষ্টি পড়ল, তখন আমাদের মুখ, আমাদের ভাষাগুলো, আমাদের মনের অনুভূতি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। যেভাবে আজ তা লিখতে কলম অক্ষম। আমরা প্রেমিকদের ভাষায় মনের ব্যাকুলতা ও অমর অশ্রুধারার সাথে কথা বলেছি আর কেন আমাদের মন-প্রাণ স্পন্দিত হবে না! কেন আমাদের অশ্রুধারা বইয়ে যাবে না! আমরা তো প্রিয়জনদের আঙ্গিনায় পৌঁছে গেছি। সেই আঙ্গিনা, সেই প্রাচীর, যার কল্পনায় আমরা বেঁচে আছি। যার স্মরণ আমাদের খোরাক ছিল। সীরাত পাঠ করে এসব স্থানের আলোচনায় আমরা মনে করতাম, এ আমাদের আত্মার ঠিকানা, প্রাণের আবাসভূমি, হৃদয়ের তীর্থস্থান। আমরা যে দেশে জন্মেছি, সেখানে তো কেবল আমাদের শরীরের বাসস্থান ছিল। আর এমন কোথায় কবে হয়েছে যে, দেহের ঘর প্রাণের ঘর অপেক্ষা অধিক প্রিয় থাকে? গোটা পৃথিবীর কোথাও এমন কোন হতভাগা মুসলমান আছে কি, যে রাসূল (সা) এর শহরের জন্য (আল্লাহ না করুন। কোন পরীক্ষার ছলেও এরূপ না হয়) বাড়িঘর কুরবানীর জন্য প্রস্তুত হবে না কিংবা আল্লাহর ঘরের উপর যদি কোন বিপদ আসে, তবে সেই ঘরের নিরাপত্তার জন্য সে নিজের এবং নিজের আপনজনের বাড়িঘর ত্যাগ না করবে?

প্রত্যেক সাহিত্যিক মনোভাবাপন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তির আকাঙ্ক্ষা থাকে, তিনি সেই বাড়ির দর্শন লাভ করবেন, যেখানে কোন সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই শহরকে দেখবেন, যেখানে পূর্বে একজন কবি ছিলেন। এজন্য তিনি সফর

করেন। সেখানে পৌঁছার জন্য যথাসাধ্য টাকা-পয়সা খরচ করেন। এ পথে তিনি সর্বপ্রকার নিঃস্বতা ও পেরেশানী বরদাশত করেন। সফরের কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করেন। তারপরও কিভাবে একজন মুসলমানের মন এই শহরের প্রেম-আবেগে ব্যাকুল হবে না, যার মাটিকে মহান প্রেমাস্পদ রাসূলে কারীম (সা) এর পদধূলি ধন্য করেছে? যার বায়ুমণ্ডলে তার শ্বাস-প্রশ্বাস সুগন্ধি ছড়িয়েছে। যার পানিকে তার প্রাণ-সঞ্জিবনী ঠোঁট স্পর্শ করেছে। এই আশেক-রাসূল প্রেমিক সেসব পথ প্রান্তরেই চলছে, যেখানে তার প্রিয়জনের পবিত্র কদম পড়েছে। সেখানেই সে সিজদাবনত হয়, যেখানে তার প্রিয়তম নামায পড়েছে। সে পথ দিয়েই মদীনায় প্রবেশ করে, যে পথ দিয়ে তার প্রিয়নবী হিজরতের সফরে মদীনায় প্রবেশ করেছিলেন। আবার সে পথ দিয়েই বের হয়, যে পথে উহুদ যুদ্ধের সময় মুসলিম সৈন্যবাহিনী তার নেতৃত্বে বের হয়েছিল। সে ঐ উত্তপ্ত রণক্ষেত্রকে প্রত্যক্ষ করে এবং পুণ্যবান শহীদগণের সমাধিস্থলে দণ্ডায়মান হয়। তারপর সেই 'রওযা' শরীফের কাছে ফিরে আসে, যা এই ধূলির ধরায় জান্নাতের একটি অংশ। সেই হুজরা মোবারকে হাজিরা দেয়, যা বরকতময় কবরস্থান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, যা কিয়ামত অবধির জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর এই প্রেমিক সাক্ষাৎপ্রার্থী, তার প্রেমময় আকুল কণ্ঠে বলে, السلام عليكم يا سيدى يا رسول الله (ওহে আমার মনিব! আল্লাহর রাসূল (সা)!) আপনার উপর অজস্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক) আমার এই প্রথম উপস্থিতির পুণ্যময় স্মৃতি আমি কখনও ভুলব না।

কী আশ্চর্য! আজ আমার মধ্যে এ ধরনের আগ্রহ নেই আর না আমার মধ্যে এ ধরনের আনন্দানুভূতি আছে? কত বিস্ময়! আমি সেসব প্রশংসামূলক ও আবেগপূর্ণ কবিতা পাঠ করতাম, যা আরব কবিদের কলম থেকে নির্গত হয়েছে, যেগুলো আমার অন্তরের পরতে পরতে এমনভাবে দোলা দিত, যেমনিভাবে বাগানের মালিক কোন ফলবান বৃক্ষের ডালা ধরে নাড়া দেয়। আমার মনে আগ্রহ-আবেগ ও উঁচু মানসিকতা এমনভাবে বর্ষিত হত, যেভাবে ডাল ধরে নাড়া দিলে নষ্ট ফলগুলো ঝরে পড়ে। কি আশ্চর্য কথা! আজ আমি সেসব কবিতা আবৃত্তি করি আর মনের সেসব ডালগুলোতে নাড়া লাগে, যেগুলোকে বয়সের প্রান্তিকতা পত্র-পল্লব থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। আজ সেগুলো কেবল নিরস শুষ্ক।

একি যুগ-সময়ের দূরত্বের পরিণতি? নাকি মনের উদাসীনতা? কিংবা যুগ-সময় আমাকে বলে দিয়েছে? নতুবা পূর্বে তো আমরা স্থলপথে আসতাম। মদীনার পথে আমাদের কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত। আবেগ-আগ্রহ ও প্রেরণাই হত আমাদের পাথেয়-রাহবার। আমাদের বক্ষে শত সহস্র আশা-আকাঙ্ক্ষা

তরঙ্গায়িত হত। আর আজ আমরা দু'তিন ঘণ্টায় পুরো পথ পাড়ি দিয়ে ফেলি। সিরিয়া কিংবা মিসরে আমরা বিমানের সিড়িতে পা রাখলাম আর খানা খেয়ে সামান্য বিশ্রামও নিতে পারলাম না, ঐ সিড়ি দিয়েই জিদ্দা নেমে যাই। আমরা এভাবে সময়ের উপকারিতা লাভ করলাম। কিন্তু আগ্রহ-আবেগ-অনুভূতির অপূরণীয় ক্ষতি করে ফেললাম।

আমার উপর আমার অবস্থা টলটলায়মান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমার প্রিয় ভাই আবুল হাসান! আমি যখন তার বই "আত তরীক ইলাল মদীনা" পড়লাম, তখন অনুভব করলাম, সেই আবেগ-অনুভূতি পুনরায় আমার মধ্যে উজ্জীবিত হচ্ছে। আমার বক্ষে আবার সেই উত্তাপ ও অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হচ্ছে। এভাবে পুনরায় আস্থা জন্মে যে, আমার অন্তরাত্মা সেই নতুন এশক ও প্রেমের রত্নশূন্য হয়নি। কিন্তু যুগ-সময়ের নানা চিন্তা পেরেশানী সেই রত্নকে ধূলিমলিন করে দিয়েছিল। মুহতারাম আবুল হাসান আলী (র) -এর গ্রন্থখানি সেই ধূলিবালি সম্পূর্ণ সাফ করে দিয়েছে।

সাহিত্যের প্রতিও আমার আকর্ষণ ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছিল। কেননা দীর্ঘকাল ধরে কবি-সাহিত্যিকদের সেই আসমানী সুর-তরঙ্গ দৃষ্টিগোচর হয়নি, যার মূর্ছনায় শরীফ রাযী (আব্বাসী খেলাফতকালের প্রসিদ্ধ জনৈক হাশেমী কবি) এর সময় থেকে নিয়ে আব্দুর রহীম বারঈ পর্যন্ত কবিগণ আবৃত্তি করতেন। যখন আমি মাওলানার الطريق الى المدينة গ্রন্থখানি পাঠ করলাম, তখন আমি সেই হারানো সুর-তরঙ্গ পুনঃ ফিরে পেলাম। এই সুর তরঙ্গ তার সেই গদ্যে আমি পেলাম, যা সত্যিই কবিত্ব। কিন্তু ছন্দতাল মুক্ত। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম আবুল হাসান! আপনার শত সহস্র শোকরিয়া! আপনি পুনর্বার আমার ভেতর ব্যক্তিসত্ত্বা ও নিজের সাহিত্যের উপর আস্থার জন্ম দিয়েছেন।

আপনি একটি ভূমিকা লেখার আবেদন করেছেন। আপনি এ ব্যাপারে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, এর প্রয়োজন না আপনার আছে আর না এই কিতাবের। বই-কিতাবের ভূমিকাগুলোর অবস্থান তাই হয়, যা ব্যবসায়ীদের জন্য দালাল ও এজেন্টদের। নতুন ব্যবসায়ীরা এজন্য দালাল খোঁজে, যেন সে তার অপ্রসিদ্ধ, অচেনা পণ্যের প্রচার-প্রসার ঘটাতে পারে। যখন স্বয়ং ক্রেতা ব্যবসায়ীকে এজেন্ট অপেক্ষা ভাল জানে এবং তার পণ্য ক্রয়ের জন্য তদপেক্ষা বেশি আগ্রহী, যতখানি আগ্রহী ব্যবসায়ী তার কাছে পণ্য বিক্রয়ের। সুতরাং এমতাবস্থায় এই এজেন্ট কি কল্যাণে আসতে পারে!

মক্কা — আলী তানতাভী

১৪.০১.১৩৮৫ হিজরী।

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولنا محمد وآله وصحبه اجمعين.

বক্ষমান বইখানা লেখকের বিভিন্ন ভাষণ-বক্তৃতা ও সীরাত সংক্রান্ত আলোচনার সংকলন। তার যুগ-সময়, অবস্থা-প্রেক্ষিত ও আবেদন-নিবেদন, সম্পৃক্ততা এবং নৈকট্যতার বিচারে এতে পার্থক্য ও বৈপরিত্য আছে। কিন্তু এই বিভিন্নতা ও বহুত্বের একটি সামঞ্জস্য এবং মিলও রয়েছে। আর তা হল, এসব বক্তৃতা আলোচনা ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের সম্পর্ক একই সত্ত্বার সাথে। অর্থাৎ রাসূলে কারীম (সা) -এর সত্ত্বা, তার পবিত্র সীরাত, তার শিক্ষা, বাণী, তার অনুগ্রহ-দান, মহানুভবতা এবং তার বিশ্ববিস্তৃত সুফল ও প্রভাব। আর এসবের উদ্দেশ্য একই। অর্থাৎ এ পবিত্র সত্ত্বার শ্রেষ্ঠত্ব মেধা-মননে এবং তার ভালবাসা ও ঐকান্তিক ব্যাকুলতা অন্তরে সৃষ্টি করা। এজন্য বাচনভঙ্গি, রচনা পদ্ধতি, বিষয়বস্তু ও শিরোনামের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এসব প্রতিপাদ্যে বিক্ষিপ্ততা কিংবা পুনরাবৃত্তি অনুভূত হয়নি।

এসব বক্তৃতা ও বিষয়বস্তুর বেশিরভাগ প্রথমে আরবীতে লিখা হয়েছিল। পরবর্তীতে স্বয়ং লেখক অথবা তার কোন সুহৃদ বন্ধু উর্দুতে এগুলো ভাষান্তর করেছেন। তাছাড়া এগুলো বিভিন্ন জননন্দিত পুস্তিকা ও পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। কয়েক বছর যাবৎ লেখকের মনে খটকা ছিল এবং তোলপাড় হচ্ছিল যে, আরব বিশ্বের শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেরই সম্পর্ক (বিশেষতঃ যারা আরব জাতীয়তাবাদে প্রভাবিত এবং যাদের উপর ঐ সামেরী যাদুর ভেল্কি লেগে ছিল, যা কয়েক যুগ ধরে মিসরে চাঙ্গ করা হয়েছে) ঐ পবিত্র সত্ত্বার সাথে, যিনি তাদের সকল প্রকার সৌভাগ্যের উৎস ও প্রাণকেন্দ্র। যার উসীলায় তারা দীন-দুনিয়ার কল্যাণ, দৌলত ও সম্মান লাভ করেছে। আজ তা বড়ই দুর্বল-জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং বেশিরভাগ ব্যবস্থাপনাও আইনী হয়ে গেছে। যেখানে এশকের আবেগ-উচ্ছাস এবং জীবনের তৎপরতা নেই। অথচ এ ধরনের মৌলিক ও আবেগময় সম্পর্ক যেখানে তিনি আপাদমস্তক প্রিয়তম, সত্ত্বা তার সত্ত্বা এবং নিজের অতিপ্রিয় শুভাকাঙ্ক্ষী-আত্মীয়স্বজন ও প্রিয় থেকে প্রিয়, ধন-সম্পদ

অপেক্ষা অধিক প্রিয় হওয়া কুরআন-হাদীসের আলোকে উদ্দেশ্য,[১] দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা তার সম্মান এবং তার কাছে আদব-শিষ্ঠাচার লক্ষ্যণীয়। এজন্য শরী'আতে অত্যন্ত প্রশস্ত, উদার ও বিজ্ঞোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে ভূতপূর্ব সাম্যের শিক্ষা, পথনির্দেশনা ও বিধিবিধান।[২]

এই পরিবর্তন মারাত্মক বিপদ সংকেত এবং বিরাট এক বিপ্লব ও দুর্ভাগ্যের নিদর্শন। এতে প্রত্যেক সেই সচেতন বিবেকবান ও দরদী মুসলমানের অধীর, অস্থির ও যন্ত্রণাদগ্ধ হওয়া উচিৎ, যার বিশ্বাস রয়েছে যে, আরবই ছিল এই বিপুল সম্পদের প্রথম এবং সবচেয়ে বড় সংরক্ষক ও ঝাণ্ডাবাহী। মুসলিম বিশ্বের স্থিতিশীলতা ও সুদৃঢ়তার জন্য জরুরী হল, তারা সবসময় এই শক্তির আধার এবং এই দৌলতের সংরক্ষক ও প্রহরী হয়ে থাকবে। তাদের থেকে মুসলিম বিশ্ব এই নেয়ামত ও কল্যাণ লাভ করতে থাকবে।

এই অবস্থা-প্রেক্ষিতে প্রভাবিত হয়ে আমি যথোচিৎ মনে করলাম যে, আমার ঐসব আরবী বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলো; যেসব নিজ নিজ অবস্থা-সময়ে ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছিল এবং আরব সাহিত্যিকগণ ও আগ্রহোদ্যমী লোকজন

---

[১] তাবারানীর রিওয়ায়াতে আছে, لا يؤمن احدكم حتى اكون أحب إليه من نفسه -الخ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার কাছে তার সত্তা থেকে অধিক প্রিয় না হব। বুখারী মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদীসে পিতা-সন্তান ও সকল মানুষের কথা এসেছে।

[২] যেমন সাহাবায়ে কিরামকে রাসূলে কারীম (সা) এর সম্মুখে উচ্চস্বরে এবং তার কথার উপর কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সূরা হুজরাতে ইরশাদ হয়েছে, لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض "হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবী (সা) এর আওয়াজ অপেক্ষা উঁচু করো না এবং পরস্পর এক অন্যের সাথে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো, সেভাবে তার মুখে মুখে উচ্চস্বরে কথা বলো না।" এমন যেন না হয় যে, তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে গেল। আর তোমরা আঁচও করতে পারলে না। এ প্রসঙ্গে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এতে আশঙ্কা আছে যে, তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে আর তোমরা টেরই পাবে না। (أن تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون) অনুরূপভাবে উচ্চ আওয়াজে তাকে কামরা থেকে ডাকা, উচ্চবাচ্য করে চেচিয়ে চেচিয়ে তাকে তলব করা নেহায়েত জঘন্য কাজ ও বেয়াদবী সাব্যস্ত করা হয়েছে। একই সূরায় ইরশাদ হচ্ছে, ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون (যারা আপনাকে কামরার বাইরে থেকে চেচিয়ে ডাকে, তাদের অধিকাংশই নির্বোধ-বেকুফ) সাধারণ মানুষের মত তাকে ডাকা, খবর দেওয়াও বেয়াদবী ও অনুচিত কাজ। সূরায়ে নূরে ইরশাদ হচ্ছে, لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا (হে মুমিনগণ! তোমরা নবীদের ডাকাকে এমন মনে করো না, যেমন তোমরা পরস্পর একে অপরকে ডাকো।)

এ কারণেই রাসূলে কারীম (সা) এর ইন্তেকালের পর তার পূণ্যবতী স্ত্রীগণের সাথে বিবাহ বন্ধন নাজায়েয ও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ, এমতাবস্থায় মনের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য, সম্মান ও আদবের প্রতি খেয়াল অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না, যা তার সাথে অত্যাবশ্যকীয় এবং নিজের ঈমানের নিরাপত্তা বলয় হবে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. 'তোমাদের জন্য আদৌ উচিৎ নয় যে, তোমরা আল্লাহর রাসূল (সা) কে কষ্ট দিবে আর না উচিৎ তার পরে তার বিবিদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আল্লাহর কাছে তা মহাপাপের কাজ।

গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলোকে একসাথে ছাপিয়ে দেব। হতে পারে সেগুলো পুরনো জীর্ণশীর্ণ নিষ্প্রভ প্রাণে এশক-প্রেমের নতুন উষ্ণতা সৃষ্টি করা এবং গোত্রপূজার প্রভাবকে হ্রাসকরণে কোন উপকার সাধন করতে পারবে– এক অনারব লেখক ও ব্যথাভারাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এর চেয়ে বেশি বলার শক্তি নেই। সাথে সাথে তাদের সামনে অনারব গোলামদের এশক-মহব্বত এবং তাদের আত্মিক সম্পর্কের দৃষ্টান্তও পেশ করা হবে, যার দ্বারা তাদের আরবী আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগবে এবং এশক-প্রেমের নিষ্প্রভ অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো পুনঃ জ্বলে উঠবে।

পশ্চিমা জ্ঞান-বিদ্যা, বস্তুবাদী দর্শন, আধুনিক শিক্ষা এবং গোত্রপূজা ও সাম্প্রদায়িকতার ইংগিতে যে শত্রুসেনাদল অনারব বিশ্ব ছেড়ে আজ স্বয়ং আরবে এবং দূরদিগন্তের ইসলামী দেশগুলো থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে হেরেমের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে, তাদের মোকাবেলা করা এবং তাদের প্রভাবকে দূরীভূত করার পন্থা এটিই মনে হচ্ছে যে, ভালবাসার সপ্তরাজ্য ও এশক-প্রেমের অভিভাবকের পক্ষ থেকে নতুন এক সৈনিক তৈরী করা হবে, যে বস্তুবাদে সেসব সৈনিকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। বিবেকবুদ্ধির অপরিপক্কতা ও স্থূল বা প্রকাশ্য জ্ঞানের সফল মোকাবেলা সবসময় এই এশক-মোহাব্বাত। এর হৃদয়োত্তাপ ও উষ্ণতা সম্পর্কহীনতা, উদাসীনতা, প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিপূজা এবং স্বার্থপরতার জঙ্গল জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। সম্ভবতঃ আল্লামা ইকবাল (র) বিশেষভাবে এরূপ অবস্থা প্রসঙ্গেই বলেছিলেন,

سپاہ تازہ بر انگیزم از ولائت عشق

کہ در حرم خطرے از بغاوت خرد است

সুতরাং ১৩৮৪ হিজরীতে হজ্জ ও যিয়ারতের সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু প্রস্তুত করে মদীনা শরীফের একজন বিদ্যানুরাগী আলিফ প্রকাশক শাইখ মুহাম্মাদ আন-নামনানী আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ্ এর স্বত্ত্বাধিকারীকে সোপর্দ করি। লেখক এই কিতাবের নাম রাখেন "আত ত্বারীক ইলাল মাদীনাহ্"। এর দ্বারা আরবীদের মদীনা শরীফ এবং ইসলামের শেষ ও প্রাণকেন্দ্রের প্রতি নতুনভাবে পথপ্রদর্শন হয়। যেন আল্লামা ইকবালের ভাষাই আধুনিক সভ্যতার অন্ধপূজারী ও জাতীয়তার নিবেদিতপ্রাণ আরববাসীদের জন্য তাদের আসল কেন্দ্রের প্রতি প্রত্যার্পণের আহ্বান এবং তার নিম্নোক্ত পংক্তির ব্যাখ্যা ও প্রতিচিত্র।

بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل

اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے

লেখক (র) তার মুহতারাম সুশিক্ষিত বন্ধু উস্তাদ আলী তানতাবী সাবেক জর্জ হাইকোর্ট সিরিয়া, যাকে তিনি সমসাময়িক আরবী লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মনে করতেন, তার কাছে আবেদন করলেন, তিনি যেন এই কিতাবের শুরুতে একটি ভূমিকা কিংবা পরিচিতি স্বরূপ কিছু লিখে দেন। তিনি মহানুভবতার সাথে এই আবদার রক্ষা করে এ কিতাব ও লেখকের ইজ্জত বহুগুণে বাড়িয়ে দেন।

এখন সে সকল প্রবন্ধ সমগ্র উর্দু ভাষায় ছাপা হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রপূজার আন্দোলনগুলো পশ্চিমা শিক্ষার প্রভাব ও বর্তমান যুগের বস্তুবাদ সর্বত্রই তার শক্তি ও দাপট দেখাচ্ছে। মনের সেই উষ্ণতা এবং অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়োত্তাপকে কলুষিত ও ক্ষতিগ্রস্থ করছে, যা এই উম্মতের বিরাট বড় পুঁজি এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া ও জাতশত্রুর মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তার পক্ষে সবচেয়ে বড় শক্তি।

আশা করি, এই কিতাবখানা উর্দু ভাষাভাষীদের জন্য তদ্রূপ উপকারী ও প্রেমের আগুনকে প্রজ্বলিতকারী প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ, যেভাবে এর আরবী মুদ্রণ ফলপ্রসূ হয়েছে। লেখক উর্দু ভাষায় এর নাম রেখেছেন কারওয়ানে মাদীনা।

২৮ জমাদাল উখরা ১৩৮৫ হি.
২৪ অক্টোবর ১৯৬৫ খৃ. শনিবার

আবুল হাসান আলী
দায়েরায়ে শাহ আলামুল্লাহ

সূচীপত্র

যে কিতাবের দান যায় না ভোলা/১৭
নতুন পৃথিবী/২৪
জীবনের প্রতিচ্ছবি/২৮
হেরাগুহার আলোকরশ্মিতে/৩৩
নবুওয়াতের স্বার্থকতা/৪৫
নবুওয়াতের দান/৫৭
নবীজীর দরবারে উম্মতের প্রতিনিধি দল/৭১
বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর নামে সীরাতে মুহাম্মাদীর বার্তা/৮২
সমকালীন মুসলমানদের নামে সীরাতের পয়গাম/১০৩
রহমতে আলমের দুয়ারে আল্লামা ইকবাল/১০৮
নৈকট্য ও আনন্দ/১২১
মদীনার স্মৃতি/১৩১
ফারসী কবিদের শ্রদ্ধা উপহার/১৩৭
উর্দু কবিদের শ্রদ্ধা নিবেদন/১৬৫

কারওয়ানে মদীনা

যে কিতাবের দান যায় না ভোলা

আজ আমি এমন এক কিতাবের কথা বলব, আমার উপর যার দান অপরিসীম। আমি সে কিতাবের উদারপ্রাণ ও আশেকে রাসূল লেখকের জন্য আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অন্তর থেকে মুনাজাত করি, যিনি তাঁর এ কিতাবের মাধ্যমে আমাকে এমন এক ধনে ধনবান করেছেন, যা আমার কাছে ঈমানের সবচেয়ে দামী বরং প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমানেরই একাংশ। সে কিতাবের নাম 'রাহমাতুল লিল আলামীন'। আর এই অমর কিতাবের লেখক মাওলানা কাযী সুলাইমান মানসূরপুরী (র)।

উক্ত কিতাবের হৃদয়গ্রাহী একটি ঘটনা

আমার বড় ভাই ডা. হাকীম সাইয়িদ আব্দুল আলী, যিনি আমার পিতার ইন্তিকালের পর থেকে আমার শিক্ষাদীক্ষার যিম্মাদার ছিলেন। তখন আমার বয়স ছিল নয় বছর, তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন, এই বাল্যকালে কী ধরনের কিতাবাদি মুতালাআ ও অধ্যয়ন করা আমার জন্য উপকারী হবে। আর কিতাবাদি নির্বাচনে বরাবরই আল্লাহর অনুগ্রহ-তাওফীক তার সঙ্গে থাকত। সুতরাং তিনি আমাকে 'সীরাতে খাইরুল বাশার' নামে একটি কিতাব পড়তে দেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল, আমি যেন সীরাতের কিতাবাদিও প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করি। তার বিশ্বাস ছিল, জীবনে বড় ধরনের ভূমিকা পালন, আকীদা-বিশ্বাস মজবুত করা, চারিত্রিক উৎকর্ষতা এবং ঈমানের বীজ বপন ও প্রতিপালনের জন্য সীরাতে তাইয়িবা অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল আর কিছু নেই। কাজেই জীবনের শুরু থেকেই সীরাতের কিতাবাদির সাথে আমার যারপরনাই হৃদ্যতা এবং অধ্যয়ন ও সংগ্রহ করার গভীর আগ্রহ জন্ম নেয়। আমি প্রায় সময় বিভিন্ন প্রকাশনীর প্রকাশিত পুস্তক তালিকা প্রচণ্ড আগ্রহভরে দেখতাম। একবার আমার দৃষ্টি শিবলী বুক ডিপো লক্ষ্ণৌর পুস্তক তালিকার 'রাহমাতুল লিল আলামীন' এর উপর নিবদ্ধ হয়। আমি এ কিতাবের জন্য অর্ডার পাঠিয়ে দিলাম। সে সময় এ কিতাবের দু'টি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। অথচ এক শিশুর সংকীর্ণ বাজেট (যার বয়স তখন ১১/১২ বছরের বেশি ছিল না) এ কিতাব ক্রয়ে নিশ্চিতভাবে অক্ষম ছিল। কিন্তু শিশুরা বাজেটের আইন-

কানুন, সীমা-পরিসীমা এবং জীবন-জীবিকার বাধ্য থাকে না। সে কেবল তার নিষ্পাপ চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আগ্রহ-জযবার সাথে চলে।

তারপর একদিন পিয়ন আমাদের ছোট্ট গ্রাম দায়েরায়ে আলামুল্লাহ র. রায়বেরেলীতে আসেন। তার কাছে উল্লেখিত কিতাবের প্যাকেটও ছিল। আমি দেখলাম, এ কিতাব ক্রয়ের মত টাকা-পয়সা আমার হাতে নেই। আমার মুহতারাম আম্মা (আল্লাহ তা'আলা তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুন) যিনি তাঁর ইয়াতীম শিশুর যারপরনাই শুভাকাঙ্ক্ষী ও স্নেহময়ী ছিলেন, তিনিও এ টাকা দিতে অপারগতা জানালেন। কারণ, তার কাছে কিছুই ছিল না। আমি দেখলাম, এ মুহূর্তে আমার কোনও সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই। তবে একজন সুপারিশকারী আছে, শিশুরা প্রায় যাকে কাজে লাগায়। আর সে জানে, তার সুপারিশ কখনও নিষ্ফল কিংবা প্রত্যাখ্যাত হবে না। এ হল সে সুপারিশকারী, যার সাহায্য নিয়েছেন আমাদের নেতা উমাইর ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাযি., রাসূলে কারীম (সা) তার সুপারিশ গ্রহণ করেছিলেন। তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের। এ হল চোখের পানি এবং নিষ্পাপ রোদন-বিলাপের সুপারিশ। যা আল্লাহ তা'আলা এবং তার নেক বান্দাদের কাছে এখনও অনেক মূল্যবান, মর্যাদাপূর্ণ –অবশ্যই যা শোনা হয়। সুতরাং তা-ই হল। আমার স্নেহময়ী মায়ের হৃদয় কুদরতীভাবে নরম হয়ে গেল। তিনি চেষ্টা করে কোথাও থেকে এনে সে কিতাব কেনার টাকা আমাকে দিলেন। আমি কিতাব সংগ্রহ করলাম। এবার আমি কিতাবখানি পড়তে শুরু করলাম। কিতাবটি আমার মনকে চমৎকারভাবে আন্দোলিত করল। কিন্তু এ কোনও চঞ্চলতা ও চরম অপছন্দতা এবং অস্থিরকারী আন্দোলন ছিল না বরং এ ছিল অত্যন্ত নরম-কোমল, প্রাণবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী আন্দোলন। আমার মনপ্রাণ অনিন্দ্য আনন্দে এমনভাবে নেচে উঠল, যেমন চৈত্রের খরায় এক পশলা বৃষ্টিতে গোটা প্রকৃতি কিংবা বসন্তের হাওয়ায় কোন পুষ্প শাখা নেচে ওঠে। ভরে ওঠে ফুলে ফুলে।

এ সেই পার্থক্য, যা সাধারণ বিজয়ী, খ্যাতনামা ব্যক্তিদের জীবনকর্ম এবং সীরাতুন্নবী (সা) এর কিতাবাদিতে আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে। সেসব কিতাবও মনের মধ্যে এক ধরনের স্পন্দন, চাঞ্চল্য ও তরঙ্গ সৃষ্টি করে। কিন্তু সে চাঞ্চল্য-দুর্ভাবনা মনের উপর বাইর থেকে আক্রমণ করে এবং বিস্বাদ প্রভাব বিস্তার করে। পক্ষান্তরে সীরাতুন্নবী (সা) -এর কিতাবাদি থেকে মনের মধ্যে যে আন্দোলন ও স্পন্দন সৃষ্টি হয়, তা স্বয়ং মুমিন হৃদয় থেকে জেগে ওঠে। তাকে অনিন্দ্য সুখ ও প্রশান্তি দান করে এবং স্থিরতা ও স্নিগ্ধ আনন্দে অভিভূত করে।

আমার মন এ কিতাবের সাথে এমনভাবে একাত্ম হয়ে যায় এবং এমন ভূতপূর্ব স্বাদ আস্বাদন শুরু করে, যেমন ছিল সে এ কিতাবের প্রতীক্ষায়

অধীর। আমি এ কিতাব পাঠে এক নতুন ও বিস্ময়কর স্বাদ অনুভব করলাম। এ ছিল সেসব স্বাদ থেকে ভিন্নতর, জীবনের সাথে সবেমাত্র (অথচ আমি প্রথম থেকেই খুবই সচেতন ও তীক্ষ্ণ উপলব্ধিপরায়ণ ছিলাম) পরিচিত হয়েছি। এ স্বাদ ক্ষুধার তীব্রতায় সুস্বাদু খাবারের স্বাদ ছিল না। ছিল না ঈদের দিনের নতুন পোশাকের আনন্দ; না ছিল আগ্রহ উদ্যমে খেলাধূলার। আর না অব্যাহত পরিশ্রম, পড়ালেখা ও ব্যস্ততার পর অবসর প্রাপ্তির; না কোনও প্রতিযোগিতা কিংবা লড়াইয়ে বিজয় লাভের। না ছিল কোনও প্রিয়বন্ধু ও নিকটাত্মীয়ের সাক্ষাতের আনন্দ। সেসব আনন্দ ও স্বাদ-আহলাদের সাথে আদৌ এর কোনও মিল ছিল না। এ ছিল এমন স্বাদ, যা কেবল আমিই জানতাম। কিন্তু ভাষায় তা ব্যক্ত করতে পারতাম না। আমি স্বীকার করি, আজও সেকথা সুস্পষ্ট ভাষায় কিংবা দু'এক শব্দে ব্যক্ত করতে আমি অক্ষম। বড়জোর বলতে পারি, তা ছিল মন ও আত্মার প্রশান্তি। শিশুর কি মন-আত্মা নেই? তার কি মনোবাসনা ও আত্মিক প্রশান্তির অনুভূতি নেই? অবশ্যই আছে। আল্লাহর শপথ! নিষ্পাপ শিশুরা বড়দের চেয়েও মনোবাসনা ও বেশি স্বাদ-আহলাদের অধিকারী। তারা অধিক খাঁটি চেতনা রাখে। চাই সে তা ভাষায় ব্যক্ত করতে না-ই পারুক। আমি এই হৃদয়গ্রাহী, আনন্দ উদ্দীপক ও হর্ষোল্লাস সৃষ্টিকারী কিভাবে যখন কুরাইশ গোত্রের সেসব লোকের ঘটনাবলি পড়ছিলাম, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ফলে তাদের উপর নেমে এসেছিল মর্মন্তুদ কষ্ট-যাতনা। আর তারা চরম ধৈর্য ও দৃঢ়তা বরং আনন্দ ও উৎসাহের সাথে সেসব সহ্য করছিলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম, এতেও রয়েছে আরেক প্রাণ উৎসর্গকারী স্বাদ। যার সম্পর্কে নেতৃস্থানীয় ও ধনিক-বণিক লোকজনসহ সেসব ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণ অনবগত, দুনিয়াবাসী যাদেরকে সুখী-ভাগ্যবান মনে করে। আর তা হল, হক ও সত্যের পথে আপনাকে নানা কষ্ট-যাতনা ও দুর্ভোগ পোহাতে হবে, ঈমান-আকীদা সংরক্ষণে জুলুম-নিপীড়ন সহ্য করতে হবে এবং দীনের দাওয়াত ও প্রচার-প্রসারের কাজে আপনাকে করা হবে লাঞ্ছিত-অপমানিত। এ হল সে সুখ-আনন্দ, যা বিজয় গৌরব, উন্নতি, সৌভাগ্য, ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা ও নেতৃত্বের কোনও সুখ-আনন্দ এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার মনপ্রাণ গোটা জীবনে একবার হলেও এমন স্বাদ, আনন্দ, সম্মান ও সৌভাগ্য পেতে চায়।

আমি মুসআব ইবনে উমাইর রাযি.-এর ঘটনা পড়েছি। তিনি ছিলেন শুভাকাঙ্ক্ষা, উন্নত মন-মানসিকতা, সাজসজ্জা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রুচিশীলতা ও উন্নত জীবনের মানদণ্ডে প্রবাদতুল্য। কুরাইশ বংশের এই সৌখিন ও বিলাসপ্রিয় তরুণ, যখন মক্কায় আনন্দ ভ্রমণে বের হতেন, তখন তাঁর দেহ জড়িয়ে থাকত শত সহস্র টাকা মূল্যের পোশাক। গোটা শহরে

আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যেত। কিন্তু তিনি যখন রাসূলে কারীম (সা)-এর মুবারক হাতে নিজের হাত রাখলেন, তখন ধনাঢ্যতার এসব প্রদর্শনী ও লৌকিকতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। তখন থেকে তিনি মোটা কাপড় পরেন। সাদাসিধে জীবনযাপন করেন। অনেক সময় নিজের চাদরটিও বাবলা কাঁটায় আটকাতে বাধ্য হন। এ দৃশ্য রাসূলে খোদাকে অশ্রুসিক্ত করে দেয়। নবীজীর মনে পড়ে, পূর্বে তার জীবন কত স্বচ্ছল, সুখময় ও আড়ম্বর ছিল! এ যুবক বদর প্রান্তরে যখন শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন, তখন তার পরণে ছিল একটি মাত্র চাদর। আর তা-ও এত সংকীর্ণ যে, পায়ের দিক ঢেকে দিলে মাথা খুলে যেত। আর মাথা ঢেকে দেওয়া হলে পা বেরিয়ে পড়ত। তখন রাসূলে কারীম (সা) বলেন, "তাঁর মাথা ঢেকে দাও আর পদযুগলে 'ইযখির' ঘাস দিয়ে দাও।"

আমি এ ঘটনা পড়ে আরও বিস্ময়াভিভূত হলাম। আমার মন-মানস পূর্ণ বিগলিত হয়ে গেল। আমার কাছে মনে হল, আড়ম্বর, বিলাসবহুল সৌখিন জীবনযাপন, দামী দামী পোশাক-পরিচ্ছদ, উন্নত ও সুস্বাদু খাবার-পানীয় এবং আলিশান ভবন ছাড়াও মানুষের আরেকটি অনিবার্য প্রয়োজন রয়েছে, যে পর্যন্ত সেসব ধনিক–বণিক শ্রেণী এবং রাজা-বাদশাগণও পৌঁছতে পারেনি। একটি সুখ এমনও আছে, যে সম্পর্কে এসব পেটপূজারী ও প্রবৃত্তির দাসেরা অজ্ঞ।

আমি নিজের মনের দিকে লক্ষ্য করে অনুভব করলাম, তার সে প্রয়োজন ও স্বাদ-আনন্দের আকাঙ্ক্ষা ও পিপাসা আছে। তার দৃষ্টিতে এই চরম ও পরম বাস্তবতার জান্নাতি মর্যাদা ও মূল্যায়ন রয়েছে। ধনকুবের ও বিলাসপ্রিয়দের মত পোশাক-আশাক, বাহ্যিক চাকচিক্য ও নিষ্প্রাণ আড়ম্বরতা, লৌকিকতার নয়।

আমি সে কিতাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হিজরতের ঘটনাও পড়েছি। এর চেয়ে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রাণবন্ত কোনও ঘটনা আমি পড়িনি। লেখক অত্যন্ত সাদাসিধে ও সততা-নিষ্ঠার সাথে অথচ চমৎকার সাবলীল-প্রাঞ্জল ভাষায় এ ঘটনা তুলে ধরেছেন। চতুর্দিকে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল, রাসূলে কারীম (সা) মদীনায় তাশরীফ নিচ্ছেন। সকল মানুষের মন-প্রাণ, চোখ তাঁর পথপানে তাকিয়ে বরং পথের ধূলি হয়ে আছে। অনন্তর এক এক গোত্র তাঁর দরবারে এসে হাজির হয় এবং পরিপূর্ণ ঐকান্তিকতা ও সততার সাথে সওয়ারীর লাগাম ধরে আরয করে, হুজুর! আমাদের কাছে তাশরীফ রাখুন। সবকিছু আপনার তরে উৎসর্গিত। নবী করীম (সা) (তাঁর উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক) ইরশাদ করলেন, 'এ উটনী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট। তার পথ ছেড়ে দাও!' অনন্তর উটনীটি ঐ স্থানে গিয়ে থেমে যায়, যেখানে বর্তমান মসজিদে নববীর দরজা স্থাপিত। উটনী সেখান থেকে উঠতে অস্বীকৃতি জানায়। আর আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ঘটে– এ মর্যাদা ও সৌভাগ্য লাভ হয় আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর। অতঃপর

তিনি তাঁর প্রিয় মেহমানকে সসম্মানে ঘরে নিয়ে আসেন এবং সামানপত্র নামিয়ে রাখেন।

এ সম্মান লাভের ফলে আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর নৈসর্গিক আনন্দ আহ! আমি যদি বুঝতে পারতাম, সৌভাগ্য তার দুয়ারে টেনে নিয়েছে! দেখতে পারতাম, কি সুখে-আনন্দে ও উষ্ণ আবেগ নিয়ে তিনি তাঁর আদর-আপ্যায়ন করেছেন!

সহসা আমার মনে হল, যেন আমার হৃদয় আমাকে ছেড়ে নবীজীর উটনীর পাশে পাশে হাঁটছে এবং তারই সফরসঙ্গী হয়ে মদীনায় পৌঁছেছে, আরও মনে হল, যেন সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখছি। দিগ্বিজয়ী, সুলতান এবং ঐতিহাসিক খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দের বিজয়বেশে প্রবেশ, সুনাম-সুখ্যাতির ও ধন-সম্পদের প্রদর্শনী এবং অগ্রদূতদের বড় ঢোল তখন আমার কাছে একেবারেই গৌণ তুচ্ছ ও অনুল্লেখ্য মনে হতে থাকে। কোনও মানুষের সাথে অপর কোনও মানুষের প্রেম-ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার এই ভূতপূর্ব দৃশ্যপট আমার মেধা-মননে চিরদিনের জন্য অংকিত হয়ে যায়।

আমি উহুদের ঘটনাও পড়েছি। এটি ইখলাছ-একনিষ্ঠতা, কৃতজ্ঞতা, কুরবানী ও উৎসর্গ, ঈমান ও ইয়াকীন, ভদ্রতা-সম্মান, বীরত্ব, সাহসিকতা ও চেতনাবোধের এমন এক ঘটনা, যার থেকে বেশি মাহাত্ম্যপূর্ণ, তাৎপর্যমণ্ডিত সুন্দর ও চমৎকার আর কোনও ঘটনা ইতিহাসের পাতায় অন্য কোথাও দৃষ্টিগোচর হবে না। যখন আনাস ইবনে নযর রাযি. লক্ষ্য করলেন, লোকজন হাত-পা ছেড়ে দিয়েছে আর বলছে, (মা'আযাল্লাহ) রাসূলে কারীম (সা) শহীদ হয়ে গেছেন। তখন তিনি ঐতিহাসিক এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন, 'যার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) জীবন দিয়েছেন, তোমরাও তাঁর জন্য জীবন দিয়ে দাও।' অপর একজন বললেন, 'উহুদের এই পাদদেশ থেকে আমি জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি।' তাঁদের সবচেয়ে বড় তামান্না ছিল, জীবনের শেষ নিঃশ্বাস অবধি কোনভাবে রাসূলে কারীম (সা)-এর খেদমতে পৌঁছে যাওয়া। যখন তাঁদেরকে উঠিয়ে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাঁরা নবীজীর পবিত্র কদমে জীবন বিলিয়ে দেন।

আবু দুজানা রাযি. কোন মতে নবীজীর জীবন বাঁচানোর জন্য নিজেকে ঢাল বানিয়ে নিয়েছিলেন। সমস্ত তীর তাঁর পিঠে পড়তে থাকে। তিনি নবীজীর উপর ঝুঁকেছিলেন। এভাবে প্রেম-ভালোবাসা ও প্রাণ উৎসর্গের একেকটি ঘটনা আমার সামনে আসতে থাকে। কখনও আমার মন ব্যথায় চুরচুর হয়ে যেত আর আমি অজান্তেই কেঁদে ফেলতাম। কখনও আনন্দ-উল্লাসের দোলায় দুলে উঠতাম।

এ কিতাব এবং এ কিতাব রচয়িতার যে দান-অনুগ্রহ আমি কখনও ভুলতে পারব না– তা হল, তিনি আমার মনের মধ্যে এ সুপ্ত ও ঘুমন্ত ভালোবাসা জাগ্রত করেছেন। যা ছাড়া জীবনের কোনও স্বাদ নেই। এ জীবনের কোনও মূল্যও নেই। জনৈক ফার্সী কবি সম্ভবতঃ এ প্রসঙ্গেই বলেছিলেন,

ناخوش آں وقتے کہ برزندہ دلاں بے عشق رفت

ضائع آں روزے کہ برمستاں بہ ہشیاری گذشت

"প্রেমিকের যে সময় প্রেম শূন্য কেটে গেল, তাকে সুখকর বলা যায় না।
সেদিন উন্মাদনায় নষ্ট হয়ে গেল অবচেতনে।"

ভালোবাসার এ ব্যাকুলতাই তো জীবনের আসল মগজ। ফার্সী কবি যথার্থই বলেছেন,

در خرمن کائنات کردیم نگاہ

یک دانہ محبت است باقی ہمہ کاہ

'এ সেই প্রেম-ভালোবাসা, যার কারণে এ ধীমান ও মেধাবী মানুষকে আমাদের মানুষের কাতারে, সমমনা ও বন্ধুদের মাঝে উঁচু মনে হয়। এটিই সেই মহৌষধ, যার কারণে সাধারণ ও নগণ্য পর্যায়ের লোকজন এমন এমন কাজ করেছে এবং তা এত মহান, যা বড় ক্ষমতাধর, ধনকুবের ও পদাধিকারী লোকও করতে পারেনি। এর মাধ্যমে সাধারণ একজন মানুষ বড় বড় জাতির উপর বিজয় গৌরব অর্জন করেছে। কোনও জাতি যখন এই মহৌষধকে ব্যবহার করেছে, তখন গোটা পৃথিবী তার পদানত হয়ে গেছে।

এ সেই প্রেম, যাতে আজ এ জাতি নিতান্তই দৈন্য ও রিক্ত হস্ত হয়ে গেছে। আজ তাদের কাছে প্রচুর ধন-সম্পদ আছে। অনেক প্রশস্ত বিদ্যা রয়েছে। সম্মান ও পদমর্যাদা রয়েছে। অনেক রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্রও তাদের হাতে আছে। কিন্তু তারা জীবনের এই আবেহায়াত (প্রাণসঞ্জীবনী সুধা) থেকে বঞ্চিত। ফলশ্রুতিতে তারা এক নিষ্প্রাণ লাশ ও জড়পদার্থ হয়ে পড়ে আছে। যাকে জীবন তাঁর কাঁধে বহন করে ঘুরে।

এটিই সোহবতের সেই প্রস্রবণ, যার থেকে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত আমাদের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী ও পশ্চিমা জাতক গোষ্ঠী। এই বঞ্চনার পরিণামে আজ তাদের মন সবচেয়ে বেশি দুঃখ-ভারাক্রান্ত ও অস্থির। তাদের বস্তুবাদের মোহগ্রস্থদের মাঝে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি-সাহস সবচেয়ে কম। তারা জাতির অন্যান্য শ্রেণী থেকে অধিক নিষ্ক্রিয় ও মূল্যহীন। তাদের জীবন সবচেয়ে বেশি বিস্বাদ-বিষাদময়। তাদের চেষ্টা-তদবীর সর্বাধিক অর্থহীন ও বেগার, নিষ্ফল।

এ কিতাব এবং এ কিতাব রচয়িতার জন্য আমি মন থেকে শোকরিয়া জ্ঞাপন করি। কেননা তিনি আমার ভালোবাসার স্থির পর্দাকে ছিন্ন করে দিয়েছেন। আরও শোকরিয়া জ্ঞাপন করি, তিনি এই উদ্বেলিত স্পন্দন এবং সতেজ-জাগ্রত ভালোবাসার মোড় ঘুরিয়ে এমন ব্যক্তির দিকে নিবন্ধ করেছেন, যার থেকে বেশি এই ভালোবাসার হকদার দ্বিতীয় কেউ নেই। যিনি এই বিশ্বজগতে সৌন্দর্য-সৌকর্য, অনুগ্রহ-অনুকম্পা ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রতিচ্ছবি। যার থেকে বেশি আকার-আকৃতিতে, স্বভাব-চরিত্রে এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ দিকগুলোর চিত্তাকর্ষক আর কোনও মানবীয় আদর্শ নমুনা খালিক ও মালিক এবং একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় কাউকে সৃষ্টি করেননি। এ জাতির সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ জাতি মন থেকে তার সে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। হয়েছে প্রেম ও মহব্বতের সে স্বাদ থেকে বঞ্চিত। আল্লামা ইকবাল (র) যথার্থই বলেছেন,

شبے پیش خدا بگریستم زار مسلمانان چرا زارند وخوارند

ندا آمد نمی دانی کہ ایں قوم دلے دارند ومحبوبے ندارند

"আল্লাহ পাকের অবারিত রহমান, বর্ষিত হোক আপনার উপর হে সুলাইমান! আপনার কিতাব থেকে আমি এমন দু'টি নেয়ামত পেয়েছি, একজন মুসলমানের জন্য ইসলামের পর এর চেয়ে বড় আর কোনও নেয়ামত নেই। এক. প্রেম ও মহব্বতের নেয়ামত। দুই. এই মহব্বতের যথার্থ পাত্র ও সঠিক ব্যবহার ক্ষেত্রের নেয়ামত। আর বাস্তবিকই এ দু'টি নেয়ামত কতই না বড়।"

নতুন পৃথিবী

সাধারণতঃ বলা হয়, এ পৃথিবীর বয়স অনেক হয়েছে। কিন্তু এ পৃথিবীর কয়েকবার ঝিমিয়ে পড়ে জেগে উঠেছে। মরে মরে জীবিত হয়েছে। শেষবার যখন এ পৃথিবী মৃত্যুর ঘোর থেকে জেগে উঠেছে এবং হুঁশ জ্ঞানের চোখ খুলেছে, সেদিন মক্কার অবিসংবাদিত নেতা আব্দুল মুত্তালিবের ঘরে তার দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করে। জন্মের সময় তিনি ছিলেন ইয়াতিম। কিন্তু তিনি বিশ্বমানবতার নেতৃত্ব দিয়েছেন। পৃথিবীকে এনে দিয়েছেন নতুন জীবন। ঘুমের ঘোরে যে বয়স পার হয়েছে– সে কোন্ বয়স? আত্মহননে যে জীবন কেটেছে, সে কোন্ জীবন? কাজেই সত্য জানতে চাইলে বর্তমান পৃথিবীর কাজের বয়স এখনও পনেরশত বছর হয়নি।

ষষ্ঠ খৃস্ট শতকে মানবতার গাড়ি এক ভয়ঙ্কর পথে গিয়ে পৌঁছেছিল। চারদিকে ছড়িয়ে ছিল তিমির অমানিশা। বেড়েই চলছিল পথের অন্ধকার। ক্রমেই হচ্ছিল গতিশীল। এই গাড়িতে মানবতার পুরো কাফেলা এবং সকল বনী আদম আরোহী ছিল। হাজার বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং লাখো মানুষের মেহনত ছিল। গাড়ির যাত্রীসকল বিভোর ছিল মধুর নিদ্রায় কিংবা আরেকটি সিট পাওয়ার মনোবাসনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল পরস্পর হাতাহাতি ও গৃহযুদ্ধে। মন-মানস অনেকটাই ভঙ্গুর ছিল। কেউ তার সঙ্গীসাথীর উপর অসন্তুষ্ট হলে আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে বসত। কেউ কেউ নিজের মনমত লোকদের উপর কর্তৃত্ব চালাত। কেউ ছিল পানাহারে ব্যস্ত। কেউ নাচ-গান-বাদ্য নিয়ে উন্মাদ-বেপরোয়া। কিন্তু কেউ লক্ষ্য করল না যে, গাড়ি কোন্ খাদের দিকে যাচ্ছে এবং তা কত সন্নিকটে?

মানবতার দেহয় ছিল সুঠাম-স্বাস্থ্যবান। কিন্তু আত্মা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। মেধা-মস্তিষ্ক অবসাদগ্রস্থ। মন-প্রাণ অনুভূতিহীন মৃতপ্রায়। শিরাতন্ত্রিগুলো স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। চোখগুলো পাথর হয়ে যাচ্ছিল। ঈমান-ইয়াকীন থেকে কয়েক যুগ আগেই বঞ্চিত হয়েছিল এ মানবতা। গোটা রাজ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একজন ঈমানদার পাওয়া যেত না। গোটা পৃথিবী জুড়ে সংশয়-সন্দেহের দখল ছিল। মানুষ স্বয়ং নিজেকে অপদস্ত করেছিল। মানুষ তার

দাস-দাসী ও চাকর-নওকরদের সামনে মাথা নত করেছিল। এক আল্লাহ ছাড়া সকলের সম্মুখে সে কপাল ঠুকতে ছিল সদা প্রস্তুত। হারাম তাদের মুখে জড়িয়ে পড়েছিল।

شراب اس کی گھٹی میں گویا پڑی تھی
جوا اس کی دن رات کی دل لگی تھی

'মদের বোতল পড়েছিল যেন তাদের ঝুলিতে, দিনরাত জুয়ায় তাদের মন-প্রাণ ছিল নিবিষ্ট।'

বাদশা প্রজাদের রক্তের উপর প্রতিপালিত হত। গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে বসবাস করত। তাদের কুকুর উল্লাস করত। আর মানুষ ক্ষুৎ-পিপাসায় করত ছটফট। জীবনের মানদণ্ড এত চুঁড়ায় উঠে গিয়েছিল যে, বেঁচে থাকা দায় হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি মাপকাঠিতে না পড়ত, তাকে জীবজন্তু মনে করা হত। নতুন নতুন ট্যাক্স ও শর্তারোপ করে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের কোমর ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ঠুনকো ব্যাপার নিয়ে দেশের পর দেশ ও নানা জাতিকে ধ্বংস করা তাদের বা-হাতের খেলা ছিল। সকল জীবন দর্শনে চলছিল ধর-পাকড়, জুলুম-নিপীড়ন, শোষণ-তোষণ ও বাড়াবাড়ির রমরমা অবস্থা। গোটা রাষ্ট্রে আল্লাহর একজন বান্দাও এমন পাওয়া যেত না, যার ভেতরে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি লাভের চিন্তা-ভাবনা আছে কিংবা সে সত্য পথের সন্ধানী। মোটকথা, এ ছিল নামে মাত্র জীবন। কিন্তু বাস্তবে সুদূরপ্রসারী ও সুদীর্ঘ আত্মহনন।

পৃথিবীর সংশোধন-সংস্কার মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিল। পানি উঠে গিয়েছিল মাথার উপরে। এটি কেবল একটি দেশের স্বাধীনতা এবং একটি জাতির উন্নতির ব্যাপার ছিল না। ব্যাপার ছিল বিশ্ব মানবতার জীবন-মরণের। কোনও এক ক্ষতির প্রশ্ন ছিল না। গোটা মানবতার দেহকায় ছিল পাপ-পঙ্কিলতায় ভরপুর। আঁচল ছিন্নভিন্ন। সংস্কারের লক্ষ্যে যে ব্যক্তিই অগ্রসর হয়েছে, সে-ই এই বলে পিছনে সরে এসেছে,

تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا

"তোমার মন-মানসে তো অনেক কাজই বেরিয়েছে রিফু করার।"

দার্শনিক-চিকিৎসক, কবি-সাহিত্যিক কেউই এ ময়দানের ত্রাতা হয়নি। সকলেই ঐ একই রোগে আক্রান্ত ছিল। এক রোগী আরেক রোগীর চিকিৎসা সেবা কী করবে? যার নিজেরই ঈমান ইয়াকীন নেই, সে অন্যদেরকে কিভাবে ঈমান-ইয়াকীনে ভরে দিবে? যে নিজেই তৃষ্ণাকাতর, সে কিভাবে অপরের তৃষ্ণা

মেটাবে? বিশ্বমানবতার কপালে কঠিন তালা ঝুলে ছিল। হারিয়ে গিয়েছিল চাবি। জীবনের রশিগুলো পেঁচিয়ে গিয়েছিল। ছুটানো সম্ভব হচ্ছিল না।

এই বিশ্বজগতের একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ তা'আলার কাছে তার ঘরের এ দুরাবস্থা পছন্দ হল না। অবশেষে তিনি আরবের স্বাধীন ও সাদাসিধে জাতির মাঝে, যারা ফিতরাতের কাছাকাছি ছিল– একজন নবী প্রেরণ করেন। যিনি ব্যতীত এই বিপন্ন পৃথিবীর সংস্কার আর কেউ করতে পারত না। এ নবীর সম্মানিত নাম মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে তার উপর অসংখ্য শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا
کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لئے

এ জীবনের সবকিছুই সঠিক-নিরাপদ ছিল। কিন্তু অযথা-অপাত্রে জীবনের চাকা ঘুরছিল বিপথে। আসল সমস্যা ছিল এই যে, জীবনের নীতি-নৈতিকতার পেরেক আত্মগোপন করেছিল। যাবতীয় সমস্যা ও দুরাবস্থা ছিল এরই। সে নিয়ম-শৃঙ্খলার পেরেক কী ছিল? বস্তুতঃ তা হচ্ছে এ পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার সহীহ ইলম-জ্ঞান, তারই ইবাদত-আনুগত্য করার সিদ্ধান্ত, তার প্রেরিত নবী রাসূলকে মেনে চলা, তাদের নির্দেশিত হেদায়াত ও শিক্ষা অনুযায়ী জীবন যাপন করা এবং পরজীবনের সুদৃঢ় বিশ্বাস।

তারা এ জীবনের পেরেক বসিয়ে দিয়েছেন, তবে নিজের জীবন এবং নিজের পরিবার ও বংশকে বিপদে ফেলে এবং নিজের জীবনের সবকিছু কুরবানী করে। তারা জীবনের এ লক্ষ্যে রাজকীয় মুকুট ধুলি ধূসরিত করেছেন। ধন-সম্পদ ও জীবন জীবিকার জন্য তেমন কোনও পদক্ষেপ নিতে অপছন্দ করতেন। প্রিয় জন্মভূমি ছেড়েছেন। সারাজীবন কষ্টে কাটিয়েছেন। ক্ষুধার যাতনায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। কখনও পেট ভরে আহার করেননি। পরিবারের লোকদেরকেও অনাহারে-অর্ধাহারে শরীক রেখেছেন। পার্থিব সকল কুরবানী ও বিপদ-আপদে আগে আগে আর সব ধরনের স্বাদ-ভোগ-বিলাস থেকে দূরে দূরে থাকতেন। কিন্তু ততদিন পর্যন্ত পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেননি, যাবৎ না এ পৃথিবীকে সঠিক-সরল পথে উঠিয়ে এনেছেন এবং ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছেন।

মাত্র তেইশ বছরে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যায়। পৃথিবীর সুপ্ত হৃদয় জেগে ওঠে। সৎকাজ-পুণ্যকর্মের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ভাল-মন্দের পার্থক্য সূচিত হতে থাকে। এক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীর রুদ্ধদ্বার খুলে যায়। এক মানুষ আরেক মানুষের সামনে এবং নিজেদের দাস-দাসীর সামনে মস্তকাবনত

করতে লজ্জাবোধ হতে থাকে। উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ দূরীভূত হয়। জাতীয় ও বংশীয় গর্ব-অহমিকা ভেঙ্গে পড়ে। নারী জাতি যথার্থ অধিকার লাভ করে। শ্রমিক ও নিরাশ্রয়দের পুনর্বাসন হয়। মোটকথা, দেখতে দেখতে পৃথিবী বদলে যায়। যেখানে গোটা দেশময় এক আল্লাহর প্রতি ভীত কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হত না, সেখানে আজ লক্ষাধিক এমন মানুষের জন্ম হয়, যারা আলো-আঁধার সর্বত্রই এক আল্লাহর প্রতি ভীত ছিলেন। যারা ঈমান-ইয়াকীনের অমূল্য ধনে ছিলেন ধনবান, যারা দুশমনের সাথেও ইনসাফের আচরণ করতেন, যারা অধিকারের ব্যাপারে আপন সন্তানেরও তোয়াক্কা করতেন না, যারা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেও ছিলেন অকুণ্ঠচিত্ত, যারা অপরের আরামের চিন্তায় নিজের দুঃখ-যাতনা ও বিপদ-আপদ সহ্য করতেন, যারা দুর্বলদেরকে প্রাধান্য দিতেন সবলদের ওপর, যারা রাতের আঁধারে ইবাদতগুজার, দিবসে অশ্বারোহী; ধন-মান, রাজ্যক্ষমতা, শক্তি, ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুর উপরই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী, সবকিছুর উপর বিজয়ী; কেবল এক আল্লাহর আজ্ঞাবহ, কেবল এক আল্লাহর গোলাম– তারা এ পৃথিবীকে ইলম-ইয়াকীন, ঈমান-আমল, শান্তি-নিরাপত্তা, সভ্যতা-ভদ্রতা, আধ্যাত্মিকতা ও আল্লাহভীরুতায় ভরে দিয়েছেন।

যুগের আবহাওয়া বদলে গেছে। শুধু মানুষ কি বদলাবে? বদলে গেছে গোটা জগৎ, বদলে গেছে আসমান-যমীন, এসব বিপ্লব ঐ নবী মুহাম্মাদ (সা) -এর চেষ্টা-সাধনা ও শিক্ষারই সুফল। বনী আদমের উপর এত বড় অনুগ্রহ আর কোনও আদম-সন্তানের নেই, যে অনুগ্রহ ও ইহসান আছে মুহাম্মাদ (সা)-এর বিশ্বমানবতার ওপর। যদি এই পৃথিবী থেকে সেসব অনুগ্রহ ছিনিয়ে নেওয়া হয়, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) যা কিছু এ পৃথিবীকে দিয়েছেন, তাহলে মানব সভ্যতা হাজার হাজার বছর পিছিয়ে যাবে। বঞ্চিত হবে জীবনের অতি প্রিয় ও উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো থেকে।

রাসূলে কারীম (সা) -এর শুভ জন্মদিন কেন বরকতময় হবে না –এদিন তো পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব জন্মগ্রহণ করেছেন, যিনি এ পৃথিবীকে দান করেছেন নতুন ঈমান ও নতুন জীবন।

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے
وہ سب پود انہیں کی لگائی ہوئی ہے

জীবনের প্রতিচ্ছবি

চৌদ্দশত বছর পূর্বের পৃথিবীর প্রতি একটু লক্ষ্য করুন। উঁচু উঁচু অট্টালিকা, স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপ এবং আড়ম্বর-জাঁকজমক পোশাক ছুড়ে ফেলুন। এসব তো পুরোনো ছবিসমূহের জোড়াতালি ও মৃত জাদুঘরেও আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে। দেখুন, মানবতাও কখনও মরে মরে জেগে উঠে। পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্তসীমা পর্যন্ত ঘুরে ফিরে দেখুন এবং দমবন্ধ করে কান পেতে থাকুন, কোথায় তার শিরা চলে এবং প্রাণস্পন্দনরত মনে হয়?

জীবন সমুদ্রে বড় মাছেরা ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলত। মানবতার অরণ্যে বাঘ-চিতা, শূকর ও হিংস্র হায়েনারা ভেড়া-বকরীগুলো খেয়ে ফেলত। ভাল মন্দের ওপর, অপকর্ম সৎকর্মের ওপর, অভদ্রতা-নীচুতা ভদ্রতা-আভিজাত্যের ওপর, প্রবৃত্তি বিবেকের ওপর, পেটের চাহিদা আত্মিক চাহিদার উপর প্রাধান্য লাভ করেছিল। কিন্তু এমতাবস্থায়ও এত বিশাল বিস্তৃর্ণ যমীনে কোথাও এর বিপরীত চিন্তা-চেতনা ছিল না। মানবতার প্রশস্ত ললাটে ক্ষোভের কোনও চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হত না। গোটা পৃথিবী নিলামের এক মণ্ডপ কিংবা খোলাবাজার হয়ে গিয়েছিল। বাদশা-ওজীর, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেরই এই বাজারে মূল্য হাঁকা হচ্ছিল। সকলেই ক্ষীণ দরজায় দাঁড়িয়ে বকবক করছিল। এমন কেউই ছিল না, যারা মানবতার রত্ন ক্রেতাদের সাহসিকতায় উঁচু হবে। যে চিৎকার করে বলবে, এই গোটা বিশ্বে আমার সাফল্য লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। এই গোটা পৃথিবী ও সমগ্র জীবন আমার সাহসিকতা-চেতনাবোধ অপেক্ষা কম ছিল। তাই আরেকটি চিরস্থায়ী জীবন আমার সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি এই ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবন এবং এই সংকীর্ণ পৃথিবীর এক তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে আমি নিজের আত্মাকে কিভাবে বিক্রি করতে পারি?

দেশ ও জাতির, গোত্র ও ভ্রাতৃত্বের চেয়ে অগ্রসর হয়ে আত্মীয় ও পরিবারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খেলাঘর তৈরী হয়েছিল। বড় বড় উচ্চ সাহসী-অকুতোভয় ব্যক্তিত্ব, যারা তাদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্বের বড় উচ্চ দাবীদার ছিল, খর্বকায় লোকদের মত সেসব খেলাঘর ও ঝুপড়িতে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। কারও তাতে সংকীর্ণতা ও নীচুতা অনুভব হত না। কারও

এর চেয়ে অধিকতর প্রশস্ত মানবতার উপলব্ধি পর্যন্ত ছিল না। জীবন পুরোপুরিভাবে ভোগ-বিলাস, উম্মাদনা, প্রতারণা ও শঠতায় নিমজ্জিত ছিল।

মানবতা যেন এক মরদেহ ছিল। তাতে আদৌ প্রাণস্পন্দন, অন্তর্জ্বালা ও প্রেম-ভালবাসার উষ্ণতা অবশিষ্ট ছিল না। মানবতার মাটিতে এমন এমন ঝোপ-জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছিল, যার চতুর্দিকেই ছিল গহীন অরণ্য, যেখানে ছিল রক্তখেকো হিংস্র জীবজন্তু আর বিষাক্ত কীটপতঙ্গ, নতুবা ছিল জলাভূমি। যেখানে থাকত শরীরে জড়িয়ে রক্তচোষা জোঁক। এ অরণ্যে সব ধরনের ভয়ঙ্কর হিংস্র জীবজন্তু, সব ধরনের শিকারী পাখি আর ঐ জলাভূমিতে সব ধরনের জোঁকই পাওয়া যেত। কিন্তু বনী আদমের এই জনপদে কোনও মানুষ দৃষ্টিগোচর হত না। যে ক'জন মানুষ ছিল, তারাও আত্মগোপন করেছিল গিরিগুহায়, পাহাড়ের চূড়ায় এবং খানকা ও উপসনালয়ের নির্জন-নিভৃত কোণে। সেখানে বসেই তারা নিজের মঙ্গল প্রার্থনা করত কিংবা মানব সমাজে থেকেও জীবনবিমুখ হয়ে চোখ কান বন্ধ করে বৈরাগ্য দর্শনের সাথে নিজের মনপ্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিল কিংবা কাব্য কবিতায় নিজের দুঃখ-ব্যথা ভুলার বৃথা চেষ্টা করছিল। জীবন যুদ্ধে কোনও বীরপুরুষ ছিল না।

সহসা মানবতার এই হিম শীতল দেহে উষ্ণ খুনের এক তরঙ্গ বয়ে গেল। শিরা-উপশিরায় কম্পন এবং দেহে স্পন্দন সৃষ্টি হয়েছিল। যেসব পশুপাখি, চিল-শকুন একে মরদেহ মনে করে এই অনুভূতিহীন নিস্তেজ দেহে বাসা বেঁধে ছিল, তাদের কাছে নিজ ঘর নড়বড়ে এবং শরীর কম্পমান মনে হল। প্রবীণ সীরাত রচয়িতাগণ তাদের নিজ নিজ ভাষায় এ প্রসঙ্গে বলেন, "ইরান সম্রাট কিসরার রাজপ্রাসাদের মিনারগুলো ধ্বসে পড়ল। পারস্যের সহস্র বছরের অগ্নিশিখা সম্পূর্ণ নিভে গেল।"

সমকালের ঐতিহাসিকগণ এ প্রসঙ্গে বলেন, মানবতার এই আভ্যন্তরীণ প্রকম্পনে তার বাইরের অংশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল। তার এই নিস্তেজ জড়ছাদে যতগুলো জরাজীর্ণ দুর্বল দূর্গ বানানো হয়েছিল, তাতে ভূমিকম্প হল। মাকড়সার সকল জাল ছিন্ন হয়ে গেল। খড়কুটোর জীর্ণ কুটিরগুলো ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল। মাটির আভ্যন্তরীণ কম্পন বা ভূমিকম্পে যদি মজবুত প্রাসাদ এবং শক্ত সেতুগুলো শীতের পত্র-পল্লবের মত ঝরে পড়তে পারে, তাহলে নবী করীম (সা) এর শুভাগমনে কিসরা-কায়সারের মনগড়া ব্যবস্থাপনায় কেন কম্পন সৃষ্টি হবে না?

মানবতার হিম শীতল দেহে তরঙ্গায়িত জীবনের এই তপ্ত লহু মুহাম্মাদ (সা) এর আবির্ভাবের সময়কার ঘটনা। যা সংঘটিত হয়েছে সভ্য পৃথিবীর প্রাণকেন্দ্র মক্কা মুকাররমায়। তিনি বিশ্ববাসীকে যে পয়গাম শুনিয়েছেন, তার সংক্ষিপ্ত একটি বাক্যে জীবনের সকল শাখা-প্রশাখায় পরিব্যপ্ত। ইতিহাস

সাক্ষী যে, মানব জীবনের ভিত্তিমূল এবং তার ছোট সংক্ষিপ্ত জীবনের শেকড় কখনও এতটা প্রচণ্ডভাবে নাড়ানো যায়নি, যতখানি নাড়ানো সম্ভব হয়েছে কালিমায়ে তাওহীদ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর ঘোষণার মাধ্যমে। পৃথিবীর মেধাবী চিন্তাশীলদের মাথায় কখনও এতটা চপেটাঘাত পড়েনি, যতখানি আঘাত লেগেছে এ শব্দমালায়। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। তারা গর্জে উঠে বলল– اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هٰذَا لَشَيْئٌ عُجَابٌ (সে কি, আমরা যেসব উপাস্যের পূজা-অর্চনা করি এবং আমরা যাদের বান্দা হয়ে আছি, সেসব উপাস্যদের উড়িয়ে দিয়ে কেবল একজন উপাস্য রাখার মনোস্থির করেছে? এ তো বড় উদ্ভট-বিস্ময়কর কথা!)

এসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদরা সিদ্ধান্ত নিল, এ হচ্ছে আমাদের চিরাচরিত জীবন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক গভীর ও পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। আমাদেরকে তা প্রতিহত করতে হবে।

وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلٰى اٰلِهَتِكُمْ اِنَّ هٰذَا لَشَيْئٌ يُّرَادُ.

(তাদের সর্দার ও নেতৃবর্গ একে অপরের কাছে গেল যে, তোমরা চলো এবং স্বীয় উপাস্যদের উপর অটল অবিচল থাকো। মনে হচ্ছে, এটি চূড়ান্ত কোনও কথা।)

এ শ্লোগান জীবন ও মানবতার গোটা অবয়বের উপর কার্যকরী এক আঘাত ছিল, যা মেধা-মননের পূর্ণ ছাচ এবং জীবনের পুরো ধাঁচকে প্রভাবিত করত। এর উদ্দেশ্য ছিল, যেমনটি আজও মনে করা হয়– এ পৃথিবী এমনিতেই উৎপন্ন কোনও ঝাড়-জঙ্গল নয় বরং এটি নিশ্চয়ই কোনও মালির গড়া সাজানো বাগান। আর মানুষ হচ্ছে, এ বাগানের সর্বোৎকৃষ্ট ফুল। হাজার বসন্তের উপাদান এ পুষ্প উদ্দেশ্যহীন নয় যে, পদদলিত হয়ে থাকবে। মনুষ্যত্বের রত্নের মূল্য ঐ সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্যে দিতে পারে না। তার মধ্যে সেই অসীম চাওয়া-পাওয়া, উঁচু সাহস, উচুঁ মানসিকতা এবং সেই ব্যথা ভারাক্রান্ত অন্তর রয়েছে, গোটা পৃথিবী মিলেও যাকে প্রশান্ত করতে পারে না। এই তুচ্ছ-সামান্য জিনিসের দুনিয়া তার সাথে চলতে পারে না। তার জন্য প্রয়োজন এক চিরস্থায়ী এবং অন্তহীন দুনিয়া। যার সামনে এই জীবন কেবল এক বিন্দু, এ পৃথিবী শিশুদের খেলনা সামগ্রী। সেখানের সুখ-শান্তির তুলনায় এখানকার সুখ-শান্তি এবং সেখানের দুঃখ-যাতনার সামনে এখানের দুঃখ-দুর্দশার কোনও বাস্তবতা নেই। কাজেই মানুষের জন্মগত ও স্বভাবগত চাহিদা হল, এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য, তার মা'রেফাত লাভ, আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা এবং তদানুযায়ী জীবন যাপনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। কোন প্রাণী, কোনও সুপ্ত ও আকস্মিক শক্তি, কোন গাছপালা, পাহাড়, কোন ধরনের ধাতব ও জড় পদার্থ, কোনও ধন-সম্পদ, কোনও সম্মান

ও পদমর্যাদা, কোনও শক্তি-ক্ষমতা এবং কোনও অলৌকিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও বড়ত্বের সামনে বান্দা ও চাকর-নওকরের সামনে কুর্নিশ করা এবং সবুজ ঘাসের মত পদপিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন মানুষের নেই। সে কেবল এক মহাশক্তির সামনে সবচেয়ে বেশি নিচু আর সকল নীচ ও হীনদের বিপরীতে সর্বাধিক উৎকৃষ্ট হবে। সে হবে গোটা বিশ্বজগতের মাখদুম ও সেবাযোগ্য। আর এক সত্ত্বার খাদেম। তার সামনে ফিরিশতাকে সিজদা করিয়ে আর তাকে এক আল্লাহ ব্যতীত প্রত্যেকের সিজদা থেকে বারণ করে প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিশ্বজগতের সমূহ শক্তি, ফিরিশতাগণ যার রক্ষক, তার সম্মুখে পদানত ও নতশির। এর জবাবে তার শির অবনত থাকবে এক আল্লাহর সামনে।

বিশ্ববাসীর মেধা-মনন এত নিচে নেমে গিয়েছিল যে, তারা প্রবৃত্তিপূজা, দৃশ্যমান বস্তু, দেহ ও পাকস্থলীর সীমানার বাইরে সহজে কাজ করতে পারত না। মানুষের মস্তিষ্ক এতটাই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল যে, সে কোনও মানুষ সম্পর্কে গভীর এবং উঁচু কল্পনা করতে পারত না। সে কিছু অঙ্গীকার করে নিয়েছিল, বানিয়ে নিয়েছিল কিছু অলীক নিয়ম-নীতি। প্রত্যেক নতুন মানুষকে এই নিয়মনীতির মানদণ্ডে পরিমাপ করত। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেসব উন্নতি-উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল, প্রত্যেক উৎকর্ষতাই মানুষকে তার সম্মুখে এনে দেখত। তারা অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করেছে। তারা রাসূলের কারীম (সা) এর ব্যাপারে এর চেয়ে বেশি ভাবতে পারেনি যে, হয়ত তিনি ধন-সম্পদ কিংবা পুঁজিবাদ ও বাদশাহী কিংবা সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রত্যাশী। ইনসাফের দৃষ্টিতে সে যুগে দুনিয়ার অভিজ্ঞতা এর চেয়ে বেশি আর কী ছিল? সে যুগের সচেতন, অকুতোভয়, সাহসীদের এর চেয়ে উঁচুতে উড্ডয়ন এ পৃথিবী কবে দেখেছিল?

তারা রাসূল (সা) এর খেদমতে একটি প্রতিনিধি দল পাঠাল। বস্তুতঃ এ ছিল সে যুগের মেধা-মনন ও মনস্তত্ত্বের নিখুঁত প্রতিফলন আর তারা যা বলল, তা ছিল যুগ সমাজের চিন্তাধারা ও উপলব্ধির সঠিক ব্যাখ্যা। রাসূলে কারীম (সা) তাদের প্রলোভনের যে জবাব দিলেন, তা নবুওয়াতের যথার্থ ঘোষণা এবং উম্মতে মুসলিমার বাস্তব অবস্থার আসল বহিঃপ্রকাশ। নবীজী প্রমাণ করে দিলেন, তিনি এসবের কোনটির প্রত্যাশীই নন। তিনি যে মহান দাওয়াত দিচ্ছেন, তা তাদের প্রলোভিত উৎকৃষ্ট জিনিসগুলো থেকেও অধিকতর উৎকৃষ্ট ও উঁচুতর। যেমন আকাশটি এ মাটি থেকে। তিনি ব্যক্তিগত সুখ-শান্তি ও উন্নতির জন্য এতটুকুও চিন্তিত নন বরং বিশ্বমানবতার মুক্তি এবং তাদের সুখ-শান্তির চিন্তায় বিভোর। তিনি এই ধূলির ধরায় নিজের কোনও 'কৃত্রিম জান্নাত' কিংবা বাগানবাড়ি ও আলীশান ভবন বানানোর অভিলাষীও নন বরং জান্নাত থেকে নির্বাসিত মানুষকে প্রকৃত জান্নাতে চিরদিনের জন্য প্রবেশ করাতে চান। তিনি

নিজের নেতৃত্বের জন্যও প্রয়াসী নন বরং সকল মানুষকে তিনি মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে প্রকৃত বাদশার গোলামীতে দাখিল করাতে চান। এরই ভিত্তিতে এ জাতি সুসংহত হয়েছে এবং এ বাণী ও সওগাত নিয়েই ছড়িয়ে পড়েছে দিগদিগন্তে। তাঁর দূতগণ– যাদের ভেতর দাওয়াত-তাবলীগের খাঁটি প্রাণ এবং ইসলামের সঠিক জীবনধারা ছিল, তারা কিসরা-কায়সারের ভরা দরবারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন, আমাদেরকে এ কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা নিযুক্ত করেছেন, যেন আমরা তার বান্দাদেরকে সৃষ্টিকূলের দাসত্ব থেকে বের করে এনে আল্লাহ পাকের দাসত্ব ও গোলামীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে এনে, এর প্রশস্ততায় এবং ধর্ম-বর্ণের অন্যায়-জুলুম থেকে বের করে এনে ইসলামের ন্যায়-নিষ্ঠা ও সততায় প্রবিষ্ট করি। এরপর যখন তাঁদের নিজেদের স্বকীয় নিয়ম-নীতির উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও রাজ্য শাসনের সুযোগ হয়েছে, তখন তাঁরা যা কিছু বলতেন এবং অন্যদেরকে যার দাওয়াত দিতেন– তা কার্যকর করে দেখিয়েছেন। তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্র শাসনের যুগে কোনও মানুষের পুজা-অর্চনা হত না বরং এক আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য চলত। কোনও মানুষ কিংবা দলের হুকুম চলত না এবং একমাত্র আল্লাহর হুকুম চলত। তাদের শাসক- যাকে তাঁর খলীফা বলত, তিনি সামান্য মানবীয় তাচ্ছিল্য, মানহানি ইত্যাদির কারণে বলে উঠতেন, 'মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে স্বাধীনরূপে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তোমরা তাকে কবে থেকে গোলাম বানিয়ে ফেলেছ?' তাদের বড় বড় শাসক বিশাল সাম্রাজ্যের রাজধানীতে এমনভাবে বসবাস করতেন যে, লোকজন তাকে শ্রমজীবী ভেবে তার মাথায় বোঝা উঠিয়ে দিত আর তিনি তা সেসব লোকের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসতেন।

তাদের ধনাঢ্য ব্যক্তিরাও এমনভাবে জীবনযাপন করতেন, মনে হত যেন তারা এ জীবনকে কোন জীবন এবং এই সুখ-শান্তিকে কোনও সুখ-শান্তিই মনে করেন না। তাদের দৃষ্টি অন্য কোনও জীবনের ওপর। তাদের চাওয়া-পাওয়া অন্য কোন সুখ-শান্তি।

এই উম্মতের অস্তিত্ব যেন গোটা পৃথিবীতে বর্তমান। বিশ্বে প্রতিটি প্রান্তে বৈষয়িক বাস্তবতা এবং দৈহিক স্বাদ ভিন্ন সম্পূর্ণ আরেকটি বাস্তবতার ঘোষণা। এ উম্মতের প্রত্যেক সদস্য জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুবরণ করে এ বাস্তবতারই ঘোষণা করে যে, পৃথিবীর ক্ষমতাধর পরাশক্তি থেকে আরও বড় ক্ষমতাশালী পরাশক্তি ও সুপ্রীম পাওয়ার আছে। এ জীবন অপেক্ষা আরও কঠিন বাস্তব জীবন আছে। তারা এ জগত-সংসারে এলে তাদের কানে সেই মহাসত্যের আযান এবং সেই চরম বাস্তবতার আহ্বান শোনানো হয়। তারা মৃত্যুবরণ করলে সেই সাক্ষ্য ও প্রদর্শনীর সাথেই তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানানো হয়। এ

বিশ্বজগতে যখন অচৈতন্য ও মৃত্যুসম নীরবতা ছেয়ে যায়, শহরের সকল মানুষ জীবিকার সন্ধানে আপাদমস্তক ডুবে যায়, বৈষয়িক প্রয়োজন ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রয়োজন এবং চাক্ষুস বাস্তবতা ছাড়া অন্য কোনও বাস্তবতা জগদ্বাসীর দৃষ্টিগোচর হয় না, তখন তাদের সেই আযান এবং আহ্বানই এই ভেল্কিবাজি ভেঙে দেয়। ঘোষণা করে, না! এই দেহ, এই পেট থেকে অধিক স্বচ্ছ এবং কঠিন এক বাস্তবতা আছে। আর সেটিই সফলতার আসল পথ। حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ 'তোমরা নামাযের দিকে এসো, তোমরা সফলতার দিকে এসো।' হাটবাজারের কোলাহল এই শ্লোগানের সামনে নিস্তব্দ হয়ে যায়। সকল বাস্তবতা এই বাস্তবতার সামনে নীচু ও ম্রিয়মান হয়ে যায়। আর আল্লাহর বান্দারা এই ধ্বনি শুনে পাগলপারা হয়ে ছুটতে থাকে। রাত্রে যখন গোটা শহর মধুর ঘুমে নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়, এই ব্যস্ততম পৃথিবী বিশাল এক নির্জন গোরস্তানে পরিণত হয়, হঠাৎ করে এই মৃতপুরীতে এমনভাবে প্রাণ ফিরে আসে, যেভাবে রাতের আঁধার চিরে প্রভাতের সূর্যাভা প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। 'اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ' ঘুমের চেয়ে নামায ভাল' এর আহ্বানে তন্দ্রাচ্ছন্ন বিশ্ব মানবতা এক সতেজতা ও নতুন জীবনের পয়গাম লাভ করে। যখন কোনও শক্তি ও রাজত্বে ধোঁকায় নিমজ্জিত ব্যক্তি اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى 'আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপালক' এবং مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِىْ 'আমি ছাড়া তোমাদের দ্বিতীয় কোন উপাস্য নেই' এই শ্লোগান তোলে, তখন একজন অসহায় দরিদ্র মুয়ায্যিন তার রাজ্যের সুউচ্চ মিনার থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়' বলে তার ঐ খোদায়ী দাবীর উপহাস করে। আর اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে প্রকৃত রাজত্বের অলঙ্ঘনীয় মহাসত্যের ঘোষণা করে। এভাবে বিশ্বচরাচরের নিয়ম-শৃংখলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকে।

এই জ্ঞান, ঈমান ও ঘোষণার উৎস জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) - এর শুভাগমন এবং তাঁর শিক্ষা ও দাওয়াত। আজ এই জ্ঞান, ঈমান ও ঘোষণাই বিশ্বজগতের নতুন জীবনের সুতিকাগার এবং প্রত্যেক সুষ্ঠু-সঠিক বিপ্লবের একমাত্র অবলম্বন। কবির ভাষায়,

یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی کہاں سے پیدا
وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندۂ مومن کی اذاں سے پیدا

"যে মন্তর কখনো আজ কখনো কাল,
জানি না, উৎস তার কোনখানে?
যে মন্ত্রে কাঁপে জালিমের রাজপ্রাসাদ
উৎস যে তার মুমিন বান্দার আযানে।"

হেরাগুহার আলোকরশ্মিতে

আমি জাবালে নূরে চড়েছি। সেখানে অবস্থিত রাসূলে কারীম (সা) এর স্মৃতিধন্য 'গারে হেরা' নামে খ্যাত গুহায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি। সেখানে পৌঁছে আমি মনে মনে বললাম, এই সেই জায়গা, যেখানে মহান আল্লাহ তা'আলা হযরত রাসূলে কারীম (সা) কে নবুওয়াতের মহাসম্মানে ভূষিত করেছেন এবং প্রথমবার অহী অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং (এ কথা বলাই যথার্থ যে,) এখান থেকে সেই সোনালী সূর্য উদয় হয়েছে, যার কিরণ গোটা পৃথিবীতে আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত করেছে, দান করেছে এক নতুন জীবন।

এ পৃথিবী প্রতিদিন একটি নতুন সকালকে স্বাগতম জানায়। কিন্তু বেশিরভাগই এ সকালে না কোনও নতুনত্ব থাকে, না থাকে কোনও শ্রেষ্ঠত্ব কিংবা বিরল কিছু। আর না প্রত্যেক সকাল সৌভাগ্যের সকাল হয়। এসব সকাল এলে তো মানুষ জেগে ওঠে ঠিক। কিন্তু তাদের অন্তরাত্মার ঘুমে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। মন-প্রাণ পূর্ববৎ অলস নিদ্রায় পড়ে থাকে। কী মূল্য আছে এমন অন্ধকার দিনগুলোর এবং এমন সব মিথ্যে প্রভাতের। কিন্তু ঐ গুহা থেকে প্রকৃত অর্থে সুবহে সাদিক উদ্ভাসিত হয়েছিল। যার আলো-আভা সবকিছুকে আলোকিত করেছে। যার আগমন সবকিছুকেই জাগ্রত করেছে। আর এই প্রভাত আলোই ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। বদলে গেছে যুগের রং।

এ সকাল আসার পূর্বে মানব জীবনের জন্মগত অবস্থা-অভ্যাস ছিল অবদমিত। এর সকল দরজায় ঝুলছিল ভারী ভারী তালা। এক কথায় মানব জীবনের প্রকৃত অবস্থা যেন কিছু তালাবদ্ধ দরজা এবং কিছু বদ্ধ তালার সমষ্টি হয়ে গিয়েছিল। বিবেক-বুদ্ধির উপর তালা ঝুলছিল। যা খুলতে হাকীম-দার্শনিকগণও ছিল অপারগ। মানবাত্মা ও মানব হৃদয় ছিল তালাবদ্ধ, যাকে মুক্ত করতে সংস্কারক ও উপদেশ দানকারী ওয়ায়েযীন ছিলেন অপারগ। মানুষের অন্তর ছিল তালাবদ্ধ। যে তালা ভাঙতে কুদরতের নিদর্শনাবলী এবং কালের ভয়াবহ শিক্ষণীয় ঘটনাবলী ব্যর্থ হয়ে পড়েছিল। যোগ্যতা ছিল তালাবদ্ধ, যা কাজে লাগাতে অক্ষম ছিল শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা এবং পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সমাজের প্রভাব। বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন ও অস্তিত্ব

ছিল না, যেগুলো কার্যকরী ও ফলপ্রসূ বানাতে বিদ্বান ও জ্ঞানীমহল অসহায় ছিল। আদালত থাকা সত্ত্বেও তালাবদ্ধ ছিল, যেখানে ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় মজলুম প্রজাসাধারণের ফরিয়াদ ছিল নিষ্ফল। বংশীয় বিষয় ও সামাজিকতা ছিল বিপর্যস্ত ও বিশৃংখলায় ভরা, যা সামলে কিংবা সংশোধন করতে সংস্কারক ও চিন্তাবিদগণ অক্ষম ছিল।

রাজপ্রাসাদগুলো ছিল তালাবদ্ধ, যেখানে যেতে পারত না খেটে খাওয়া মেহনতী কৃষক, দুর্বল শ্রমিক ও মজলুম প্রজাগণ। ধনী-সম্পদশালী ও বিত্তবানদের ভাণ্ডার ছিল তালাবদ্ধ। যার তালা খুলতে নিঃস্ব-গরীবদের ক্ষুৎ পিপাসা, তাদের স্ত্রীদের বস্ত্রহীনতা ও তাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুদের আর্তচিৎকার অক্ষম ছিল। বড় বড় সংস্কারক দৃঢ় প্রত্যয়ে মাঠে নেমেছেন, বড় বড় আইনজ্ঞ কোমর বেঁধেছেন। কিন্তু এসব অগণিত তালাগুলোর কোনও একটি তালাও খুলতে তারা সফল হতে পারেননি। কারণ, এসব তালার আসল চাবি তাদের হাতে ছিল না। সে চাবি তাদের হাতে ছিল না, হারিয়ে গিয়েছিল। আর তালা তার চাবি ছাড়া কখনও খোলা যায় না। তারা নিজেদের তৈরী চাবি দিয়ে কাজ উদ্ধার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা এসব তালায় লাগেনি এবং একটি তালাও খুলতে পারেনি। আবার কেউ কেউ এসব তালা খোলার বদলে ভাঙার চেষ্টা করেছে। কিন্তু উল্টো এতে তাদের হাতিয়ার ভেঙে গেছে এবং হাতও রক্তাক্ত হয়েছে।

এমনই এক সময় সভ্য দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছোট্ট একটি পাহাড়ের উপর অচেনা অজানা এবং বাহ্যতঃ এক গুরুত্বহীন স্থান হেরা গুহায় পৃথিবীর সেই জটিল সমস্যার সকল সমাধান হয়েছে, যা অদ্যাবধি সমাধান হয়নি। না বড় বড় সাম্রাজ্যের রাজধানীতে সমাধান হয়েছে, না হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ শ্রেণীকক্ষে। আর না হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ঈর্ষণীয় চিত্তাকর্ষক প্রাসাদে। এখানে বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালক হযরত মুহাম্মাদ (সা) এর রিসালাতের আকারে বিশ্বমানবতার উপর এক অপার অনুগ্রহের ঝর্ণাধারা খুলে দিলেন আর শত শত বছরের হারানো চাবি এসে গেল মানুষের হাতে। এ চাবি হচ্ছে ঈমান– আল্লাহর ওপর, তার রাসূলের উপর এবং পরকালের ওপর। এই চাবির সাহায্যে নবী কারীম (সা) শত শত বছরের সেসব বন্ধ তালা একে একে সবই খুলে ফেললেন। ফলে মানব জীবনের প্রতিটি শাখার সকল দরজা একদম উন্মুক্ত হয়ে গেল। রাসূলে কারীম (সা) যখন নবুওয়াতের এই চাবি বিবেক-বুদ্ধির উপর রাখলেন, তখন তার সকল বন্ধন খুলে যায়। তার সকল জটিলতা ও বক্রতা দূর হয়ে যায়। তার চিন্তাভাবনার তৎপরতা জেড়ে ওঠে। সেই এই মহাকাশ-মহাশূন্য ও দিকদিগন্তে বিস্তৃত খোদায়ী নিদর্শনাবলী দ্বারা উপকার লাভের যোগ্য হয়ে

যায়। সে এই বিশ্বজগতের মাঝে চিন্তা করে তার স্রষ্টাকে চিনতে সক্ষম হয়। বহুত্ববাদের মায়াজাল ছিন্ন করে একত্ববাদের চমক দেখাতে সক্ষম হয়। শিরক ও পৌত্তলিকতা এবং অলীক কল্পনা ও বাচালতার ভ্রান্তি উপলব্ধি করতে পারে। অথচ এই বিবেক-বুদ্ধি এসব বিষয়ে দখল দেওয়ার যোগ্য ছিল না। শত শত বছর ধরে সে তার পদাধিকার থেকে ছিল অপসারিত।

এই চাবির সাহায্যে তিনি মানুষের অন্তরের তালা খুলেছেন। সুতরাং ঘুমন্ত অন্তর জেগে ওঠে। তার মৃত চেতনা ও অনুভবে স্পন্দন ও জীবন সঞ্চার হয়। সকল কৃত্রিম অন্তরায় ও সংকট থেকে মুক্ত হয়ে অপরাধ প্রবণ মানবাত্মা-মানুষের নফস, যা শত শত বছর ধরে নফসে আম্মারা (যা বেশি বেশি গুনাহ ও অপকর্মের প্ররোচনা দেয়) হয়ে ছিল, আজ সে নফসই নফসে লাওয়ামাহ (ভুল ও গোনাহের কারণে গভীর অনুতাপ ও তীব্র ভর্ৎসনাকারী অন্তর) হয়ে যায়। আর নফসে লাওয়ামাহ দেখতে দেখতেই নফসে মুতমাইন্নাহ (প্রশান্ত অন্তর) হয়ে গেল। যার পর আর এই অন্তর-আত্মায় কোনও বাতিল গোমরাহী অনুপ্রবেশের অবকাশ রইল না। কোনও গুনাহ তার জন্য হজমযোগ্য রইল না। এমনকি পাপী গুনাহগার স্বয়ং রাসূলে কারীম (সা) -এর দরবারে গিয়ে স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজের গুনাহ-পাপ প্রকাশ ও স্বীকার করে আজ নিজের জন্য কঠিন মর্মন্তুদ শাস্তির দরখাস্ত করছে।

এক গুনাহগার নারী নিজের জন্য প্রস্তরাঘাতে হত্যার শাস্তির দরখাস্ত করছে। আর নবী কারীম (সা) শরঈ আপত্তির কারণে সাময়িকের জন্য তার সাজা মওকুফ রাখলেন। সে তার গ্রামে চলে গেল। না তাকে নজরদারীর জন্য কোনও সিআইডি নিযুক্ত আছে, আর না অপরাধীকে পুনরায় হাযির করার জন্য কোনও পুলিশ মোতায়েন করা হয়ে আছে। কিন্তু সে মহিলা যথাসময়ে মদীনায় এসে হাযির হয়ে গেল। নিজেকে সজ্ঞানে সঁপে দিল ঐ সাজা ভোগের জন্য। বরাবরই পীড়াপীড়ি করে চলল তজ্জন্য। যা নিশ্চিত হত্যা অপেক্ষাও মর্মন্তুদ তথা সংগেসার।

ইরান বিজয়কালে এক গরীব সিপাহীর হাতে সম্রাট কেসরার দণ্ডের রাজমুকুট এসে গেল। তিনি তা কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে নিলেন। আর গোপনে এসে আপন আমীরের হাতে তুলে দিলেন। যেন আমানত আদায় হয়ে যায়। কিন্তু আমানতদারী প্রকাশ না পায়।

মানুষের সেই মন, যা এমনভাবে তালাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, না তাতে সাবধানবাণী প্রভাব ফেলত, না ছিল মহান স্রষ্টা আল্লাহর ভয়, আর না ছিল নম্রতা-কোমলতা ও দয়া। এই চাবি যখন তাদের মনের উপর লাগানো হল, তখন সম্পূর্ণ রাসায়নিক ক্রিয়ার চেয়েও দ্রুত পাল্টে গেল। আজ মানুষের সেই

মন-দিল প্রতিনিয়ত আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত ও কম্পিত হয়। বিভিন্ন ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। দিকদিগন্তে বিস্তৃত খোদায়ী নিদর্শন আজ তার জন্য বড়ই উপকারী। মজলুম অসহায় মানুষের দুরাবস্থা দেখে সে যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়ে। দুস্থ-গরীব-দুঃখীদের সাথে ঘৃণা ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করার পরিবর্তে মানবতা, ভালবাসা ও সহমর্মিতার আচরণ করে। এভাবে ঐ নবুওয়াতের চাবি যখন মানুষের ঐ জন্মগত বৈশিষ্ট্য-যোগ্যতা ও শক্তিকে ছুঁয়ে যায়, যা যুগ যুগ ধরে নিস্প্রভ হয়ে পড়েছিল এবং মঙ্গলজনক হওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে। স্রোতের মত প্লাবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঠিক দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। যার ফলে যোগ্যতা কাজে লাগানোর এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ না পাওয়ার কারণে যে সব লোকজন মেষপালের রাখালী করেই ধ্বংস হচ্ছিল, আজ তারা উৎকৃষ্ট পন্থায় জাতির পথপ্রদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিশ্বজগতের শাসনকার্যের মত স্পর্শকাতর দায়িত্ব পালনে দৃঢ়প্রত্যয়ী হয়ে গেল। যে ব্যক্তি গতকাল পর্যন্ত নিছক কোন এক গোত্রের কিংবা কোনও এক শহরের অখ্যাত-অচেনা অশ্বারোহী ছিল, আজ সে বিশাল সাম্রাজ্য এবং এমন এমন রাষ্ট্রের রূপকার ও দেশ বিজেতা হয়ে গেল, যা শক্তি-ক্ষমতায় ছিল একক আধিপত্যবাদি।

এই চাবির মাধ্যমেই তিনি শিক্ষালয়ের তালা খুলেছেন এবং তাতে নতুন করে আলো-উজ্জ্বলতা ও নবউল্লাস সৃষ্টি করেছেন। অথচ জ্ঞান-বিদ্যার দরপতন এবং শিক্ষকগণের ব্যক্তিপূজা এমন শোচনীয়তায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, ইলম ও জ্ঞানার্জনের প্রতি না শিক্ষকগণের আগ্রহ ছিল আর না ছিল শিক্ষার্থীর। নবী করীম (সা) ইলম-জ্ঞানের মূল্য ও মর্যাদা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জ্ঞানীদের সম্মানের বাণী শুনিয়েছেন এবং ইলম ও দ্বীনের পরস্পর সম্পর্ক বুঝিয়েছেন। সুতরাং মানুষের শিক্ষালয়ের উন্নতির জন্য সর্বত্র তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। মুসলমানদের প্রতিটি ঘর এবং প্রতিটি মসজিদ এক একটা মাদরাসা-বিদ্যালয় হয়ে গেল। প্রত্যেক মুসলমানই নিজের বেলায় ছাত্র আর অন্যের জন্য শিক্ষক হয়ে গেলেন। কারণ, তাদের দ্বীন-ধর্মই ছিল ইলম অন্বেষণের জন্য সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

তিনি এ চাবির মাধ্যমে আদালতের অকার্যকারিতা তিরোহিত করেন। এখন প্রত্যেক আইনজ্ঞ এমন হয়ে গেলেন যে, তার উপর একজন জজ হিসেবে আস্থা রাখা যায়। প্রতিটি মুসলমান শাসক উঁচু পর্যায়ের পদীয় আদর্শিক শাসক হয়ে গেলেন। এসব সরলপ্রাণ খাঁটি মুসলমান প্রত্যেকেই নিছক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সত্য সাক্ষ্য প্রদান করেন। যখন আল্লাহ তা'আলা ও পরকালের হিসাব-কিতাব ও জবাবদিহিতার প্রতি তাদের ঈমান সুদৃঢ় হয়ে গেল, তখন

আদল ও ইনসাফ এবং ন্যায়-নিষ্ঠা সম্প্রসারিত হল। বেইনসাফী ও দুর্নীতি-দূরাচার একেবারে শূন্যের কোঠায় নেমে এল। মিথ্যা সাক্ষ্য ও অন্যায়-অবিচার বন্ধ হয়ে গেল। বংশীয় সমস্যা-সংকট যা এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, পিতা-পুত্রে, ভাইয়ে-ভাইয়ে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মানহানি ও লুটপাটের উত্তপ্ত রণক্ষেত্র ছিল। অধিকন্তু এই ব্যাধি বংশ-গোত্রের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে গোটা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ সংঘাত শ্রমিক-মালিক এবং চাকর-মনিবের সম্পর্কেও বিরাজ করছিল। শাসক-শাসিতের সম্পর্কেও ছিল বিরাজমান, ছোট-বড়র সম্পর্কেও ছিল। প্রত্যেকের অবস্থাই ছিল এমন যে, কেউ তার অধিকার ক্ষুণ্ন হতে দিতে চাইত না এবং আদৌ অপরের অধিকার রক্ষা করতে চাইত না। নিজে কোনও জিনিস ক্রয় করলে পরিমাপে সামান্য উঁচু-নিচুও গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করত। কিন্তু অন্যের কাছে কিছু বিক্রয় করলে অন্ততপক্ষে মাপজোকে পরিপূর্ণ দক্ষতা দেখাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ.

রাসূলে কারীম (সা) এ বংশগত সংঘাত ও সামাজিক কলুষতাও এই চাবির সাহায্যে দূরীভূত করেন। গোত্র ও সমাজে ঈমানের বীজ রোপন করেন। মানুষকে আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেন। দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেন আল্লাহর বাণী–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوْا اللهَ الَّذِىْ تَسَآئَلُوْنَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا.

"হে মানব জাতি! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন। আর বিস্তার করেছেন তাদের থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রার্থনা করে থাক এবং আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন।" (সূরা নিসা : ১)

তিনি গোত্র ও সমাজের প্রত্যেক সদস্যের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করেন। এভাবে নতুন করে বংশ ব্যবস্থাকে ইনসাফ-ন্যায়পরায়ণতা, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি ও সততার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। সমাজকেও উচ্চস্তরের ইনসাফের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বানিয়েছেন। সমাজের পরতে পরতে আমানতদারীর এমন গভীর চেতনা এবং আল্লাহ ভীতির এত কঠিন অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছেন যে, সে সমাজের আমীর-উমারা, ধনিক-বণিক এবং পদাধিকারী নেতৃস্থানীয় শাসকবর্গও

পরহেযগারী ও সাধাসিধা অনাড়ম্বর জীবনের নমুনা হয়ে যান। গোত্রপতি নিজেকে গোত্রের সেবক মনে করতেন। রাষ্ট্র প্রধানগণ নিজেদেরকে ইয়াতীম-অনাথদের একজন তত্ত্বাবধায়ক থেকে বেশি কিছু ভাবতেন না। যদি নিজের ব্যক্তিগত সামান্য কিছু অর্থ-সম্পদ থাকত, তবে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে কিছুই আকাঙ্ক্ষা করতেন না। যদি না-ই থাকত, তবে প্রয়োজন পরিমাণ সামান্য কিছু পেয়েই পরিতৃপ্ত থাকতেন। এই ঈমানের বদৌলতে তিনি ধনাঢ্য ও বড় বড় ব্যবসায়ীদেরকে দুনিয়াবিমুখ এবং পরকালের প্রতি আসক্ত করে তোলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ তা'আলা। তোমাদেরকে এসবের ব্যবহারে তিনি তার নায়েব বানিয়েছেন।

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ.

"তোমরা সেসব ধন-সম্পদ থেকে খরচ কর, যাতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নায়েব বানিয়েছেন।" (সূরা হাদীদ– ৭)

وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ.

"তোমরা তাদেরকে (অভাবীদেরকে) সে সম্পদ থেকে দান কর, যা তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা দান করেছেন।" (সূরা নূর– ৩৩)

এসব ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা এবং আল্লাহর পথে ব্যয় না করার কারণে ভীতি প্রদর্শন করে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ. هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ.

"আর যারা স্বর্ণ-রূপা জমা করে রাখে, তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠোর আযাবের হুঁশিয়ারী শুনিয়ে দিন। সেদিন (কিয়ামত দিবসে) জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে। (সেদিন বলা হবে) এগুলা যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং এক্ষণে আস্বাদ গ্রহণ করা জমা করে রাখার।" (সূরা তাওবা; ৩৪-৩৫)

রাসূলে কারীম (সা) তাঁর পয়গাম ও দাওয়াতের মাধ্যমে যাদেরকে তৈরী করে এই জীবনের কর্মশালায় নিয়ে এসেছেন, তারা ছিলেন আল্লাহ তাআলার উপর খাঁটি ঈমানদার। সততাকে পছন্দকারী, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভীত-সন্ত্রস্ত, আমানত রক্ষাকারী, দুনিয়ার উপর পরকালকে প্রাধান্য দানকারী, যারা ছিলেন বৈষয়িক আসবাবপত্রকে তুচ্ছ জ্ঞানকারী এবং স্বীয় আধ্যাত্মিকতার জোরে বস্তুবাদের উপর বিজয়ী। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, এই দুনিয়া

আমার জন্য আর আমাকে আখেরাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এ ব্যক্তি যদি ব্যবসা-বাণিজ্যে নামতেন, তাহলে যারপরনাই সৎ-নিষ্ঠাবান ও ঈমানদার প্রমাণিত হতেন। যদি শ্রম বিক্রির পেশা অবলম্বন করতেন, তাহলে অত্যন্ত পরিশ্রমী হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রমিক প্রমাণিত হতেন। ধনাঢ্য ও সম্পদশালী হলে তিনি একজন উদারপ্রাণ ও দানবীর হয়ে যেতেন। দরিদ্র হলে ভদ্রতা ও আত্মসম্মান বজায় রেখে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতেন। বিচারকের আসনে বসিয়ে দেওয়া হলে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ বিচারক প্রমাণিত হতেন। রাষ্ট্রপ্রধান হলে তিনি একজন একনিষ্ঠ মুখলিছ ও নিঃস্বার্থ শাসক প্রমাণিত হতেন। মনিব হলে অনুগ্রহশীল ও ঠাণ্ডা মনের মনিব। চাকর হলে অত্যন্ত তৎপর ও অনুগত চাকর। জাতীয় সম্পদ যদি তার তত্ত্বাবধানে এসে যেত, তাহলে বিস্ময়কর সচেতনতার সাথে তার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

এ ছিল দু'টি ইট, যার দ্বারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করা হয়েছে এবং যার উপর ইসলামী হুকুমত ও সরকারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। সে হিসেবে এ সমাজ ও হুকুমত বিরাট এক মডেল ও আদর্শ পুরুষের চরিত্র। এ ছিল তাদের মন-মানস এবং তাদের জীবনধারার বহিঃপ্রকাশ। মানুষের মাঝে যেসব জিনিস ছিল তার সবই সমাজে জমা হয়ে গিয়েছিল। এ সমাজে ছিল ব্যবসায়ীদের সততা ও ঈমানদারী। ছিল গরীবদের আত্মসম্মানবোধ ও আত্মপ্রচেষ্টা। ছিল সমাজে শ্রমিকদের নিরলস মেহনত ও হিতাকাঙ্ক্ষা। সে সমাজে ছিল ধনাঢ্যদের সহমর্মিতা ও দানশীলতা। বিচারকদের মাঝে ছিল দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতা। সে সমাজে শাসকদের মাঝে ছিল একনিষ্ঠতা, বিশ্বস্ততা ও ন্যায়নিষ্ঠা। সে সমাজে মনিবদের মাঝে ছিল সহমর্মিতা, সমবেদনা ও উদারচিত্ততা। সে সমাজে খাদেম-সেবকদের মাঝে ছিল কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্মতৎপরতা। সে সমাজে ব্যাংক ম্যানেজার-কোষাধক্ষ্যের তত্ত্বাবধান ও সচেতনতাও ছিল পুরোপুরি বিদ্যমান। ইসলামী সমাজ যেভাবে তার সদস্যদের চরিত্র মাধুরীর পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত ছিল, তদ্রুপ ইসলামী সরকারও সকল উৎকৃষ্টতার ধারক ও প্রতীক বরং এর শক্তিশালী আন্দোলনকারী ছিল। এ সরকার সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, আকীদা ও নিয়ম-শৃঙ্খলার কল্যাণ এবং উপকারিতাকে প্রাধান্য দিত। জনসাধারণের ধন-সম্পদ লুটতরাজ করার পরিবর্তে তাদের স্বভাব-চরিত্র ও আকীদা-বিশ্বাস গঠন এবং সুসজ্জিত করতে ঐকান্তিকভাবে প্রচেষ্টা চালাত। সমাজ ও সরকারের প্রভাব এমন ছিল যে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক, প্রাইভেট এবং জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ঈমান-আমল, সততা-বিশ্বস্ততা, ঐকান্তিকতা, চেষ্টা-শ্রম ও ন্যায়-ইনসাফে পরিপূর্ণ ছিল এবং এসব চিরন্তন বসন্ত ফুলের সৌরভে বিমোহিত ছিল।

হেরা গুহায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি এসব কথা মনে মনে ভাবছিলাম। আমি এসব চিন্তাভাবনা ও পূর্বযুগের স্মৃতিচারণে এতই নিমজ্জিত হয়ে গেলাম যে, কিছু সময়ের জন্য নিজের কথা একদমই ভুলে গেলাম। আমার অনুভূতি আমাকে আমার পরিবেশ এবং যুগ থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার চোখে সে ইসলামী জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি ভাসতে লাগল। আমি তার সৌন্দর্য-উৎকৃষ্টতা এবং এক একটি শাখা-প্রশাখা দেখতে লাগলাম। সুস্পষ্ট মনে হতে লাগল, সে জীবন আমার চতুর্পার্শ্বে ছড়িয়ে আছে। আমি তার মনোমুগ্ধকর ও চিত্তাকর্ষক পরিবেশে শ্বাস গ্রহণ করছি। এই কল্পনার জগতে আমার স্বীয় যুগের অবস্থা খেয়াল হল, যার পরিবেশে আমি বাস্তবেই শ্বাস গ্রহণ করি। আমি বললাম, আজও জীবনের সফলতা ও সুখ-সমৃদ্ধির দরজাগুলোতে কিছু নতুন তালা ঝুলানো দেখা যায়। প্রয়োজন ও মাসআলা-মাসায়েলের ব্যাপকতা এবং প্রকারের কোন অন্ত নেই। সে তুলনায় সমস্যা-সংকট, ঝামেলা ইত্যাদি বহু গুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং এমতাবস্থায়ও কি সেই পুরোনো চাবি দ্বারা এই নতুন তালা খোলা যাবে?

আমার মনে এ প্রশ্ন দোলা খেতে থাকে। কিন্তু আমি বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে এসব তালার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার নিরুত্তর থাকা উচিৎ। সুতরাং আমি যখন এসব তালায় হাত লাগালাম, তখন বাস্তব রহস্য খুলে গেল, এসব তালা নতুন নয়, সেই পুরোনো তালাই। কেবল রং ও তৈল নতুন আর এসব সংকট-সমস্যা, জটিলতা নতুন। এর শেকড় বহু পুরোনো। আজও প্রকৃত সমস্যা ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি, যা অন্যান্য সকল সমস্যার মূল। আর এটিই ছিল সবসময় মানবজীবনের আসল সমস্যা। কারণ, ব্যক্তি সেই ইট, যার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণ হয়। আজ তার অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, জড়বস্তু এবং শক্তি ছাড়া কোন জিনিসকে মানতে সে প্রস্তুত নয়। ব্যক্তিস্বার্থ, আত্মপূজা ছাড়া তার কোন কিছুর প্রত্যাশা নেই। এ দুনিয়ার মান-মর্যাদা তার চোখে বাস্তবতার চেয়েও বহুগুণ বড়। আত্মপ্রসাদ এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আপন প্রতিপালক, নবী-রাসূল এবং পরকালের বিশ্বাস থেকে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন হয়ে গেছে। ব্যাস, এই ব্যক্তির বিকৃতি, যা সমাজ বিকৃতির মূল কারণ এবং সভ্যতার বখাটেপনার জন্য দায়ী। এ লোক যদি ব্যবসা করে তাহলে লোভ-লালসা ও সম্পদ কুক্ষিগত করা এবং পুঁজিবাদের মত নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে। পড়তি বাজারে মাল আটকে রাখে আর দাম বেড়ে গেলে বের করে বাজারে ছাড়ে। এভাবে মানুষের ক্ষুধা-যন্ত্রণা ও ভোগান্তির কারণ হয়। এ লোক যদি দরিদ্র হয় তবে চেষ্টা করে নিজের দরিদ্রতা দূর করার লক্ষ্যে নিজে কিছু না করে অন্যের পরিশ্রমের ফসল ফাও খেতে। যদি শ্রমজীবী হয়, তাহলে নিজের দায়িত্ব পালনে অলসতা করে। কিন্তু পারিশ্রমিক নিতে চায় পুরোপুরি। যদি ধনাঢ্য-সম্পদশালী হয়, তাহলে চরম

কৃপণ ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়ে যায়। ক্ষমতাশালী হলে ডাকু-বিশ্বাসঘাতক প্রমাণিত হয়। মনিব কিংবা মালিক হলে একজন জালিম স্বার্থান্ধ মালিক হয়। যে নিজের লাভ ও আরাম ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখে না। চাকর হলে কামচোরা ও বেঈমান হয়। যদি ব্যাংক ম্যানেজার বা কোষাধ্যক্ষ বানিয়ে দেওয়া হলে তাহলে দুর্নীতি করে, প্রতারণা করে। যদি সরকার প্রধান কিংবা প্রধানমন্ত্রী হয়ে যায়, তাহলে পেট পুঁজারী, আত্মভোলা প্রবৃত্তির গোলাম হয়ে যায়। যে কেবল নিজের ব্যক্তিগত এবং দলের লাভ-লোকসানই দেখে। যদি নেতা হয়ে যায় আর ভীষণ উন্নয়নকামিতা দেখায় তাহলেও এ জাতি এবং রাষ্ট্রের সীমা থেকে অগ্রসর হতে পারে না। আর স্বরাষ্ট্র ও স্বজাতির মান-মর্যাদা বাড়ানোর জন্য আরেক জাতি ও রাষ্ট্রের ইজ্জত-সম্ভ্রম ধূলি-ধূসরিত করতেও কখনো কুণ্ঠাবোধ করে না। যদি আইন প্রণয়নের অধিকার হাতে এসে যায় তাহলে জুলুম ও শোষণমূলক আইন এবং বড় বড় ট্যাক্স চাপিয়ে দেয় প্রজাদের মাথায়। যদি উদ্ভাবন ও আবিষ্কারের যোগ্যতা থাকে তাহলে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধনের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে থাকে। বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কার করে, যা মানব জাতিকে বরবাদ করে দেয়। বোমারু বিমান ও ট্যাংক তৈরী করে, যা জনপদগুলোকে বিরানবাড়ি ও ছাইয়ের স্তূপে পরিণত করে। পারমাণবিক বোমা তৈরী করে, যার ধ্বংসলীলা থেকে না মানুষ বাঁচতে পারে, না পশুপাখি কিংবা ফসলের ক্ষেত খামার, ফলের বাগান রক্ষা পায়। আর যখন এই আবিষ্কারসমূহ ব্যবহারের শক্তিও অর্জিত হয়ে যায়, তখন গ্রামের পর গ্রাম বেপরোয়া টার্গেট বানিয়ে রাখে এবং মুহূর্তের মধ্যে ব্যস্ত এক শহরকে নীরব মৃতপুরীতে পরিণত করে দেয়।

সুস্পষ্ট কথা হল, ভাল মানুষে গড়া সমাজ এবং তাদের গঠিত রাষ্ট্র সরকার সেসব মানুষের যাবতীয় সৌন্দর্যের দর্পণ হয়ে থাকে। অদ্রুপ অসৎ-দুরাচারী লোকদের দ্বারা তৈরী সমাজ ও রাষ্ট্র দু'টিই নিশ্চিত সেসব লোকের সকল অপকর্ম-দুরাচারিতা ও রোগ-ব্যাধির ধারক হবে। সেখানে ব্যবসায়ীদের পুঁজিবাদ-মুনাফাখোরীও থাকবে। দরিদ্র-অভাবীদের অবাধ্যতা-বিদ্রোহও থাকবে। শ্রমিকদের কম মেহনত আর বেশি পারিশ্রমিক নেওয়ার বদঅভ্যাসও থাকবে। ধনাঢ্যদের স্বেচ্ছাচারিতার জীবাণুও তাদের আক্রমণ করবে। সেখানে তাদের শাসকবর্গের দুর্নীতি, কুমতলব ও বিদ্রোহও ছড়িয়ে পড়বে। মালিক চাকরদের প্রতারণা ও শঠতা এবং ধনাগার রক্ষকের দুষ্কৃতি-ধোঁকাবাজীও বিস্তার লাভ করবে। মন্ত্রীদের স্বার্থান্ধতা এবং নেতাদের দল ও পরিবার পূজাও প্রকাশ্য হয়ে পড়বে। আইনজ্ঞদের বেঈমানী এবং বিজ্ঞানীদের বিপথগামিতাও তার চমক দেখাবে। অনুরূপভাবে সেখানে ধনী-সম্পদশালীদের কঠোর প্রাণ ও নিষ্ঠুরতাও এ সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

এটিই সেই বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলার প্রকৃত উৎসমূল, যার উদর থেকে সেসব ব্যাধি, সেসব ঝুট-ঝামেলা, জটিলতা ইত্যাদি জন্ম নিয়েছে। যাতে মানুষ অস্থির-উদ্বিগ্ন ও হতবিহ্বল দিশেহারা। এই বিপর্যয়ের উৎসমূলের নাম বস্তুবাদ ও জড়পূজার আবেগ কিংবা বৈষয়িক অবলম্বন ও তার বহিঃপ্রকাশকে সবকিছু মনে করার আকীদা। কালোবাজারী, ব্লাক মার্কেটিং এরই অলৌকিক পরিণতি। ঘুষখোরী এরই ঠুনকো একটি কারিশমা। চক্রবৃদ্ধি চড়া সুদখোরী ও উচ্চ মুনাফাখোরী এরই একাংশ। পুঁজিবাদ এরই দান। ধন-সম্পদের তারল্য-কন্টরতা এরই ফল। আজকের কোনও চিন্তাবিদ ও গবেষক এসব সমস্যার স্বার্থক কোনও সমাধান গবেষণা করে বের করতে পারেনি। এক সমস্যা সমাধান করলে নতুন এক সমস্যা ও বিপদে ফেঁসে যায়। একটি বাঁধন ও গিট খোলে তো নতুন নতুন আরও অনেক গিট লেগে যায় বরং আজ একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, সেসব গিট ও বাঁধন খোলার আদলে আরও নতুন নতুন জটিলতা ও সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন, ডাক্তারের দেওয়া ঔষধপথ্যে রোগ নিরাময়ের পরিবর্তে আরও নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। এতে সে রোগী পুরোদমে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছে। তারা মনে করেছে, একনায়কতন্ত্র এসব রোগ-ব্যাধির মূলক কারণ। কাজেই একনায়কতন্ত্র খতম করে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার গোঁড়াপত্তন করেছে। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই কেউ কেউ পুনরায় স্বায়ত্তশাসন ও একনায়কতন্ত্রের খড়্গ ঝনঝনাতে শুরু করে। এতে সমস্যা আরও প্রকট হতে দেখে। তখন তারা পুনরায় গণতন্ত্রের দিকে ফিরে আসে।

এভাবে কখনও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এতে সমস্যা ও জটিলতা আরও বেড়ে যায়। তখন কম্যুনিজম ও স্যোসালিজমকে সমকালের চিকিৎসা মনে করে। কিন্তু অবস্থার সামান্য পরিমাণ উন্নতি কিংবা পরিবর্তন হয় না। সমস্যাগুলো যেমন ছিল তেমনই থেকে যায়। অথবা পূর্বের চেয়েও আরও বেশি জটিল হয়ে যায়। কিন্তু কেন? এর একমাত্র কারণ, এসব পরিবর্তন, সংশোধন-সংস্কার উপরে উপরে হচ্ছিল আর সমস্যার গোঁড়া ও উৎসমূল তথা ব্যক্তি ও তার বিপথগামিতা-পথভ্রষ্টতায় আদৌ হাত লাগানো হয়নি। তাতে কোনরূপ সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্টা করা হয়নি। ইচ্ছাকৃত হোক চাই অনিচ্ছাকৃতই হোক এই বাস্তবতা থেকে বরাবরই উদাসীন ছিল যে, আসল সমস্যা ও ত্রুটি ব্যক্তির মাঝে। যার কারণে সমাজ এবং রাষ্ট্র ও কলুষিত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে।

কিন্তু আমি বলি, এসব চিন্তাবিদগণ ও সংস্কারকগণ যদি এ বাস্তবতা উপলব্ধিও করতে পারতেন এবং দুরাচার ও মন্দচারিতার শেকড় খুঁজে পেয়েও

যেতেন, তথাপি তার প্রতিকার ও চিকিৎসা তাদের ক্ষমতাধীন ছিল না। ধরে নিলাম তাদের কাছে জ্ঞান প্রচারের প্রভাবশালী মাধ্যম আছে আর এ যুগও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ। কিন্তু তাদের হাতে সে শক্তি ও ক্ষমতা নেই, যার মাধ্যমে ব্যক্তি ও মানুষের গতি মন্দ থেকে ভালোর দিকে এবং ক্ষতিগ্রস্থতা থেকে বিনির্মাণের দিকে ঘুরিয়ে দেবে। কারণ, মন-মস্তিষ্ক আধ্যাত্মিকতা বরং আত্মার সম্মান থেকেই অক্ষম এবং ঈমানশূন্য। তাদের নিকট আত্মার খোরাক যোগানো এবং ঈমানের বীজ বপনের হাতিয়ার নেই, যা মহান প্রভূ ও তার গোলামের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করবে। এ জীবনের সাথে পরজীবনের তথা আখেরাতের সেতুবন্ধন তৈরী করবে। আত্মা এবং জড়দেহের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে। জ্ঞানকে চরিত্রের সাথে সম্পৃক্ত করবে। তাদের আত্মিক দৈন্যতা, অন্ধ বস্তুবাদ এবং বুদ্ধিক প্রবঞ্চনা আজ তাদেরকে এমন পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে যে, তারা ধ্বংস-লয়ের শেষ তীরটিও নিজের তীরদানীতে জমা করে নিতে চায়, যার ধ্বংসলীলায় গোটা মানবগোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন এবং সমগ্র পৃথিবী উজাড় ও বিরান হয়ে যেতে পারে।

আল্লাহ্ না করুন! আজ যদি পৃথিবীর যুদ্ধবাজ পরাশক্তিগুলো এসব ভয়ঙ্কর মানবতা বিধ্বংসী হাতিয়ারসহ যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত করে, তাহলে নিশ্চিত তাদের এই অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র মানব সভ্যতা ও বিশ্ব মানবতাকে ধ্বংস করে দিবে।

নবুওয়াতের স্বার্থকতা

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওহী ও নবুওয়াতের মাধ্যমে তার পয়গাম্বরগণকে বিশ্ব মানবতার সংশোধন-সংস্কার ও পূর্ণতা দানের জন্য নিয়োজিত করেছেন। আর এ নবী-রাসূলগণ তাঁদের দাওয়াত ও মেহনতের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন বিশ্বমানবকে। আম্বিয়ায়ে কিরামের অন্তর্দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলা এই রহস্য উন্মোচন করে দিলেন যে, এ পৃথিবীর ভাগ্য এবং তা আবাদ হওয়া ও বিরান হওয়া মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি প্রকৃত মানুষ বিদ্যমান থাকে, তাহলে এই পৃথিবী তার সকল ধ্বংসস্তূপ, পোড়াবাড়ি ও অসহায়ত্বসহ টিকে থাকবে। আর যদি এখানে প্রকৃত মানুষ না থাকে, তাহলে এই পৃথিবী তার সকল বৈচিত্র, আলো-আভা ও সাজ-সরঞ্জামসহ এক জনমানবহীন ভূতুড়ে বাড়ি অপেক্ষা ভাল হবে না। এ পৃথিবীর দুর্ভাগ্য হাতিয়ার ও আসবাবপত্রের স্বল্পতা বা না থাকার কারণে নয় বরং সেগুলোর অপব্যবহারের কারণে। পৃথিবীর পূর্ণ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একে মানুষের ভুল আশঙ্কা ও বিপথগামিতাই পৃথিবীকে ধ্বংস করেছে; হাতিয়ার ও আসবাবপত্র এই ধ্বংসযজ্ঞ ও বরবাদী বাড়িয়েছে মাত্র।

অধিকন্তু মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্ব, তার সম্মান, তার প্রশস্ততা, তার কেন্দ্রীয়তা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের কারণে বহুগুণে এ যোগ্যতা রাখে যে, তাকেই চেষ্টা-শ্রম, মনোযোগিতা ও সেবার লক্ষ্যস্থল বানানো হবে। এ জগত বড় বিস্ময়কর, বড় রহস্যময়, বড় বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের অধিকারী এবং সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত। কিন্তু মানুষের জন্মগত বিস্ময়কর রহস্য, তার গুপ্তধন ও রত্নভাণ্ডার, তার হৃদয়ের প্রশস্ততা, তার মস্তিষ্কের উচ্চারোহন, তার আত্মার ব্যাকুলতা ও উষ্ণ আবেগ-অনুভূতি, তার অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা, অতৃপ্ত বাসনা ও সাহসিকতা এবং তার সীমাহীন যোগ্যতার সামনে এর কোন বাস্তবতা নেই। এরূপ কয়েক পৃথিবী তার মনের প্রশস্ততায় এবং এ সকল সমুদ্র তার হৃদয়ের গভীরতায় হারিয়ে যাবে। পাহাড় তার বিশ্বাসের, আগুন তার ভালবাসার তাপদাহ, সমুদ্র তার অশ্রুফোটার মোকাবেলা করতে পারে না। তার চরিত্র মাধুরীর সামনে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য বিবর্ণ-ম্রিয়মান। তার ইচ্ছা-সংকল্পের কাছে সকল পরাশক্তি পর্যদুস্ত-নতশির। এ মানুষের মাঝে সঠিক

বিশ্বাস, সঠিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা, সঠিক যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্র মাধুরী সৃষ্টি করা এবং তার দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলার প্রতিনিধিত্বের কাজ আঞ্জাম দেওয়াই নবুওয়াতের আসল কৃতিত্ব।

প্রত্যেক নবুওয়াতই সমকালে এই মহান ব্রত আঞ্জাম দিয়েছে এবং এমন মানুষ তৈরী করেছে, যারা এ পৃথিবীকে নবজীবন দান করেছেন। যে জীবন স্বয়ং মানুষের আত্মভোলা হওয়া ও ভুল সংশয়ের কারণে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল, যে মানবজীবনকে অর্থবহ করেছে। নবুওয়াতের এসব কীর্তির মাঝে, যা জীবনের ললাটে উজ্জ্বল দীপ্তিমান– সবচেয়ে দেদীপ্যমান কৃতিত্ব মুহাম্মাদ (সা) এর কৃতিত্ব। ইতিহাসের পাতায় যার বিবরণ সবচেয়ে বিশদভাবে বিদ্যমান। মানুষ ও বনী আদম গড়ার এই মহান মিশনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে সাফল্য দান করেছেন, আজ পর্যন্ত আর কারও পক্ষে তা হয়নি। তিনি যে পর্যায় থেকে মানবতার বিনির্মাণ ও সংস্কারের কাজ শুরু করেছেন, এ পর্যায় থেকে কোনও পয়গাম্বর, কোনও সংস্কারক ও দায়িত্বশীলকে কাজ শুরু করার প্রয়োজন কখনও হয়নি। এ স্তর ছিল সেখানের, যেখানে পশুত্বের শেষ সীমা পেরিয়ে মানবতার সীমানা শুরু হত। আর তিনি যে স্তর পর্যন্ত এ কাজকে উন্নীত করেছিলেন, সে পর্যন্তও কখনো মনুষ্যত্ব বিনির্মাণের কাজ উন্নীত হয়নি। তিনি যেভাবে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত নিকৃষ্টতা ও হীনতা থেকে কাজ শুরু করেছেন, তদ্রুপ মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ চূঁড়ায় এ কাজকে উন্নীত করেছেন। তার হাতে গড়া প্রত্যেকটি মানুষ নবুওয়াতের এক একটি ঈষর্ণীয় সাফল্য। মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কারণ, মানবতার সংস্কারে বরং এই গোটা সৃষ্টিজগতে পয়গম্বরগণ ছাড়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, তার চেয়ে চিত্তাকর্ষক ও মনোলোভা প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না, যা তাদের জীবনে দৃষ্টিগোচর হয় তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস, তাদের গভীর জ্ঞান, সৎ ও সরল মন, তাদের অনাড়ম্বর অলৌকিক জীবন যাপন, তাদের আত্মবিস্মৃতি ও আল্লাহ ভীতি, তাদে পুতঃপবিত্রতা ও স্বচ্ছতা, তাদের স্নেহ-মমতা ও অনুগ্রহ-অনুকম্পা, তাদে বীরত্ব ও সাহসিকতা তাদের ইবাদত-বন্দেগীর আগ্রহ-উদ্যম, তাদে শাহাদাতের তামান্না, তাদের অশ্বারোহন, তাদের অতন্দ্র রাত্রিজাগরণ, তাদে স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধন-সম্পদের প্রতি ভ্রুক্ষেপহীনতা তাদের দুনিয়াবিমুখতা অনাসক্তি, তাদের ন্যায়পরায়ণতা, তাদের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও চমৎকা ব্যবস্থাপনা– পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনও দৃষ্টান্ত নেই। নবুওয়াতের স্বার্থকত হল, সে মানব জাতিকে তৈরী করেছে। তাদের এক একজন এমন মহামান ছিলেন, যদি ইতিহাস সাক্ষ্য না দিত এবং দুনিয়া তার সত্যায়ন না করত তাহলে একটি কবিসুলভ ধারণা এবং কাল্পনিক উপাখ্যান মনে হত। কিন্তু

একটি ঐতিহাসিক মহাসত্য। এ ছিল এমন এক মানবীয় অস্তিত্ব, যাতে নবুওয়াতের বিস্ময়কর অলৌকিক গরশ পরস্পর বিরোধী গুণ-বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল। কবির ভাষায়–

خاکی ونوری نہاد، بندۂ مولیٰ صفات — ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل — اس کا دل فریب، اس کی نگہ دل نواز
نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو — رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز
اس کے زمانے عجیب، اس کے فسانے غریب — عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل
ساقی ارباب ذوق، فارس میدان شوق — بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل

"মাটি ও নূরের তৈরী, খোদাপ্রদত্ত গুণের অধিকারী, তার অমুখাপেক্ষী অন্তর দু'জাহানের ধনী। তার প্রত্যাশা কম কিংবা কোনও উচ্চবিলাস নেই। লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুমহান। তার পরিশোধ বড় বিস্ময়কর; তার দৃষ্টি সুষম ও সন্তোষজনক। বিনম্র মিষ্টভাষী তথ্যানুসন্ধানও নিখুঁত তদন্তে কঠোর হস্ত। যুদ্ধ হোক কিংবা সভা সমাবেশ সদা সর্বদা স্বচ্ছপ্রাণ নির্মল। তার যুগ বড় বিস্ময়কর, তার শান ভূতপূর্ব। নষ্ট পচা যুগকে তিনি জানিয়েছেন ভ্রমণের আহ্বান। জ্ঞানপিপাসুদের পরিতৃপ্তকারী, আগ্রহ-উদ্যমের ময়দানে অশ্বারোহী। মন তার নির্ভেজাল। তরবারী তার আসল।"

এ মানুষ যখন তৈরী হয়ে গেল, তখন তিনি ইবাদত এবং জীবন সর্বক্ষেত্রে কার্যকরী, সুযোগ্য ও অমূল্য রত্ন প্রমাণিত হয়েছেন। আর যে দায়িত্ব তার কাঁধে ন্যাস্ত করা হয়েছে, তিনি আপন যোগ্যতা দক্ষতা, কর্তব্যপরায়ণতা ও দায়িত্বজ্ঞান এবং নিজের কর্ম প্রেরণা ও খেদমতের উৎসাহের প্রমাণ দিয়েছেন। তাকে যদি বিচার ও সালিসির দায়িত্ব দেওয়া হত, তাহলে তিনি উত্তম ও সুযোগ্য বিচারক প্রমাণ হতেন। যিনি সুনিপুণ তুলাদণ্ডে বাদী-বিবাদীর মাঝে ফয়সালা করতেন। তিনি সেনা কমান্ডার কিংবা নেতা নিযুক্ত হলে নিজের যুদ্ধ কৌশল ও যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা, বীরত্ব ও অনুকম্পার স্বাক্ষর রাখতেন। তাকে সৈন্যদের হাতিয়ার ন্যাস্ত করা হলে তিনি একজন সুদক্ষ, কর্মঠ, অকুতোভয়-নির্ভীক ও নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক প্রমাণিত হতেন। তাকে যদি সেনানায়কের উচ্চ পদ থেকে অপসারণ করা হত, তাহলে তার ললাটে অসন্তোষের আকুঞ্চন এবং তার মুখে অভিযোগের একটি অক্ষরও আসতো না। সাধারণ সৈন্য কিংবা আমজনতা তাদের যোগ্যতা এবং কর্মপ্রেরণা ও তৎপরতার কোনও পার্থক্য বা ঘাটতি অনুভব করেনি। তিনি চাকর-নওকরের মনিব কিংবা রাষ্ট্রীয় অফিসার হতেন, তাহলে একজন উদারপ্রাণ ও স্নেহপরায়ণ

মনিব, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী মানবতাপ্রেমী সম্ভ্রান্ত বুযুর্গ প্রমাণ হয়েছেন। তিনি যদি শ্রমিক-মজদুর হতেন, তাহলে একজন দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ ও কর্মঠ শ্রমিক। যার চিন্তা ছিল নিজের পারিশ্রমিক বাড়ানো অপেক্ষা কাজ বেশি করা। তিনি যদি হতদরিদ্র-অভাবী হতেন; তবে হতেন ধৈর্যশীল আত্মতুষ্ট। ধনী হলে একজন কৃতজ্ঞ ও সদাচারী ধনী। আলেম হলে একজন বাআমল আলেম। নিজের ইলম ও জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করার মনোবাসনা এবং নিজের ইলম বিতরণে উদারপ্রাণ। তালিবে ইলম হলে সঠিক ইলম-জ্ঞান হাসিলের অতৃপ্ত তৃষ্ণা এবং একে চূড়ান্ত পর্যায়ের ইবাদত মনে করে তার অনুসন্ধিৎসায় আত্মমনোযোগ ও তার জন্য বিরাট বিরাট মেহনত, বড় বড় খেদমত আঞ্জামদানকারী ছিলেন। তিনি যদি কোনও শহরের শাসক নিযুক্ত হতেন, তাহলে রাতের অতন্দ্র প্রহরী এবং দিনে ন্যায়বিচারক ছিলেন। মোটকথা, এই মানুষ মানব সমাজের যে স্থান ও যে আসনেই থাকতেন, নাগীনার মত জড়িয়ে থাকতেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও ভয়ঙ্কর দায়িত্ব রাষ্ট্র পরিচালনার ভার যখন তার কাঁধে ন্যস্ত হয়, তখন সে মানুষ দুনিয়াবিমুখতা, দৈন্যতা, আত্মত্যাগ ও কুরবানী এবং কষ্ট সহিষ্ণুতা ও অনাড়ম্বরতার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দুনিয়া বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। আজও সে বিস্ময় এতটুকু হ্রাস পায়নি।

আসুন, আমাদের সাথে খেলাফতে রাশেদার সেসব ঘটনা পড়ে নিন। সিদ্দীকি যুগের ঐতিহাসিক লিখেন, একদিন প্রথম খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত আবু বকর রাযি. এর সহধর্মিনী পায়েস খাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। সিদ্দীকে আকবার জবাব দিলেন, আমার কাছে কোন পয়সা নেই। সহধর্মিনী বলেন, অনুমতি হলে আমি প্রতিদিনের খরচ থেকে বাঁচিয়ে কিছু পয়সা যোগাড় করে নিব। খলীফা বললেন, সঞ্চয় কর। কয়েকদিনের মধ্যে কিছু পয়সা জমা হয়ে গেল। তখন হযরত আবু বকর রাযি. কে দিলেন পায়েসের ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি পয়সা নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে, এই ব্যয় প্রয়োজন অতিরিক্ত। কাজেই তা সরকারী কোষাগারের প্রাপ্য। সুতরাং তিনি সে পয়সা বাইতুল মালে জমা করে দিলেন এবং সে পরিমাণ অর্থ নিজের ভাতা থেকে মওকুফ করে দিলেন।

আপনি হয়ত অনেক রাষ্ট্রের রাজা-বাদশা ও বহু গণতান্ত্রিক নেতাদের শাসনামলের বিবরণ শুনেছেন। তাদের রাজকীয় আড়ম্বরতা, জাঁকজমক, ধুমধাম ও ভোগবিলাসের তাণ্ডব দেখেছেন। সপ্তম খৃস্ট শতকের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রভাবশালী শাসক খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর রাযি. শাসনকালের (সিরিয়া সফর) বিবরণ ঐতিহাসিকের ভাষায় শুনুন। মাওলানা

শিবলী তার বিখ্যাত রচনা 'আল-ফারুক' গ্রন্থে ষোল হিজরীর বাইতুল মুকাদ্দাস সফরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আরবী ঐতিহাসিকগণের উদ্ধৃতিতে লিখেন, 'দর্শককূলের অধীর প্রতীক্ষা ছিল ফারুকে আযমের সফর আর সফরও এমন, যাতে শত্রুদের উপর ইসলামী মাহাত্ম্য শ্রেষ্ঠত্বের প্রভাব বিস্তার করা উদ্দেশ্য ছিল– এ সফর কিভাবে এবং কী আসবাবপত্র নিয়ে হবে? কিন্তু এখানে ঢোল-ডংকা, চাকর-বাকর, সৈন্যসামন্ত তো দূরের কথা, সামান্য তাবু ও কুঁড়েঘর পর্যন্ত ছিল না। বাহন হিসেবে ঘোড়া ছিল মাত্র। আর সঙ্গে ক'জন মুহাজির ও আনসার ছিলেন। তথাপি যেখানেই এই কথা শোনা যেত যে, ফারুকে আযম মদীনা থেকে সিরিয়া গমনের ইচ্ছা করেছেন, মাটি কেঁপে উঠত। জাবিয়াতে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের সন্ধিচুক্তিতে এখানেই লেখা হয়। চুক্তিপত্র চূড়ান্ত করার পর হযরত উমর রাযি. বাইতুল মুকাদ্দাস রওনা হন। বাহন হিসেবে যে ঘোড়া ছিল, তার পা অতিরিক্ত ঘর্ষণে ব্যথাতুর হয়ে গিয়েছিল। পা ফেলত থেমে থেমে, ধীরে ধীরে। হযরত উমর রাযি. এ অবস্থাদৃষ্টে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। লোকজন তুর্কীজাতের একটি উন্নত ঘোড়া হাজির করলেন। ঘোড়া ছিল উদ্ধত ও চতুর। হযরত উমর রাযি. সওয়ার হলে ঘোড়রাটি হ্রেষাধ্বনী দিতে লাগল। হযরত উমর রাযি. বললেন, "ঐ হতভাগা! এই দাম্ভিক চাল-চলন তুই কোথায় শিখলি?' অনন্তর নেমে গেলেন এবং পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। বাইতুল মুকাদ্দাসের নিকটবর্তী হলে হযরত আবু উবাইদা রাযি. এবং সেনানায়কগণ অভ্যর্থনা জানাতে আসলেন। হযরত উমর রাযি. এর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র এত সাধারণ ছিল যে, তা দেখে মুসলমানগণ লজ্জাবোধ করছিলেন, "খৃস্টানরা এসব দেখে মনে মনে কী বলবে?" সুতরাং লোকজন তুর্কী ঘোড়া ও উন্নত দামী পোশাক হাজির করল। হযরত উমর রাযি. বললেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন, তা ইসলামের সম্মান আর আমার জন্য তাই যথেষ্ট।"

দ্বিতীয় সিরিয়া সফর (১৮ হি.) এর অবস্থাও শুনুন।

হযরত উমর রাযি. সিরিয়া সফরে যাবেন। মদীনার শাসনভার ন্যস্ত করলেন হযরত আলী রাযি. এর ওপর। তিনি এরপর ইলাভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তার গোলাম ইরফা এবং অনেক সাহাবায়ে কিরাম তার সফরসঙ্গী। ইলার কাছাকাছি এসে পৌঁছলেন। কোনও কল্যাণার্থে স্বীয় ঘোড়া গোলামকে দিয়ে স্বয়ং তার উটের উপর আরোহন করলেন। পথিমধ্যে যেই দেখত, জিজ্ঞাসা করত, আমীরুল মুমিনীন কোথায়? বলতেন, তোমাদের সামনে। এভাবেই ইলা এসে পৌঁছেন। এখানে দু'একদিন অবস্থান করেন। মোটা সুতী কাপড়ের যে জামাটি তখন তার শরীরে শোভা পাচ্ছিল, সেটি হাওদার সাথে

আঁচড় লেগে পেছন দিক থেকে ফেটে গিয়েছিল। রিফু করার জন্য ইলার পাদ্রীকে দিলেন। তিনি তাতে নিজ হাতে তালি লাগিয়ে দিলেন। সাথে একটি নতুন জামাও পেশ করলেন। হযরত উমর রাযি. নিজের জামাটিই পরিধান করলেন আর বললেন, এতে ঘাম ভালভাবে টেনে যায়।'

খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত্রের বিভিন্ন দিক এবং তাদের উন্নত চরিত্র মাধুরীর বিবরণ নানা বই-পুস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেগুলো একত্রিত করে আপনি নিজের মন-মানসে একজন মহাপুরুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র তৈরী করতে পারেন। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁদের একজন (আমাদের সাথে হযরত আলী রাযি. ইবনে আবী তালেব) এর চারিত্রিক সৌকর্য ও তার জীবনের প্রতিচ্ছবি আমাদের নিবন্ধে বিদ্যমান। তা পাঠ করুন এবং দেখুন যে, একজন মানুষের জীবন চরিত ও আখলাকের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ও চিত্তাকর্ষক প্রতিচিত্র আর কি হতে পারে! নবুওয়াত-তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং তার মানুষ গঠন ও রাসায়নিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছে। তার খেদমতে অহর্নিশ অবস্থানকারী এক ঘনিষ্ট বন্ধু যরার ইবনে যামরাহ রাযি. তার চিত্র অংকন করে বলেন, 'বড় উঁচু দৃষ্টি, বড় উঁচু সাহস, খুবই শক্তিশালী, সারগর্ভ ও কোমল ভাষায় কথা বলতেন। সত্য ও ন্যায়সঙ্গত ফায়সালা করতেন। মুখ ও ভাবভঙ্গি থেকে সব সময় জ্ঞানের প্রস্রবণ প্রবাহিত হত। প্রত্যেক কাজেই তা ঝরে পড়ত। দুনিয়া এবং দুনিয়ার চাকচিক্যে ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন। রাত এবং রাতের আঁধারে খুশি-প্রাণবন্ত থাকতেন। অশ্রুসজল চোখ, সব সময় চিন্তা-ভাবনায় ডুবে থাকতেন। যুগের গতিধারায় বিস্মিত, মনের সাথে সব সময় কথোপকথন করতেন। মোটাসোটা কাপড়ই ছিল পছন্দনীয়। গরীবানা ও সাদাসিধে খাবারই ছিল আনন্দদায়ক। কোনও স্বাতন্ত্রতা পছন্দ করতেন না। তাকে দেখে একজন সাধারণ লোক মনে হত। আমরা প্রশ্ন করলে তার জবাব দিতেন। আমরা তার দরবারে হাজির হলে সালাম নিবেদন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসায় তিনি অগ্রগামী ছিলেন। আমরা তাঁকে দাওয়াত করলে তিনি তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু এর ঘনিষ্ঠতা ও সাম্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রভাব-প্রতিপত্তির অবস্থা এরূপ ছিল যে, কারও কথা বলার সাহস হত না। কথা বলা শুরু করা কঠিন হয়ে পড়ত। কখনও মুচকি হাসলে তাঁর দাঁতগুলো মুক্তামালা বলে মনে হত। ধার্মিক-দ্বীনদার লোকদের ইজ্জত এবং দরিদ্র-ভিখারীদেরকে মহব্বত করতেন। কিন্তু এই বিনয়-নম্রতা ও দৈন্যতা সত্ত্বেও কোনও প্রতাপশালী ও ধনবান লোকের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না যে, তার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত করিয়ে নিবে কিংবা কিছুটা শিথিলতা ও স্বজনপ্রীতি করাবে। দুর্বল অসহায় মানুষের মনে সবসময়ই তার ন্যায়-ইনসাফের প্রতি আস্থা ছিল।

আমি শপথ করে বলছি, আমি এক রাতে তাকে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, রাত তার সমস্ত অন্ধকার আবরণ ঢেলে দিয়েছিল। নক্ষত্রগুলো অস্তমিত হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছিলেন মসজিদের মেহরাবে দণ্ডায়মান। দাড়ি ছিল ধূলি ধূসরিত। তিনি এমনভাবে ছটফট করছিলেন, যেন তাকে কোন সর্প দংশন করেছে। এমনভাবে ক্রন্দন করছিলেন, যেন তিনি ব্যথায় চুরচুর হয়ে গেছেন। তখন আমার কর্ণকুহরে তার এ বাক্য প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, হে দুনিয়া! হে দুনিয়া! তুই কি আমার পরীক্ষা নিতে চাস! আমাকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী করার সাহস করেছিস? নিরাশ হয়ে যা! অন্য কাউকে প্ররোচিত কর! ধোঁকা দে! আমি তো তোকে এমন তিন তালাক দিয়েছি, যার পরে ফিরিয়ে নেওয়ার অবকাশ নেই। তোর আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত। তোর সুখ বিলাস অলীক-অবাস্তব। তোর বিপদ-বিপর্যয় মারাত্মক। হায়! পাথেয় কত স্বল্প! সফর কত দীর্ঘ আর পথ কত ভয়ঙ্কর কণ্টকাকীর্ণ!"

নবুওয়াতের এই কীর্তি প্রথম যুগ এবং প্রথম হিজরী শতকের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর শিক্ষা এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের রেখে যাওয়া জীবনাদর্শ মুসলমানদের পরবর্তী প্রজন্ম এবং বিশাল-বিস্তৃত মুসলিম জাহানের বিভিন্ন প্রান্তে জীবনের প্রতিটি শাখায় ও সর্বপ্রকার যোগ্যতায় মহামানব তৈরী করেছে। যাদের মানবীয় উৎকর্ষতা, সংশয়-সন্দেহ ও বিবাদ-বিসম্বাদের উর্ধ্বে ছিল। এই অবিনশ্বর 'মাদরাসায়ে নবুওয়াত' বা নববী শিক্ষালয়ের পাশ করা গ্রাজুয়েট ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (যারা কেবল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনুষ্যত্ব, আখলাক চরিত্র, আল্লাহ প্রেম ও মানব সেবার দীক্ষা নিয়েছিলেন) সমকালের সৌন্দর্য-সৌকর্য এবং মানবতার সম্মান-মর্যাদার কারণ হয়েছেন। কোনও ঐতিহাসিক এবং বড় থেকে বড় কোন লেখক-গবেষকের এই শক্তি নেই যে, সেসব লক্ষ লক্ষ আল্লাহ প্রেমিক ঈমানদারদের কেবল নামের তালিকা পেশ করবে। যারা এ শিক্ষার প্রভাবে যুগে যুগে জায়গায় জায়গায় দিকদিগন্তে জন্ম নিয়েছেন। আর তাদের উন্নত চরিত্র মাধুরী, তাদের মানবিক উৎকর্ষতা, মনুষ্যত্ব তাদের রুহানী-আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে পরিবেষ্টন করা তো কোনও প্রকারেই সম্ভব নয়। তাদের জীবন চরিত্র (যতটুকু ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে, তা) পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। এই মাটির মানুষ আত্মিক উৎকর্ষতা ও পবিত্র, উচ্চ সাহসিকতা, মানুষের সহমর্মিতা, মনের উদারতা, বদান্যতা, আত্মত্যাগ ও কুরবানী, পার্থিব সম্পদ থেকে অমুখাপেক্ষিতা, রাজন্যবর্গ থেকে অভয়, আল্লাহর মারেফাত ও আল্লাহর প্রেম এবং অদৃশ্য-গায়েবী বাস্তবতাগুলোর প্রতি ঈমান-ইয়াকীনের সে চূড়ান্ত সীমায়ও কি পৌঁছাতে পারে? তাদের ঈমান-ইয়াকীন লক্ষ লক্ষ

মানুষের অন্তর ঈমান-ইয়াকীনে ভরে দিয়েছে। তাদের প্রেম লক্ষ লক্ষ মানুষের বক্ষকে প্রেমের উষ্ণতা ও প্রজ্জ্বলিত ও আলোকিত করে দিয়েছে। তাদের চরিত্র মাধুরী রক্তখেকো শত্রুকে নিবেদিতপ্রাণ এবং লক্ষ পশুসমতূল্য মানুষকে প্রকৃত মানুষ বানিয়ে দিয়েছে। তাদের সংশ্রব-সাহচর্য ও প্রভাব আল্লাহকে সন্ধান, আল্লাহ ভীতি এবং মানবসেবা ও মানবপ্রেমের গণজোয়ার সৃষ্টি করেছে। আমাদের ভারতবর্ষ এক্ষেত্রে বড় ভাগ্যবান, সে তার বক্ষে এমন এমন অনেক আল্লাহ প্রেমিক মহাপুরুষদের ধারণ করেছে, যারা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব যুগে মানবতা ও মনুষ্যত্বের উৎকর্ষতা এবং মানুষের নাম আলোকোজ্জ্বল করেছেন।

সমকালের রাজাবাদশাদের মাঝেও, যারা জনগণকে শোষণ-পীড়ন, সাম্রাজ্যবাদীতা এবং ভোগ-বিলাস ছাড়া কিছুই জানত না –এই শিক্ষা এমন আল্লাহভীরু ও দুনিয়াবিমুখ স্বভাবের বাদশা সৃষ্টি করেছে, যারা দুনিয়াবিমুখতা ও আত্মত্যাগের এমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যাদের উপমা দুনিয়া বিরাগী দরবেশ এবং নির্জন একাকীত্ব অবলম্বনকারী ফকীরদের মাঝে পাওয়াও দুষ্কর। ইসলামী ইতিহাসের সর্বযুগে এবং মুসলিম জাহানের প্রতিটি প্রান্তে এমন ব্যক্তিবর্গ পাওয়া যায়, আল্লামা ইকবাল (র) এর ভাষায়–

جن کی حکومت سے ہے فاش یہ رمز غریب
سلطنتِ اہل دیں فقر ہے شاہی نہیں

"যাদের শাসন ব্যবস্থায় এই রহস্য উন্মোচিত হয়েছে, তা আহলে দ্বীন ধর্মভীরু ব্যক্তিবর্গের রাজ্য শাসন দৈন্যতা; রাজত্ব নয়।"

'মাদরাসায়ে নবুওয়াত' এর শিক্ষা ও সংশ্রবপ্রাপ্ত সুলতানগণের মধ্যে যাদের তালিকা সুদীর্ঘ। আপনি কেবল সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী (র) এর জীবনকর্ম পড়ে দেখুন। ষষ্ঠ হিজরী শতকে মধ্যপ্রাচ্যের এই সবচেয়ে বড় শাসক (যিনি কারদিস্তানের পাহাড় থেকে নিয়ে নওবা মরুভূমি পর্যন্ত শাসন করতেন) সম্পর্কে তার সেক্রেটারী কাযী ইবনে শাদ্দাদ সাক্ষ্য দেন– "তার গোটা জীবনে যাকাত ফরয হওয়ার মত পরিস্থিতি হয়নি। কারণ, তিনি এতটুকু সম্বল কখনও রাখেননি, যার উপর যাকাত ফরয হয়। তার সমুদয় ধন-সম্পদ দান-সদকায় ব্যয় হয়েছে। শুধুমাত্র ছিচল্লিশ দেরহাম সাহায্য হিসেবে এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। এছাড়া তার কোনও ধন-সম্পদ, কোনও স্থাবর-অস্থাবর মালিকানা স্বত্ত্ব, কোনও ঘরদুয়ার, বাগ-বাগিচা, ক্ষেতখামার তিনি মৃত্যুকালে রেখে যাননি। তার কাফন-দাফনে একটি পয়সাও তার পরিত্যক্ত বা রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে খরচ করা সম্ভব হয়নি।

সমুদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঋণ নিয়ে করা হয়। এমনকি কবরের জন্য ঘাসের আঁটি ঋণ হিসেবে আসে। কাফনের ব্যবস্থা করেন তার উযীর ও কাতেব কাযী ফাযেল কোনও হালাল উপায়ে।"

মানবীয় উৎকর্ষতা, আত্মিক পবিত্রতা, উচ্চ আশা ও সাহসিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে সুলতান আইয়ূবী ইতিহাসের মহাপুরুষ গণ্য হওয়ার যোগ্য। বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয়কালে খৃস্টান দিগ্বীজয়ী বীরদের বিরুদ্ধে (যারা শোষণ-তোষণের এক ইতিহাস রচনা করেছিল) সুলতান যে অনুগ্রহ-অনুকম্পা ও দয়াসুলভ এবং যে কৃপা ও উদারতার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, তার আলোচনা করতে গিয়ে এক পশ্চিমা ঐতিহাসিক স্টেনলী লেন পোল (Stanley Lane Pool) লিখেন, 'যদি সুলতান সালাহুদ্দীনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে কেবল এ কীর্তির কথা দুনিয়াবাসী জানত যে, তিনি কিভাবে জেরুজালেম বা বাইতুল মুকাদ্দাসকে পুনরুদ্ধার করেছেন, তাহলে তার এই সফলতাই একথা প্রমাণ করতে যথেষ্ট যে, তিনি সমকালের বরং সর্বযুগের সবচেয়ে বিচক্ষণ ও অকুতোভয় সিংহপুরুষ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় একচ্ছত্র ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

আপনারা মধ্যপ্রাচ্যের এক অভিজাত মহান শাসকের অনুগ্রহ-অনুকম্পার ইতিহাস শুনেছেন। স্বয়ং স্বদেশের একজন মুসলিম শাসকের ঘটনাও শুনুন, যিনি একনিষ্ঠতা, অনুকম্পা, আত্মত্যাগ এবং উঁচু সাহসিকতার অনন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ হচ্ছে হিজরী দশ শতকের এক ক্ষমতাধর শাসক মুযাফফর হালীম গুজরাট শাসকের (মৃতঃ ৯৩২ হিঃ) ঘটনা। যিনি মাহমূদ শাহ খলজীর সাহায্যে (যিনি নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসীদের হাতে সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন এবং তার বিশ্বাসঘাতক সহচরবৃন্দ তার রাজত্ব দখল করে নিয়েছিল।) মাণ্ডো আক্রমণ করেন এবং তা জয় করে নেন। গুজরাটের ইতিহাস রচয়িতার ভাষায় শুনুন, 'দূর্গ অবরোধের পর যখন সম্রাট মুযাফফর হালীম ভিতরে প্রবেশ করলেন আর সহচর উমারাগণ (শাসকবর্গ) মালূ সম্রাটের ধৈর্য সম্পদ, গুপ্তধন ও রত্নভাণ্ডার দেখল এবং তার রাষ্ট্রের শস্য-শ্যামলতা ও ধন-সম্পদের খবর পেল, তখন তারা মুযাফফর শাহের দরবারে আবেদন করল, এ যুদ্ধে প্রায় দুই হাজার বীর সৈনিক শাহাদাত বরণ করেছেন। এ বিপুল ক্ষতির পরও এই বাদশাহর হাতে এ রাষ্ট্রের শাসনভার ন্যস্ত করা উচিৎ নয়। যার অদক্ষতা ও কূটকৌশলের কারণে মনদিলি রায় এদেশ দখল করে নিয়েছে। সম্রাট একথা শুনে সফর স্থগিত করলেন এবং দূর্গ থেকে বেরিয়ে এসে মাহমূদ শাহকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন তার অনুচরদের কাউকে দূর্গে প্রবেশের অনুমতি না দেন। মাহমূদ শাহ অনেক পীড়াপীড়ি ও জোর অনুরোধ জানালেন, বাদশা কিছুদিন দূর্গের ভেতর বিশ্রামে থাকুন। কিন্তু মুযাফফর শাহ

এই অনুরোধ মেনে নিলেন না। অনন্তর তিনি বললেন, আমি এই যুদ্ধ-জিহাদ একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য করেছি। উমারাদের বক্তব্যে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আল্লাহ না করুন আমার মনে কোন ভুল আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে আর আমার একনিষ্ঠতা বরবাদ হয়ে যাবে। আমি মাহমূদ শাহের উপর কোন দয়া করিনি বরং মাহমূদ শাহেরই আমার উপর অনেক অনুগ্রহ আছে। তার কারণেই আমার এই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।'

আমি বলছি না যে, ইসলামী যুগে যত শাসক ও সুলতান অতিবাহিত হয়েছেন, তারা সকলেই নূরুদ্দীন জঙ্গী, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, নাসিরুদ্দীন, মাহমূদ এবং সুলতান মুযাফফর শাহের মত ছিলেন। তবে যেসব শাসক ও সুলতানদের মাঝে মানবীয় উৎকর্ষতা, আল্লাহভীরুতা, দুনিয়া বিমুখতা ও দরবেশী, আত্মত্যাগ ও কুরবানী এবং মহানুভবতা জনদরদ ও অনুগ্রহশীলতার এ অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, তাদের মধ্যে যারা সমকালের শীর্ষস্থানীয়, রাজা-বাদশাহের সাহচর্য থেকে দূরে, যুগ-সময় থেকে পৃথক দেখা যায়, তার সবই নবুওয়াতের বরকত এবং ধর্মীয় প্রেরণার সুফল। আপনি যদি তাদের জীবনকর্ম ও জীবন-চরিত পাঠ করেন, তাহলে আপনাদের অনুধাবন করতে কষ্ট হবে না যে, তাদের সকলের সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা (শিক্ষা-দীক্ষা, সাহচর্য ও হৃদ্যতা, অনুসরণ ও অনুকরণের মাধ্যম) এমনই এক হেদায়াতের আলোকবর্তিকার সাথে ছিল, যা সর্বকালে সর্বযুগে মহামানব জন্ম দিয়েছে। চাই তাদের যুগ সময় যত দূরেই হোক না কেন। বস্তুতঃ তারা সকলেই সেই মহান নববী শিক্ষালয়ের বরকতপ্রাপ্ত। যা মানুষ গড়ার কাজ সবচেয়ে প্রশস্ত তুলাদণ্ডে এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে আঞ্জাম দিয়েছে। যার দান আজও মানবতার প্রদীপকে আলো ঝলমলে করে আছে। যেখানেই আলো উজ্জ্বলতা আছে, সেই প্রদীপের আলোকচ্ছটা প্রতিবিম্বিত হচ্ছে।

یک چراغیست دریں خانہ کہ از پرتو آں
ہر کجا می نگرم انجمنے ساختہ اند

"শাশ্বত মহান এক আলোর ঝর্ণা
আছে এই আঁধার ধরায়,
রোশনীতে যার ঝলমলে সব
যতদূর মোর দৃষ্টি যায়।"

আমাদের আধুনিক সভ্যতা ও বর্তমান চিন্তাধারার নেতৃত্ব মানব সমাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার মত ব্যক্তিত্ব তৈরী করতে এবং মনুষ্যত্ব ও মানব চরিত্র গঠনে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তারা সূর্যকিরণ বন্দি করতে পারে, তারা মহাশূন্যে

ভ্রমণের জন্য নিরাপদ ও দ্রুতগতিসম্পন্ন যান তৈরী করতে পারে। তারা মানুষকে চাঁদের দেশে এবং গ্রহে গ্রহে পৌঁছাতে পারে। তারা যান্ত্রিক শক্তির জোরে বড় বড় কাজ করতে পারে। তারা রাষ্ট্র থেকে দারিদ্র দূর করতে পারে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নতি করতে পারে। তারা সমগ্র জাতি ও রাষ্ট্রের জনসাধারণকে শিক্ষিত বানাতে পারে। আধুনিক সভ্যতার এসব বিজয়-সাফল্য কারও অস্বীকার করার অবকাশ নেই। কিন্তু সে সৎ এবং ঈমানদার মানুষ তৈরী করতে যারপরনাই অক্ষম। এটা তার সবচেয়ে বড় এবং চরম ব্যর্থতা ও দূর্ভাগ্য। এ কারণেই শত শত বছরের চেষ্টা-শ্রম বিফল হচ্ছে। গোটা পৃথিবী শিকার হচ্ছে নৈরাশ্য, হতাশা ও বিক্ষিপ্ততার। আজ তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপরও আস্থা হারাচ্ছে। আশঙ্কা হচ্ছে, পৃথিবীতে এক মহাবিপর্যয় ও কঠিন পাশ্বপ্রতিক্রিয়ার আন্দোলন এবং জ্ঞান ও সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগের সূচনা না হয়। বিপথগামী পথভ্রষ্ট লোকেরা নিস্পাপ ও সুস্থ-সৎ এবং উপায়-উপকরণকেও বিপদজনক বরং ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক বানিয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল তখতা দিয়ে কখনও নিরাপদ ও মজবুত নৌযান তৈরী হতে পারে না। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অলীক চিন্তা যে, ত্রুটিপূর্ণ তখতাগুলো স্বতন্ত্রভাবে দুর্বল, অনিরাপদ ও অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু যখন এগুলো একটিকে অপরটির সাথে জোড়া দেওয়া হবে এবং তা দিয়ে কোনও নৌযান তৈরী করা হবে, তখন তা সুদৃঢ়, মজবুত ও নিরাপদ হয়ে যায়। চোর-ডাকাত, ছিনতাইকারী স্বতন্ত্রভাবে তো চোর-ডাকাত। কিন্তু যখন তারা আপোষে সংঘবদ্ধ একটি চক্র হয়ে যাবে, তখন তারা রক্ষক ও দায়িত্বশীল মানুষের একটি পবিত্র দলে পরিণত হবে।

আধুনিক চিন্তাধারার নেতৃত্বে পৃথিবী যেসব মানুষ উপহার দিয়েছে। তারা ঈমান-ইয়াকীন শূন্য মানবাত্মার বিরোধী, চারিত্রিক অনুভূতি থেকে বঞ্চিত, প্রেম-ভালবাসা ও ঐকান্তিকতার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ, মানবতার সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে উদাসীন। তারা শুধু জানে স্বাদ ও অভিজাত্য দর্শন সম্পর্কে কিংবা নিছক সাম্প্রদায়িকতা, গোত্রপূঁজা ও রাষ্ট্র-মিত্রতার অর্থ। এ শ্রেণীর ও এ বৈশিষ্ট্যের মানুষগুলো চাই গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী নেতা হোক কিংবা সমাজতন্ত্রের তল্পীবাহকই হোক, কখনও কোনও সুস্থ সমাজ, শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশ এবং আল্লাহভীরু ও পুতঃপবিত্র মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাদের উপর আল্লাহর সৃষ্টি ও মানবজাতির ভাগ্যোন্নয়ন সম্পর্কে কোন ভরসা করা যায় না।

এই বিশ্বকে শ্রেষ্ঠমানব ও শ্রেষ্ঠ সমাজ কেবল নবুওয়াতই গঠন করেছে। এর কাছেই অন্তর পরিবর্তন করা, উত্তপ্ত করা প্রবৃত্তিকে দমন ও স্থির শান্ত করা, সততা, পবিত্রতা ও পূণ্যকর্মের আসক্তি আর গুনাহ ও পাপ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করা, ধন-সম্পদ, রাষ্ট্র ও রাজত্ব, মান-সম্মান ও পদমর্যাদা, নেতৃত্ব-শোষণ

ও আভিজাত্যের যাদুময় আকর্ষণ-আকর্ষণ প্রতিরোধ করার সকল শক্তি রয়েছে। আর সেসব ব্যক্তিবর্গই পারেন পৃথিবীকে অনিবার্য বিপর্যয় ও আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করতে, যারা এই শক্তি ও যোগ্যতার অধিকারী। নবুওয়াত দুনিয়াকে কোন বিজ্ঞান দেয়নি। আবিষ্কার দেয়নি। এর দাবীও করে না, তজ্জন্য তার কোন অনুতাপ কিংবা আক্ষেপও নেই। দুর্বলতাও প্রকাশ করে না। এর সফলতা হচ্ছে, নবুওয়াত দুনিয়াতে এমন মানবগোষ্ঠী উপহার দিয়েছে যে, যারা স্বয়ং সঠিক পথে চলতে সক্ষম। পারে গোটা দুনিয়াকে সঠিক পথে চালাতে। প্রত্যেক কল্যাণকর বস্তু-উপকরণ দ্বারা নিজে উপকৃত হতে এবং অপরকে উপকৃত করতে পারে। যারা প্রত্যেক শক্তি ও নেয়ামতের সন্ধান লাভ করতে পারে। যারা স্বীয় জীবনের আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং মহান স্রষ্টা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। নিজের ব্যক্তি সত্ত্বায় উপকৃত হওয়া এবং এর চেয়েও বেশি নেয়ামত লাভের যোগ্যতা রাখে। তাদের অস্তিত্ব প্রকৃত মানবতার রক্ষাকবচ। তাদের প্রশিক্ষণই নবুওয়াতের মহান সাফল্য।

নবুওয়াতের দান

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক মানুষ ও দল অতিবাহিত হয়েছে, যারা বিশ্ব মানবতার সেবা করেছেন এবং পৃথিবী বিনির্মাণ-সংস্কার ও উন্নয়নে অংশ নিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সকল ইতিহাস থেকে অগ্রসর হয়ে যান, নিজেকে মানবতার সংস্কারক ও সেবকের মর্যাদায় উপস্থাপন করেন। তিনি আশা করেন, তাকেও এই মানদণ্ডে পরিমাপ করা হবে এবং পরখ করা হবে, একথা সত্য। তাকেও অবকাশ দেওয়া উচিৎ। তার সেবা ও অনুদান অনুগ্রহকে পরিমাপ করা উচিৎ। তার সিদ্ধান্ত হবে– এই মানদণ্ডে কে পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ হয়।

সর্বপ্রথম আমাদের সামনে এক অভিজাত ও বিচক্ষণ দলের নাম আসে। তারা হলেন দার্শনিকদের দল। তাদের মধ্যে রয়েছেন বড় বড় ইউনানী দার্শনিক। আরও আছেন হিন্দুস্তানের দার্শনিকগণ। আমাদের মন-মস্তিষ্ক প্রথম থেকে দর্শনশাস্ত্রে প্রভাবিত ছিল। আমরা তাদেরকে বলে উঠেছি, তারা বিশ্ব মানবতার শির উঁচু করেছে। তার আচঁল দর্শনের রত্ন ও মুক্তায় ভরে দিয়েছে। কিন্তু গোঁড়ামী ও পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে একটু ভেবে দেখুন, তাদের পক্ষে কি এ দাবী করা সম্ভব এবং বাস্তবিকই কি তারা বলতে পারবে যে, তারা বিশ্ব মানবতার জন্য রহমত ও কল্যাণ বলে সাব্যস্ত হয়েছে? আমার প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্ব মানবতা তাদের থেকে কী পেয়েছে? তাদের কি তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছে? তারা মানবতার কোন্ ব্যথা-যখমের চিকিৎসা বা উপশম করেছে? গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে আমাদেরকে হতাশ হতে হয়। আপনি দর্শনশাস্ত্র সামান্য পাঠ করুন এবং দার্শনিক জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন। সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, দর্শন জীবন সমুদ্রে নিছক এক দ্বীপ ছিল। একটি সংরক্ষিত স্থান ছিল। একটি সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডল ছিল। এই দার্শনিকগণ তাদের সমস্ত মেধাশক্তি এবং আল্লাহ প্রদত্ত যোগ্যতা এই সীমাবদ্ধ পরিমণ্ডল বা বৃত্তে ব্যয় করেছে। মানবতার অনিবার্য ব্যাপারগুলো, যেগুলোকে মুহূর্তের জন্যও উপেক্ষা করা অসম্ভব এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমাধার দাবীদার, যেগুলো ছাড়া মানবতার গাড়ী এক কদমও সামনে অগ্রসর হতে পারে না। সেসব দার্শনিকগণ এসব ব্যাপারে না কর্ণপাত করেছেন, না আলোচনা করেছেন আর না মানবতা এসব বিষয়ে কোনও সাহায্য করেছেন। তারা তাদের

জ্ঞানগত বা দার্শনিক দ্বীপে নিরাপদ জীবন যাপন ও সুখ নিদ্রায় বিভোর ছিলেন। কিন্তু মানুষ তো ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীনে আবদ্ধ ছিল না। যে ইউনানে দর্শনের রমরমা অবস্থা ছিল, সেখানেও আমভাবে সকলেই দার্শনিক বা দর্শনপ্রিয় ছিল না। এসব দার্শনিকগণ তো গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন, জ্যোতির্বিদ্যার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়েছেন। কিন্তু মানব জীবনের জন্য কী দিকনির্দেশনা দিয়েছেন? জ্ঞানী মহল ছাড়া অন্য শ্রেণীগুলোকে কী পথ দেখিয়েছেন? তারা বিভ্রান্ত-বিপথগামী মানবতাকে এবং মৃতপ্রায় জীবনের জন্য কী করেছেন? বরং এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকেও জীবন সম্পর্কে তারা ছিলেন উদাসীন। তারা নিজেদের পাশে জ্ঞান-প্রজ্ঞার এমনই সীমাবদ্ধতা তৈরী করেছিলেন এবং নিছক কয়েকটি জ্ঞানগত বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ। আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। হয়ত আপনারা এ উদাহরণের মাধ্যমে দর্শনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবেন। লক্ষ্য করুন, আমাদের দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাস আছে। কোথাও আমেরিকার দূতাবাস, কোথাও রুশী দূতাবাস, কোথাও মিসরের, কোথাও ইরানের দূতাবাস রয়েছে। এসব দূতাবাসের ভিতরে নানা রকম জীবন যাত্রা চলছে। সেখানে বহু শিক্ষিত লোকজন আছেন। বড় বড় জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ রাজনীতিবিদও আছেন। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্প্রীতি এবং অন্তর্কলহের সাথেও তাদের কোনও সম্পৃক্ততা নেই। এ দেশের দৈন্যতা-দরিদ্রতা, ধনাঢ্যতা-উন্নয়ন, চারিত্রিক উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে তাদের কোন কথা নেই। তাদের একটি নির্দিষ্ট ও বিশেষ কাজ। আর তারা কেবল সে কাজই আঞ্জাম দেন। বিধায় তারা এদেশে থেকেও এমন যেন তারা এখানে নেই। ব্যাস, ঠিক অদ্রুপ দর্শন নিছক একটি বহির্দেশীয় দূতাবাসের মত প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর সেসব দার্শনিকগণ ঐ দূতাবাসের চার দেওয়ালের অভ্যন্তরে জ্ঞান-দর্শনের প্রদর্শনী করত। জীবনের বাস্তব চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে ছিল উদাসীন-বেখবর।

দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখছি কবি-সাহিত্যিকদের একটি দল। আমাদের তো সাহিত্য ও কাব্যিকতার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে। আমি সাহিত্য ও কবিতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি না। কিন্তু বেয়াদবী ক্ষমা করবেন। কবি-সাহিত্যিকগণ আদৌ মানবতার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করেননি। তাদের ক্ষতস্থানে মলম বা পট্টি লাগাননি। তারা যথারীতি আমাদের আনন্দ-বিনোদনের খোরাক যুগিয়েছেন। আমাদের ভাষা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু মানবতার সংশোধনের মাথাব্যথা আমলে নেননি। আর না এটি তাদের সাধ্যের ভিতরে ছিল। জীবন সজ্জিত হত আবার বিকৃত হত। মানবতা অধঃপতিত হত আবার সামলে

উঠত। আর এরা তাদের মিষ্টি মিষ্টি কথা শোনাত। উদাহরণতঃ মনে করুন! মানুষ নিজ নিজ বিপদ-আপদে আক্রান্ত। কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলছে। কোথাও মারদাঙ্গা হচ্ছে, কোথাও জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন সামনে এসেছে, কোথাও জীবন-মরণের ব্যাপার আর কেউ বাঁশিওয়ালা, বড় সুমধুর কণ্ঠে বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। আপনি মুহূর্তকালের জন্য এই মিষ্টি বাঁশির সুরে আনন্দে অভিভূত হতে পারেন। আপনি তার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারেন। কিন্তু আপনি এই সুমিষ্ট সুরে জীবনের প্রয়োজন তো পূরণ করতে পারেন না কিংবা জীবনের সমস্যাবলীও সমাধান করতে পারেন না। আর না পারেন এর থেকে কোনও শুভবার্তা লাভ করতে। কাব্য-কবিতা ও সাহিত্য আমাদের জীবনের জন্য কত না জরুরী উপাদান! এর মাধ্যমে আমাদের আত্মচেতনা, প্রাণের সতেজতা এবং মন-মস্তিষ্ক যতই সজীবতা লাভ করুক তথাপি তা আমাদের সমস্যা সমাধান এবং আমাদের ব্যথার উপশম তো নয়। তাছাড়া এসব কবি-সাহিত্যিকদের জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। তারা বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টাও চালাতেন না। সেজন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করাও তাদের সাধ্যে ছিল না। আর সংস্কার ও বিপ্লব তাদের ছাড়া হত না।

তৃতীয় আরেকটি দল আমরা দেখতে পাই, যারা হালেন দিগ্বিজয়ীগণ। তারা বিভিন্ন দেশ জয় করেছেন। নিজের তরবারীর জোরে বহু জাতিকে পদানত করেছেন। আমরা এই গোষ্ঠীর দ্বারাও বিরাটভাবে প্রভাবিত। তাদের তরবারীর ঝনঝনানী আজ পর্যন্ত আমাদের কানে বাজে। তাদের হৈ চৈ, ঢাকঢোলে বাহ্যতঃ মনে হয়, তারা বিশ্ব মানবতার বড় উপকার ও সেবা করেছেন। কিন্তু তাদের নামের সাথে কোন ইতিহাস সম্পৃক্ত? কি ন্যায়-ইনসাফের? নাকি জীবন-মরণের? বাদশাহ সিকান্দারের নাম এলে তার নিষ্ঠুরতার উপাখ্যান সতেজ হয়ে যায়। সে কি মানবতার হিতৈষী-হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল? সে ইউনান থেকে হিন্দুস্তান পর্যন্ত গোটা অঞ্চলকে উলট-পালট করে দিয়েছিল। দেশের পর দেশ তার কারণে শান্তি-নিরাপত্তা ও জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গিয়েছিল। তার পতনের পরও এসব দেশ শত শত বছর পর্যন্ত ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। একই অবস্থা সিজার, চেঙ্গিস খান এবং অন্যান্য বড় বড় দিগ্বিজয়ীদের। বিজয়ী স্বরাষ্ট্রের হিতাকাঙ্ক্ষী হোন কিংবা স্বজাতির জন্য রহমতই হোন, কিন্তু অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের জন্য বিরাট বড় আযাব এবং মহাবিপদ।

চতুর্থ সেসব লোকের আরেকটি দল দৃষ্টিগোচর হয়, যারা দেশকে স্বাধীনকারী এবং জাতির নেতা। এ গোষ্ঠীর নাম আসলে শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আমাদের মাথা নুইয়ে আসে। বাস্তবেই তারা স্বদেশের জন্য অনেক বড় কাজ করেছেন। কিন্তু তারা এদেশের বাইরে বসবাসকারীদের জন্য কী করেছেন? আপনারা আব্রাহাম লিংকনের নাম অবশ্যই শুনেছেন। তিনি আধুনিক

আমেরিকার রূপকার। কিন্তু ভারত উপমহাদেশ, মিসর, ইরাক এবং এ ধরনের অন্যান্য রাষ্ট্র তার দ্বারা কী কল্যাণ লাভ করেছে? ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি এক সাম্রাজ্যবাদ পরাশক্তির জন্ম দিয়েছেন। পৃথিবীর গোলামীর জিঞ্জিরে আরেকটি কড়া বৃদ্ধি করেছেন। সা'দ জগলুল কে ছিলেন? মিশরের ত্রাণকর্তা এবং সেখানকার স্বাধীনতা আন্দোলনের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন। কিন্তু মিশরের বাইরে তিনি কী করেছেন? আর আমাদের উপর তার কী অনুগ্রহ দান আছে? বস্তুতঃ এই সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রপূজাই তো অন্যান্য দেশ ও জাতির জন্য মহাবিপদ। কেননা এর ভিত্তিই হচ্ছে, স্বজাতির উন্নতি-শ্রেষ্ঠত্ব আর অন্যান্য জাতিগুলোর তুচ্ছজ্ঞানের ওপর। প্রায়ই একে স্বজাতির সমুন্নতি ও শক্তি সৃষ্টির জন্য অন্যান্য জাতিগুলোকে গোলাম বানাতে হয়।

পঞ্চম একটি দল, যাকে বিজ্ঞানী বলা হয়, যারা নতুন নতুন কত কী আবিস্কার করেছেন। প্রচুর উপকারী জিনিস তৈরী করেছেন। নিঃসন্দেহে এ শ্রেণীর লোকেরা মানবজাতির অনেক বড় খেদমত করেছেন। আমাদের কাজে নিয়োজিত এসব আবিষ্কার যেমন- উড়োজাহাজ, রেল, রেডিও ইত্যাদি সেসব বিজ্ঞানীদের অনুগ্রহের দান। এর জন্য তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এতে কোন সংশয় নেই যে, এসব আবিষ্কার মানুষের অনেক কাজে আসছে। কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে, শুধু এসব আবিষ্কারই যথেষ্ট নয়। এসব আবিষ্কারের সাথে যদি সৎ নিয়ত না থাকে, ধৈর্য ও শৃঙ্খলা না থাকে, মানব সেবার আকাঙ্ক্ষা না থাকে, এসবের দ্বারা যদি মানুষের প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা না হয়– তাহলে বলুন, এসব আবিষ্কার মানুষের জন্য কল্যাণকর-রহমত নাকি চরম ক্ষতিকর-গযব? তারা তো এসব আবিষ্কার মানব জাতিকে উপহার দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এগুলোকে ব্যবহারে সঠিক প্রেরণা দেননি। এমন মন-মানসিকতা তারা তৈরী করেননি, যা এগুলো দ্বারা উপকৃত হবে। এগুলোর তথ্যানুসন্ধান করবে। এগুলো বিপথে ব্যবহার করা থেকে বেঁচে থাকবে। বিগত দু'টি বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও আল্লাহভীতিমুক্ত এসব আবিষ্কার এবং এসব উপকরণ বিশ্ব মানবতার জন্য চরম বিপদজনক ও আযাবের কারণ; শান্তি ও রহমত নয়। আমি সেসব বিজ্ঞানীদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করছি না। কিন্তু আমি একথা অবশ্যই বলব যে, এসব আবিষ্কারের প্রকৃত সফলতা সৎ উদ্দেশ্য, চারিত্রিক শক্তি এবং মানসিক ভারসাম্যতা ব্যতিত পূর্ণাঙ্গ নয়, অসম্পূর্ণ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানব হৃদয়ে সদিচ্ছা, ভাল কাজের আগ্রহ না থাকবে এবং স্বয়ং নিজের মধ্যে ভাল কাজ করার তৃষ্ণা ও স্পন্দন জাগ্রত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে আসবাব-উপকরণ, সময়-সুযোগ এবং সহজতা ভাল-কল্যাণকর বানাতে

পারে না। মনে করুন! আমার কাছে দেওয়ার মত টাকাও আছে আবার নেওয়ার জন্য অনেক অভাবী লোকজনও আছ। কেউ আমার হাত ধরে না। কিন্তু আমার ভিতর অনুগ্রহ ও দানশীলতার প্রেরণা এবং সাহায্য দানের ইচ্ছা নেই। তাহলে কে আমাকে দানের জন্য অনুরাগী করতে পারে?

এরপর আরেকটি শ্রেণী আমাদের চোখে পড়ে। এটি হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরামের সুমহান জামাত। এ জামাতের সদস্যগণ আবিষ্কার-উদ্ভাবনের দাবী করেন না। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শিতার দাবীও করেন না। তারা সাহিত্য-কাব্যিকতায় উচ্ছসিত হোন না। আর না তারা নিজের বেলায় অতিরঞ্জনের সাথে কাজ করেন। না অহেতুক বিনয়-নম্রতা প্রকাশ করেন। তারা খুবই স্বচ্ছতা, স্পষ্টতা ও সাধাসিধেভাবে বলেন, তারা দুনিয়াকে তিনটি জিনিস দান করেন। ১. সঠিক ইলম-জ্ঞান, ২. ইলম-জ্ঞানের উপর আস্থা-বিশ্বাস, ৩. সে ইলম অনুযায়ী আমল করা এবং সে বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন গঠনের আগ্রহ-ইচ্ছা। আর এটিই হচ্ছে হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) -এর পর্যন্ত আগত আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষার সারনির্যাস।

এখন আমি বলতে চাই, সেই সঠিক জ্ঞান কী, যা নবীগণ মানবজাতিকে দিয়ে থাকেন। সেই জ্ঞান হল, দুনিয়া কে সৃষ্টি করেছেন। আর কেন সৃষ্টি করেছেন? নবীগণ বলেন, সর্বপ্রথম জানতে হবে, আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন এবং কেন সৃষ্টি করেছেন? তা জানার আগ পর্যন্ত আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ ভুল পথে অগ্রসর হবে। এই দুনিয়ার কোন জিনিস দ্বারা আমাদের উপকৃত হওয়ার অধিকার নেই। কারণ, এ জীবনে যা কিছু হচ্ছে, চলাফেরা, উঠাবসা, পানাহার– সবই ঐ মহান এককের ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই বিশ্ব চরাচরের কেন্দ্রস্থলের অবগতি লাভ না করব এবং আমরা তার মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম না হব, ততক্ষণ পর্যন্ত তার অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়ার কী অধিকার আছে আমাদের? এছাড়া তো শুকনো রুটির একটি টুকরা ছেড়াও আমাদের জন্য হারাম। আমরাও এই বিশ্বজগতের একটি ক্ষুদ্র অংশ। আর আমরা যে শস্য দানা ব্যবহার করি, তাও এই সমষ্টির এক তুচ্ছতর খণ্ড এবং অতিক্ষুদ্র অনুকণা বরং আমরা যে গ্রহে (পৃথিবী) বাস করছি, তা-ও এই বিশ্ব জগতের নগণ্য এক অংশমাত্র। আমাদের এই মাটির পৃথিবীর ঐ আসমানী ব্যবস্থাপনার কী গুরুত্ব বা মর্যাদা আছে? আপনি জানতে পারেন, এই পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে কিংবা অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝে আপনার কী সম্পর্ক আছে, তাহলে আপনার নিজের অস্তিত্ব নিয়েও লজ্জাবোধ হবে এবং আপনার বিশাল বসতঘর নিয়েও। আপনার এবং এই বিশাল জগতের অন্যান্য অংশগুলোর মধ্যে কে সম্পর্ক তৈরী করে দিলেন? একমাত্র ঐ জগৎস্রষ্টা এবং ঐ মৌলিক উদ্দেশ্য! আপনি যদি বিশ্বজগতের ঐ মহান স্রষ্টাকে না চেনেন

কিংবা না মানেন এবং এই মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম না হোন, তাহলে এ বিশ্বজগতের কোন অনুকণা কিংবা অন্য কোনও জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়ার কী অধিকার আছে আপনার?

আমি জানতে চাই, রুটির যে টুকরাটি আপনি হাতে নিলেন, সেটি যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, আমি তো আমার স্রষ্টাকে চিনে নিয়েছি এবং তার নির্দেশমাফিক আমার সেবা পাওয়ার যোগ্য মানুষের জন্য আমি নিজেকে কুরবান করে দিয়েছি। কিন্তু হে মানুষ! তুমি না তোমার স্রষ্টাকে চিনেছ আর না ইবাদত-বন্দেগী করেছ। আমার দ্বারা উপকৃত হওয়ার কিংবা আমাকে ভক্ষণ করার কী অধিকার আছে তোমার? তাহলে আপনি কী জবাব দেবেন? অনুরূপভাবে এই বিশ্বজগতের যে কোন জিনিস ব্যবহার করা ভুল, যাবৎ না জেনে নেবেন– তার সৃষ্টিকারী কে এবং তার উদ্দেশ্য কী? কিন্তু এ কী বিস্ময়কর ট্রাজেডী যে, আজ পৃথিবীতে সব কাজ ধুমছে চলছে। বাজারে আনন্দ-উল্লাস হচ্ছে। সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে। যানবাহন চলছে। বড় বড় কাজ হচ্ছে। কিন্তু কারও একথা উপলব্ধির সুযোগ হয় না– যে দুনিয়ায় এসব কিছু হচ্ছে, তার স্রষ্টা কে? এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? যখন নবী করীম পৃথিবীর শুভাগমন করেছেন, তখন মানবতার গাড়ী উদ্দেশ্যহীন দিগভ্রান্ত হয়ে চলেছিল। পৃথিবীর দার্শনিক, জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক, দিগ্বিজয়ী, শাসক, কৃষক ও বণিক-ব্যবসায়ীগণ নিজের কাজ করে সুযোগ পেতেন না। শাসক ছিলেন, প্রজাও ছিল। জালিম-অত্যাচারীও ছিল, মজলুম-নিপীড়িতও ছিল। কিন্তু সকলেই আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে উদাসীন এবং স্বীয় সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অজ্ঞ-বেখবর। এই ছোট ছোট খর্বকায় মানুষের মাঝে একজন বিশাল আকৃতির মানুষ আসত। আর যেসব লোকের হাতে মানবতার লাগাম ছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করত, বলো তোমরা মানুষের উপর এ কেমন জুলুম করলে? তাদেরকে আপন মালিক এবং এই বিশ্ব জগতের বাদশা থেকে দূরে সরিয়ে নিজের গোলামে পরিণত করেছ? তোমাদের কী অধিকার আছে যে, এই নাবালক মানবতার হাত ধরে নিয়ে তোমরা তাদেরকে বিপথে অন্ধকার গলিতে নিক্ষেপ করেছ। হে জালিম চালক, তুমি যাত্রীদের কাছে জিজ্ঞাসা করা ছাড়াই জীবনের গাড়ী কোন্ দিকে চালাতে শুরু করেছ? সে জীবনের মনের সৈকতে দাঁড়িয়ে মানবতাকে প্রশ্ন করে আর তাকে ডেকে যায়। তার প্রশ্নকে উপেক্ষা করা যায় না। তার ডাকে এবং তার আহবানে মানবতা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল তার কথা মান্য করে আরেক দল অস্বীকার করে। দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীকে এ দু'টি পথের কোনও একটি গ্রহণ করতে হয়।

নবীগণ কখনও বলেননি, আমরা মহান কুদরতের বিস্ময়কর রহস্য উন্মোচনের জন্য এসেছি। আমরা স্বভাবগত শক্তিগুলোকে যাদুময় করার জন্য এসেছি। আমরা নতুন কিছু আবিস্কার করব কিংবা উপহার দেব। তারা

ভূগোল, ধাতব পদার্থ, ও প্রত্নতত্ত্বে ব্যুৎপত্তির দাবী করেন না। তারা বলেন, আমরা এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা এবং তার সত্ত্বা ও গুণাবলির সঠিক জ্ঞান দান করি, যা আমাদেরকে এই জগৎস্রষ্টা ও মালিক এবং মানব সৃষ্টিকারী দান করেছেন। আজ তা আমাদের মাধ্যমেই অন্যরা পেতে পারে।

তারা বলেন, এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা একজন। তারই ইচ্ছা হেকমত ও কৌশলে এ দুনিয়া চলছে। তিনি কারও অংশিদারীত্ব ছাড়াই এ দুনিয়া পরিচালনা করছেন। এই দুনিয়া অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি। আর না উদ্দেশ্যহীন চলছে। এ জীবনের পরে আরেকটি জীবন আছে। যেখানে এই প্রথম জীবনের হিসাব দিতে হবে। সেখানে নেক আমল ও সৎকাজের প্রতিদান পাওয়া যাবে। বদ আমল ও মন্দচারিতার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আইনকানুন আনয়নকারী এবং আল্লাহর ইচ্ছার বিবরণদাতা নবী রাসূলগণ, যারা প্রত্যেক দেশ ও জাতির কাছে আসেন এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করেন। তাদের বাদ দিয়ে আল্লাহর পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সকল নবী-রাসূল এ ব্যাপারে একমত। এতে কারও মতবিরোধ নেই। দার্শনিক-হেকিমদের মাঝে কঠিন মতানৈক্য আছে। তাদের দু'জনও কোন একটি ব্যাপারে একমত হতে পারেন না। কিন্তু এখানে কোনও একটি ব্যাপারে দু'জন নবীর মতবিরোধ নেই।

অবশ্য জ্ঞানের জন্য বিশ্বাস জরুরী নয়। আজ আমাদের জ্ঞান এবং জ্ঞাত বিষয় কত বেশি! কিন্তু আমাদের বিশ্বাস কত ঠুনকো! কত স্বল্প! জ্ঞান সবসময় দৃঢ় বিশ্বাসের জন্ম দেয় না। প্রাচীন দার্শনিকদের অনেকেই বিশ্বাস থেকে বঞ্চিত ছিল। আর সংশয় রোগ আজও তাদের ইলমে ইয়াকীন (নিশ্চিত জ্ঞান) সৃষ্টির পরিবর্তে আরও ঘোরতর সংশয় সৃষ্টি করে। আজও বড় বড় বিদ্বান ব্যক্তি ইলমে ইয়াকীনকে ভয় করে। নবী রাসূলগণ কেবল সঠিক জ্ঞানই দিতেন না। তার উপর ইয়াকীন এবং দৃঢ় বিশ্বাসও জন্মাতেন। জ্ঞান অনেক বড় ধন। কিন্তু তার উপর অগাধ বিশ্বাস তার চেয়েও বড় ধন। ইয়াকীনমুক্ত জ্ঞান মুখের ব্যায়াম, মেধার স্বাচ্ছন্দ এবং মনের কপটতা মাত্র। নবী রাসূলগণ তাদের অনুগত ও বাধ্যগত লোকদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। দিয়েছেন সুদৃঢ় বিশ্বাস। তারা যা কিছু জেনেছেন, তা পালন করেছেন। এরপর সে জন্য তারা নিজেদেরকে কুরবান করে দিয়েছেন। তাদের মেধা-মনন এই জ্ঞানে আলোকিত। অন্তর এই ইয়াকীনে শক্তিশালী হয়েছে। তাদের ঈমান-ইয়াকীনের বহু ঘটনা ইতিহাসের পাতায় লিখা আছে। পড়ে নিন। তাদের সেই অগাধ বিশ্বাসের সুফল আপনার আশপাশের পৃথিবীতে দেখে নিন। আজ যদি সেই ঈমান-ইয়াকীন থাকত তবে চরিত্রহীনতা ও অপকর্ম কেন হচ্ছে? শোষণ-তোষণ কেন ব্যাপক হয়ে যাচ্ছে? কেন সুদ ঘুষের বাজার গরম? এসব কি অনাচার জ্ঞান না থাকার কুফল? মানুষ

কি জানে না, চুরি করা অপরাধ? ঘুষ হারাম? পকেটমারা দুশ্চরিত্রের কাজ? –একথা কে বলতে পারে? আমরা তো দেখছি, যেখানে জ্ঞান বেশি সেখানে অনাচার-অপকর্মও বেশি। যে ব্যক্তি সুদ-ঘুষের ক্ষতির উপর গ্রন্থ রচনা করতে পারেন এবং এর ইতিহাস সংকলন করতে পারেন, তিনি বেশি ঘুষ নেন। যে চুরির ক্ষতি এবং এর চরম পরিণতি সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত সে-ই চুরি বেশি করে। পকেটমারকে দেখুন। তাদের অনেনকেই এমন পাবেন, যারা বহুবার পকেটমারার অভিযোগে সাজা ভোগ করেছে। তাদের চেয়ে বেশি অপর কেউ কিভাবে পকেটমারার সাজা ও পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে? যদি জ্ঞানই যথেষ্ট হত, তাহলে চুরির সাজা ভোগ করার পর চুরি বন্ধ হয়ে যেত। একবার অপরাধ করে সাজা ভোগ করার পর কেউ দ্বিতীয়বার অপরাধ করত না। কিন্তু এমনটি হচ্ছে না। বুঝা গেল, নিছক জ্ঞানই যথেষ্ট নয়।

এরপর জরুরী জ্ঞান এবং জরুরী বিশ্বাস আছে ঠিক কিন্তু এর উপর আমল করার ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষাও সৃষ্টি হবে– সে নিশ্চয়তা কে দেবে? অনেক লোক জানেন। নিশ্চিত বিশ্বাসও আছে তার। সে জানে, মদ খারাপ বস্তু। এর ক্ষতির অভিজ্ঞতাও আছে। বিশ্বাসও আছে। তবুও সে মদপান করে। আপনার শহরে অনেক ডাক্তার-কবিরাজ থাকতে পারে। যারা এ থেকে বেছে চলে না, তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, বেছে না চলা মারাত্মক ক্ষতিকর। তবু তারা বেছে চলে না। কারণ, তাদের আমলের ইচ্ছে হয় না। তাদের মধ্যে বেছে চলার আগ্রহ এবং বেছে না চলার প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয় না বরং বদ অভ্যাস ও না বেছে চলার আগ্রহ জাগে। আর তারা সে বদ অভ্যাস এবং বাজে আগ্রহ দমন করতে পারে না। নবী রাসূলগণ ইলম ও ইয়াকীনের সাথে এই তৃতীয় শক্তিও দান করেন। অর্থাৎ স্বীয় জ্ঞান ও বিশ্বাসের উপর আমল করার আগ্রহ এবং নিজের ভুল মনোবাসনা মোকাবেলা করার শক্তি। ফলশ্রুতিতে মানুষ তার ইলম ও ইয়াকীন দ্বারা পরিপূর্ণ উপকৃত হয়। সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে। তাদের মন-মানস তাদের সতর্ক পাহারাদারি করে। ভুল কাজ করার সময় তাদের হাত ধরে ফেলে।

প্রত্যেক নবী রাসূল এ তিনটি ধন-রত্ন নিজ নিজ যুগের লোক এবং আপন উম্মতকে দান করেছেন। তাদের উসীলায় লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন সুশৃঙ্খল হয়ে গেছে। জীবনের গতি যথাস্থানে এসে গেছে। মানবতার উপর প্রকৃতদান সেসব নবী রাসূলগণের। আল্লাহ পাকের শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক তাদের ওপর। তারা মানবতার পাহারাদারি করেছেন এবং যথাসময়ে তাদেরকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন।

কিন্তু দিন দিন এই ধর্ম দুনিয়া থেকে বিলীন হতে থাকে। সঠিক জ্ঞান হারিয়ে যায়। ইয়াকীন ও বিশ্বাসের প্রদীপ নিভে যায়। নেক কাজের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা মরে যায়। ষষ্ঠ খৃস্ট শতকে এসে এই ত্রিরত্ন এত দুলর্ভ হয়ে গেল যে,

এগুলো খুঁজে পাওয়া দুষ্কর ছিল। গোটা দেশ এবং একেক মহাদেশ খুঁজেও একজন আল্লাহর বান্দা পাওয়া যেত না, যিনি সঠিক জ্ঞান ও ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান বা ধনবান হবেন। নবী রাসূলগণের আনীত শাশ্বত ধর্ম এবং তাদের প্রচারিত ঈমান-ইয়াকীন সংকীর্ণ হতে হতে এক বিন্দুতে এসে পৌঁছেছিল। সংশয় ও বদ আমলীর অন্ধকারে ইলম ও ইয়াকীনে এই আলোকরশ্মি কোথাও কোথাও এমনভাবে মিটিমিটি জ্বলত, যেমন বর্ষার আঁধার রাতে জোনাকী জ্বলে। ঈমানদার বিশ্বাসী লোকের এতই অভাব ছিল যে, ইরানের এক তরুণ সালমান ফারসী (রা) ঈমান-ইয়াকীন এবং সৎকাজের সন্ধানে বের হলেন। এরপর তিনি ইরান থেকে সিরিয়া এবং সেখান থেকে হিজাজ এসে পৌঁছেন। এই তিন রাষ্ট্রে তিনি মাত্র চারজন ঈমানদার বিশ্বাসী মানুষ পেয়েছেন।

এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার এবং বিশ্বময় বিস্তৃত আঁধারে আল্লাহ তাআলার শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) শুভাগমন করলেন। তিনি এসে উপরিউক্ত তিনটি ধন এত ব্যাপক করে দিলেন যে, ইতোপূর্বে আর কখনও তা এত ব্যাপকতা লাভ করেনি। যে ধন-রত্ন ছিল কারও কারও বক্ষে ও নৌযানে, যা ঘর থেকে বের হয়ে মহল্লায় আর মহল্লা থেকে বের হয়ে শহরেও প্রসার লাভ করেনি। আজ তা ঘরে ঘরে আম হয়ে গেল। ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তে।

رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی
ہری ہوگئی ساری کھیتی خدا کی

না রহিল বঞ্চিত জলজ প্রাণী
কিংবা স্থলচারী কেউ
খোদার জমীন হইল সজীব
হরষে উঠিল ঢেউ।

তিনি নিছক এ তিনটি বাস্তবতার প্রেরণাই দিতেন না। তার বিউগলও ফুঁকে দিতেন। দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোনও কর্ণধারী এমন নেই, যে বলতে পারে– সে এই বিউগলের সুর শুনতে পায়নি। আর যে শোনেনি, তা তার কানেরই অক্ষমতা। তার ঘোষণার অক্ষমতা নয়। আজ পৃথিবীর কোন প্রান্তে কালেমায়ে শাহাদাত أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ এবং أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ সুর শোনা যায় না! যখন পৃথিবীর সকল কোলাহল নিস্তব্ধ হয়ে যায়, যখন কর্মব্যস্ত শহরে মৃতপুরীর মত নীরবতা বিরাজ করে, গোটা এলাকা মৃতের মত গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়, যখন মুখগুলোতে তালা লেগে যায়, তখন কানে একই সুর তরঙ্গ ও আহ্বান আসে– "আল্লাহ তাআলা ব্যতিত কোনও উপাস্য নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ পাকের প্রেরিত পয়গাম্বর।"

আজ রেডিওয়ের মাধ্যমে পৃথিবীর কোণায় কোণায় আওয়াজ পৌঁছে। ঘরে ঘরে পয়গাম পৌঁছে যায়। কিন্তু কোন বেতার মাধ্যম বা রেডিও স্টেশন, তা আমেরিকার হোক চাই বৃটেনের হোক– কোনও বাস্তবতাকে, কোনও ইলম ও জ্ঞানকে এভাবে বিশ্বব্যাপী আম করেছে কি, যেভাবে এই ইলম ব্যাপকতা পেয়েছে, যার আহবান জানিয়েছেন আরবের উম্মী নবী সাফা পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠে?

মানুষ কখনও আবেগ-আপ্লুত হয়, উদ্বেলিত হয়। শিশুসুলভ নিষ্পাপতার সাথে তার মনিবকে কিছু বলতে শুরু করে। এমনই এক আবেগ-উৎকণ্ঠায় মানবতার পক্ষ থেকে স্বীয় প্রভুর দরবারে আরয করেছিলেন,

ترا خرابہ فرشتے نہ کرسکے آباد

তোমার বিরান ভূমি ফিরিশতাগণ
আবাদ করতে পারবে না।

আজ যদি মুহাম্মাদ (সা) এর নগণ্য গোলাম আবেদন করে, তাহলে কি অযথা হবে যে, হে আল্লাহ তোমার খোদায়ী ও প্রভুত্ব নিঃসন্দেহে সত্য। তুমি মুহাম্মাদ (সা) এর সৃষ্টিকর্তা। এই গোটা বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা, প্রভু, মালিক এবং প্রত্যেক জিনিসের উপর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু তোমার বান্দা ও সৃষ্টিকূলের কেউ কি তোমার নাম এমনভাবে প্রচার-প্রসার করেছে, পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছিয়েছে, যেভাবে তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদ (সা) করেছেন? এটা কোনও বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্য নয়। এখানেও সেই আল্লাহ তা'আলারই প্রশংসা হচ্ছে, যিনি মুহাম্মাদ (সা) -এর মত পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন। তাকে স্বীয় নাম এবং দীন-ধর্ম সমুজ্জ্বল করার এই শক্তি ও তাওফীক দান করেছেন।

রাসূলে কারীম (সা) যখন বদর প্রান্তরে তাঁর চৌদ্দ-পনের বছরের কামাই আল্লাহর দীনের সাহায্যে সামনে রেখে দিলেন এবং ৩১৩ জন সাহাবীকে এক হাজার সশস্ত্র কাফিরের মোকাবেলায় এনে দাঁড় করালেন, তখনও মাটিতে মাথা রেখে এ কথাই স্বীয় প্রতিপালককে বলছিলেন– "হে আল্লাহ! আপনি যদি এই মুষ্টিমেয় লোকের দলটিকে আজ ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার ইবাদত হতে পারবে না।"

রাসূলুল্লাহ (সা) তাওহীদ ও একত্ববাদের আওয়াজ তুলেছিলেন, এর দ্বারা দুনিয়ার কোন ধর্ম, কোন দর্শন এবং কোনও মন-মগজ প্রভাবিত না হয়ে পারেনি। যেদিন থেকে দুনিয়া শুনেছে, মানুষের জন্য একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত দ্বিতীয় কারও সামনে মাথা নত করা চরম অপমান ও লাঞ্ছনাকর। আল্লাহ তাআলা আদম আ. -এর সম্মুখে ফিরিশতাকূলকে এজন্য নতশির করিয়েছেন,

যাতে সব ধরনের সিজদা তার সন্তানের জন্য হারাম হয়ে যায়। যেন সে বুঝে নেয়, যখন কুদরতের এই কারখানার কার্যনির্বাহী ফিরিশতাকূলকে আমাদের সামনে নতশির করে দেওয়া হয়েছে, তখন আমাদের জন্য এ দুনিয়ার কোনও বস্তুর সামনে মস্তকাবনত হওয়া বা কপাল ঠুকা শোভা পায়? যখন থেকে পৃথিবী এই বাস্তবতা এবং মানুষ তার এই মর্যাদার কথা শুনেছে, তখন থেকে শিরক-অংশীদারীত্ববাদ স্বয়ং নিজের চোখে অপদস্ত হয়ে গেছে। তাকে হীনমন্যতা ঘিরে ধরেছে। মুহাম্মাদ (সা) কে প্রেরণের পর আপনারা তার কণ্ঠস্বরে পার্থক্য দেখতে পাবেন। আজ সে তার কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট নয়। সে এর অলীক বিশ্লেষণ ও দার্শনিক ব্যাখ্যা বের করে। এতে প্রতীয়মান হয়, তাওহীদের বাণী, একত্ববাদের আহ্বান মনে স্থান করে নিয়েছে।

অধিকন্তু মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা) এই ইলম ও ইয়াকীনের সাথে সেই মহান শক্তি সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন, যাতে রয়েছে শত সহস্র পুলিশ, অসংখ্য আদালত এবং বিশোর্ধ্ব প্রশাসন ও রাষ্ট্র সরকার অপেক্ষা অধিক শক্তি। অর্থাৎ মনের শক্তি, নেককাজের আগ্রহ, গুনাহ ও পাপাচারের প্রতি ঘৃণা এবং নফসের স্বয়ং হিসাব প্রস্তুতি।

এ শক্তির এমনই যাদু ছিল যে, একজন সাহাবী, যার দ্বারা মারাত্মক একটি গুনাহ হয়ে গিয়েছিল, তিনি অস্থির হয়ে গেলেন। মন তাড়া করে ফিরছে। ভর্ৎসনা করছে। তিনি নবীজীর খেদমতে চলে এলেন। আরয করলেন, হুজুর! আমাকে পবিত্র করে দিন। নবীজী চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিলেন। তিনি সেদিকে এসে দাঁড়ালেন। নবীজী অপরদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি সেদিকে এসে দাঁড়ালেন। অনন্তর নবী তদন্ত করালেন, তার মস্তিষ্ক বিকৃত বা মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো? যখন জানা গেল, লোকটি সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্ক; তার মাথা খারাপ নয়, তখন নবীজী তাকে সাজা দিলেন। বলুন! কোন জিনিস তাকে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে আর কী-ই বা তাকে স্বেচ্ছায় টেনে এনেছে?

এবার আসুন! গামেদিয়া নামে অশিক্ষিত গ্রাম্য এক মহিলা ছিল। একবার সে মারাত্মক এক পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সে পাপ না কেউ দেখে ছিল আর না কেউ শুনেছিল। কিন্তু তার হৃদয় মানসপটে একটি সন্তাপ-যাতনা ছিল, যা তাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করতে দিত না। পানাহারে সে স্বাদ পেত না। সে খাবার খেতে বসলে তার মন বলত, তুমি অপবিত্র-নাপাক। পানি পান করতে গেলে মন বলত, তুমি নাপাক-অপবিত্র। তোমার কিসের পানাহার? তোমাকে প্রথমে পবিত্র হতে হবে। এ পাপের পবিত্রতা শাস্তি ছাড়া সম্ভব নয়। সে স্বয়ং এসে রাসূলে কারীম (সা) -এর দরবারে এসে হাজির হল। আবেদন করল, আমাকে পবিত্র করে দিন। এ নিয়ে পীড়াপীড়ি শুরু করল। কিন্তু নবীজী যখন

জানলেন, তার গর্ভে সন্তান রয়েছে, তিনি বললেন, এই বাচ্চার কী অপরাধ? তোমার সাথে কেন তার প্রাণ নাশ হবে? যখন সে ভূমিষ্ঠ হবে, তখন এসো।

লক্ষ্য করুন! নিশ্চয়ই এই বাচ্চা প্রসব করতে তার কিছু সময় লেগেছে। এর মধ্যে সে কি পানাহার করেনি? স্বয়ং জীবন কি তার কাছে কিছু দাবী করেনি? স্বয়ং পানাহারের স্বাদও কি বাঁচার আগ্রহ জাগ্রত করেনি? মন কি তাকে প্ররোচিত করেনি –এখন আর রাসূলুল্লাহ (সা) -এর কাছে যাওয়ার দরকার নেই। তার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করুক। কিন্তু আল্লাহর সে বান্দী দৃঢ়চিত্ত থাকে। কিছুদিন পর সে নবজাতক শিশু নিয়ে নবীজীর দরবারে চলে আসে এবং আরয করে, হুজুর! আমি সন্তান প্রসব থেকে অবসর হয়ে গেছি। এখন আমার পবিত্রতার কেন বিলম্ব হবে? নবীজী বললেন– না, না, এখন তাকে দুধ পান করাবে। যখন সে দুগ্ধপান ছেড়ে দিব, তখন এসো। নিশ্চয়ই আপনি জানেন, এখানে তার অবশ্যই দু'বছর সময় লেগেছে। এই দুই বছর কত বড় পরীক্ষা ছিল। না ছিল কোনও পুলিশ, না কোনও পাহারাদার, না কোন মুচলেকা, না জামানত। কত কল্পনা-জল্পনা তার মনে এসে ভীড় জমিয়েছিল। নবজাতক শিশুর নিষ্পাপ মুখখানা হয়ত তাকে বাঁচার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। হয়ত তার মুচকি হাসি জীবনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছে। শিশু তার অব্যক্ত নীরব ভাষায় হয়ত বলেছে, আম্মা! আমি তো তোমারই কোলে প্রতিপালিত হব। তোমারই হাতে হাত রেখে, আঙ্গুল ধরে চলব। কিন্তু তার মন বলত– না, তোমার মা নাপাক-অপবিত্র। তাকে আগে পবিত্র হতে হবে। ঐকান্তিক বিশ্বাস, সুদৃঢ় অবিচল ঈমান বলত, বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাছে যেতে হবে। সেখানকার শাস্তি বড় কঠিন। সে পুনরায় তৃতীয়বার এসে নবীজীর দরবারে হাজির হল। সাথে ঐ নিষ্পাপ শিশুটি। মুখে তার রুটির টুকরো। মহিলা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এ শিশু দুগ্ধপান ছেড়ে দিয়েছে। সে রুটি ইত্যাদি খাওয়ার যোগ্য হয়েছে। এখন আমার পবিত্রতায় কেন বিলম্ব হবে? অবশেষে আল্লাহর এই সত্যবাদী ও খাঁটি বান্দীকে সাজা দেওয়া হল। সেই সঙ্গে রাসূলে কারীম (সা) সুসংবাদ দিয়ে বলেন, এই মহিলা এমন খাঁটি তাওবা করেছে, তার একার তাওবা যদি গোটা মদীনাবাসীর উপর ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে। (রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা)। আমি জানতে চাই– কোন সে জিনিস, তাকে কোনরূপ হাতকড়া ও বেড়ি ছাড়া, কোনরূপ মুচলেকা ও জামানত ছাড়া, কোনও পুলিশ ও আইন প্রয়োগকারী বাহিনী ছাড়া তাকে নবীজীর দরবারে তৃতীয়বারও টেনে এনেছে এবং স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে শাস্তি গ্রহণের জন্য পীড়াপীড়ি করিয়েছে? আজ শত-সহস্র লেখাপড়া জানা শিক্ষিত, সুযোগ্য জ্ঞানী-গুণী নারী-পুরুষ আছে, যাদের জ্ঞান এবং ক্ষতির বিশ্বাস তাদেরকে ভুল কাজ ও বিপথগামিতা থেকে ফিরাতে পারে না। পারে না ভাল কাজের প্রতি আগ্রহী ও আকৃষ্ট করতে।

রাসূলে কারীম (সা) দুনিয়াকে এই তিনটি দুর্লভ মুক্তাই দিয়েছেন। সঠিক ইলম ও জ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ ইয়াকীন ও বিশ্বাস এবং নেক কাজের ঐকান্তিক বাসনা। দুনিয়া এর চেয়ে মূল্যবান রত্ন ও মূলধন পায়নি। আর না কেউ নবীজীর থেকে বেশি কিছু অনুগ্রহ দান করেছেন।

দুনিয়ার প্রতিটি মানুষের গর্ব করা উচিৎ যে, আমাদের মানব জাতির মাঝে এমন এক মহামানব জন্ম নিয়েছেন, যার মাধ্যমে মানবতার শির উঁচু এবং নাম উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি ধরাধামে না এলে দুনিয়ার চিত্র কেমন হত আর আমরা মানবতার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের জন্য কাকে পেশ করতাম? নবী মুহাম্মাদ (সা) সকল মানুষের জন্য রহমত। তিনি এ দুনিয়ার আলোকরশ্মি, মানব জাতির মাহাত্ম্য ও গৌরব। তিনি কোনও জাতির মালিকানাধীন নন। তার উপর কোনও রাষ্ট্রের ইজারাদারি নেই। তিনি সমগ্র মানবতার গৌরবের ধন। আজ কি কোন দেশের মানুষ গর্ব ও আনন্দে এ কথা বলে না যে, আমার অমুক জাতির সাথে সম্পর্ক আছে? আমি অমুক বংশের লোক, যে বংশে নবী মুহাম্মাদ (সা) এর মত পূর্ণাঙ্গ মানব জন্ম নিয়েছেন?

আজ মানব জাতির কোন শ্রেণী আছে, যার উপর নবী মুহাম্মাদ (সা) এর সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে অনুগ্রহ-দান নেই? পুরুষের উপর কি তাঁর দান নেই? তিনিই তাদেরকে পৌরুষ এবং মানবতার শিক্ষা দিয়েছেন। নারীদের উপর কি তার দান নেই? তিনি তাদের অধিকারের কথা বলেছেন। তাদের জন্য পথ নির্দেশনা ও উপদেশ দিয়েছেন, অসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "জান্নাত মায়ের পদতলে।" দুর্বল-অসহায়দের উপর কি তার দান নেই? তিনি তাদের সাহায্য করেছেন। বলেছেন, "মজলুমের বদদু'আকে ভয় কর। কারণ, তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনও পর্দা বা অন্তরায় নেই।" আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি ভগ্ন হৃদয়গুলোর অতি নিকটে।" ক্ষমতাধর, শক্তিশালী ও শাসকবর্গের উপর কি তাঁর দান নেই? তিনি তাদের অধিকার এবং দায়িত্ব-কর্তব্যের কথাও বলেছেন। আর সীমারেখা-দণ্ডবিধিও বলে দিয়েছেন। ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোকদেরকে সুসংবাদও শুনিয়েছেন– "ন্যায়পরায়ণ বাদশা-শাসক (কিয়ামতের দিন) আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে থাকবে।" ব্যবসায়ীদের উপরে কি তার দান নেই? তিনি ব্যবসার উপকারিতা, মর্যাদা এবং এ পেশার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং ব্যবসা করে এই পেশাজীবী লোকদের সম্মান বাড়িয়েছেন। তিনি কি বলেননি– "আমি এবং সত্যবাদী বিশ্বাসী আমানতদার ব্যবসায়ী জান্নাতে কাছাকাছি থাকব।" শ্রমিক-দিনমজুরদের উপরে কি তাঁর দান নেই? তিনি দীপ্ত কণ্ঠে জোর দিয়ে বলেছেন– "শ্রমিকের পারিশ্রমিক তার ঘাম শুকানোর পূর্বে দিয়ে দাও।" জীবজন্তুর উপরে পর্যন্ত কি তার দান নেই? তিনি বলেছেন- "প্রত্যেক সে প্রাণী,

যার প্রাণ আছে এবং যার মধ্যে অনুভূতি শক্তি ও জীবন আছে, তাকে আরাম দেওয়া ও পানাহার করানোও সদকা। যেমন বলেছেন– فى كل ذات كبد حرى صدقة গোটা মানব ভ্রাতৃত্বের উপরে কি তার দান নেই? তিনি রাতের আঁধারে জেগে জেগে সাক্ষ্য দিতেন, হে আল্লাহ! তোমার সকল বান্দা ভাই ভাই। انا شهيد ان الاعباد كلهم اخوة. সমগ্র বিশ্ব চরাচরের উপরে কি তার দান নেই? সর্বপ্রথম তাঁর মুখেই পৃথিবী শুনেছে, আল্লাহ তা'আলা কোনও এক দেশ-জাতি, বংশ-বর্ণ ও ভ্রাতৃত্বের নয়, গোটা সৃষ্টি জগত এবং পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা। যে পৃথিবীতে আর্যদের প্রভু, ইয়াহুদীদের প্রভু, মিশরীদের প্রভু, ইরানীদের প্রভু বলা হয়, সেখানে الحمد لله رب العالمين এর বাস্তব প্রকৃতির ঘোষণা হয়েছে এবং একে নামাযের অংশ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আপনার আমার এই পৃথিবীতে ডাক্তার-হাকিম, দার্শনিকও এসেছে। কবি-সাহিত্যিকও এসেছে। আরও এসেছে দিগ্বিজয়ী-সাম্রাজ্যবাদী, এসেছে রাজনৈতিক ও জাতীয় নেতা, নতুন নতুন আবিস্কারক, বিজ্ঞানও এসেছে। কিন্তু এদের কার আগমনে পৃথিবীতে সেই বসন্ত এসেছে, যা এসেছে নবী-রাসূলগণের শুভাগমনে। তারপর সর্বশেষ বসন্ত এসেছে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (সা) -এর শুভাগমনে। আর কে নিজের সঙ্গে করে সেই বসন্ত, সেই বরকত, সেই রহমত মানব জাতির জন্য, সেই অমূল্য ধন এবং বিশ্ব মানবতার জন্য সেই মহান নেয়ামত নিয়ে এসেছেন, যা নিয়ে এসেছিলেন মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সা)। আজ প্রায় সোয়া চৌদ্দশত বছরের মানব ইতিহাস পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে তাঁকেই সম্বোধন করে বলে–

سر سبز ہو جو ترا پائمال ہو
ٹھیرے تو جس شجر تلے وہ نہال ہو

"তব পদতলে পিষ্ট তৃণ
কি শস্য-শ্যামল হল!
তুমি দাঁড়ালে যে বৃক্ষ ছায়ায়
অত সুখী আর কে ভবে বল?"

নবীজীর দরবারে উম্মতের প্রতিনিধি দল

ঐতিহাসিক এবং লেখকদেরকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করুন। পবিত্র থেকে পবিত্র স্থানসমূহ এবং উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট সময়েও তারা ঐতিহাসিক মনোভাব, আগ্রহ ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়তে পারে না। তারা মুহূর্তকালের জন্যও এ থেকে মুক্তি পায় না। তারা যেখানেই থাকেন, নিজেদের জ্ঞান ও অধ্যয়নে শ্বাস-প্রশ্বাস নেন। আর অবস্থা-পরিস্থিতির সম্পর্ক অতীতের সাথে জুড়ে দিতে চান। বাস্তব দৃশ্যপট দেখে তাদের মেধা-মনন অতি দ্রুত সেই ঐতিহাসিক দৃশ্যপট অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে, যার পরিপ্রেক্ষিতে এই দৃশ্যপট অস্তিত্ব লাভ করেছে।

আমি গতকাল মসজিদে নববীর রওযায়ে জান্নাতে উপবিষ্ট ছিলাম। আমার চতুর্পার্শ্বে ছিল নামাযী ও ইবাদতগুজার লোকের সমাগম। তাদের কেউ ছিল সিজদাবনত। আর কেউ রুকুতে। কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর আওয়াজ শূন্যে এমনভাবে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল, যেভাবে মৌমাছি তার মৌচাকে গুঞ্জন করতে থাকে। তখনকার উপমা এমন ছিল যে, আমাকে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে সাময়িকের ভুলিয়ে দেওয়ার মত। কিন্তু ইতিহাসে প্রাচীন স্মৃতিগুলো মেঘমালার মত আমার মন-মস্তিষ্কে ছেয়ে যায়। তার উপর আমার কোন জোর খাটেনি।

আমার মনে হল, এই উম্মতের কোন কোন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও পথপ্রদর্শককে এক নবজীবন দান করা হয়েছে। আর তা প্রতিনিধি দলরূপে একের পর এক দরবারে নববীতে হাজির হচ্ছে। এই মহান মসজিদে এসে নামায আদায় করার পর ঐ মহান নবী আ. কে সালাম-হাদিয়া, আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করছে। তার অনুগ্রহ-দানের স্বীকৃতি দিচ্ছে। আগত লোকজন বিভিন্ন যুগ-সময়, গোত্র-বংশ, শ্রেণী-পেশা ও স্থানের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরও তারা সমস্বরে সাক্ষ্য দিচ্ছে– আপনিই সেই নবী, যিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশে বিশ্ব মানবতাকে তিমির অন্ধকার থেকে আলোর পথ, হতভাগ্য থেকে সৌভাগ্যের দিকে, সৃষ্টিজীবের দাসত্ব থেকে এক আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদতের দিকে, ধর্মীয় জুলুম-শোষণ থেকে, ইসলামের ন্যায়-নিষ্ঠা ও ইনসাফের দিকে এবং পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে তার প্রশস্ততার দিকে স্থানান্ত

রিত করেছেন। তারা আরও স্বীকার করছে, এসব ইসলামেরই ফসল। তাদের গোটা অস্তিত্ব ও জীবন নবুওয়াতের অপূরণীয় ঋণস্বরূপ। আল্লাহ না করুন! যদি তাদের থেকে এসব ছিনিয়ে নেওয়া হয়, যা তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এই নবী (সা) -এর মাধ্যমে দান করেছেন এবং নবুওয়তের সেই দান যদি তাদের থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, যা তাদেরকে দুনিয়ায় ইজ্জত-সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিয়েছে, তাহলে তাদের অবস্থা এক নিষ্প্রাণ জড় খোলস এবং কতিপয় অস্পষ্ট ও অর্থহীন রেখাচিত্র অপেক্ষা বেশি কিছু থাকবে না। তারা ইতিহাসের এক অন্ধকার গলিতে বর্বর যুগে ও আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে, যেখানে ছিল অসভ্য বন্য রীতিনীতি এবং জুলুম-শোষণের রমরমা অবস্থা। আর বর্তমান সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম-চিহ্ন পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে যাবে।

সহসা আমার দৃষ্টি একদিকে নিবদ্ধ হল। আমি দেখলাম, বাবে জিব্রীল (আমার সন্নিকটে মসজিদে নববীর প্রাচীন ও অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দরজা) দিয়ে এক জামাত প্রবেশ করছে। লোকজন নীরবতা ও ভাবগাম্ভীর্যে তন্ময়। তাদের ললাটে ইলমের নূর, জ্ঞানের আলো আভা এবং বিচক্ষণতা-বুদ্ধিমত্তার প্রাচুর্য ঠিকরে পড়ছে। তারা বাবে রহমত ও বাবে জিব্রীলে ছড়িয়ে পড়লেন। তারা সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে, গণনার কোনও প্রশ্ন বা অবকাশ ছিল না। আমি দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব লোক কারা? সে বলল, এই উম্মতের ইমাম ও পথপ্রদর্শক। মানবতার ত্রাতা ও বিশ্বমানবের বিশিষ্ট ও গৌরবযোগ্য উপমা। এদের প্রত্যেকেই গোটা জাতির এক ইমাম। পুরো গ্রন্থাগার ও গবেষণাগারের স্থপতি ও প্রতিষ্ঠাতা। সমগ্র জাতির নেতা-অভিভাবক এবং স্বতন্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ভাবক। তাদের অম্লান নিদর্শন, অবিনশ্বর ঈর্ষণীয় সাফল্য ও অপূর্ব অবদান আজও লক্ষ্যণীয়। তাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ইলম-ইজতিহাদ ও গবেষণার আলোয় কয়েক প্রজন্ম সফল জীবন অতিক্রম করেছে। সে দ্রুততার সাথে কয়েকজন মহামানবের নামও আমাকে বলে দিল। ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, লাইছ ইবনে সাদ মিসরী, ইমাম আওযাঈ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, তাকিউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কুদামা, আবু ইসহাক শাতেবী, কামাল ইবনে হুমাম, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী প্রমুখ যদিও এসব মহামনীষীর মাঝে সমকাল, স্বীয় দেশ-গোত্র এবং নিজের ইলম-জ্ঞান, ধর্মীয় মর্যাদা ও অবস্থানের বিরাট পার্থক্য ছিল, কিন্তু তাঁরা সকলেই এ স্থানে এসে নবীজীর দরবারে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম-ভালবাসা ও সালাম নিবেদন করেছেন এবং অনুতাপের অশ্রু ফেলেছেন।

আমি দেখলাম, সর্বপ্রথম তারা অত্যন্ত খুশু-খুযু, বিনয়, নম্রতা ও ঐকান্তিকতার সাথে দুই রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ আদায় করলেন।

এরপর অত্যাধিক আদব ও বিনয়ের সাথে রওযা মুবারকের দিকে অগ্রসর হলেন এবং খুবই সারগর্ভ, সংক্ষিপ্ত, গভীর অর্থপূর্ণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় সালাম পেশ করলেন। আমার মনে হচ্ছে, এখনও তাদের সে শব্দধ্বনি আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তাদের চোখে ছিল অশ্রুর বান। আর কথায় ঝড়ে পড়েছে কোমলতা ও বিনম্রতা। তারা বলেছিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনার অম্লান চিরন্তন প্রশস্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনসাফপূর্ণ ও গভীর প্রশান্ত শরী'আত না হত এবং তার সেসব মূলনীতি না হত, যার থেকে মানবীয় মেধাবুদ্ধি ও যোগ্যতা-দক্ষতা নতুন নতুন পুষ্পমালা ফুলে ফলে ভরে দিয়েছেন। যদি তার সে প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অলৌকিক ব্যবস্থা না হত, যা মানবীয় চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা, তথ্যানুসন্ধান ও মাসয়ালা উদঘাটনের যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। যদি তা মানবতার এক গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন না হত, তাহলে মাহাত্ম্যপূর্ণ এই ফিকহের আবিষ্কার হত না। আর না অস্তিত্ব লাভ করত এই বিশাল ইসলামী কানুন ও সংবিধান। আজ যা থেকে প্রত্যেক জাতির আচল শূন্য। এত বড় ইসলামী গ্রন্থাগারও তৈরী হত না, যার সামনে দুনিয়ার সকল ধর্মীয় প্রবন্ধ-নিবন্ধ, রচনা নগণ্য। আপনি যদি জ্ঞানের প্রসার, আল্লাহ পাকের নিদর্শন এবং তাঁর অপার কুদরত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা ও বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করার জন্য এমন জোরালো আহ্বান না করতেন; তাহলে এই ইলম ও জ্ঞানের বৃক্ষ বেশি দিন ফুলে ফলে ভরে উঠত না। আর তার ছায়া বিশ্বব্যাপী এভাবে বিস্তার লাভ করত, যেমনটি আজ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আগের মতই শৃংখলিত থাকত। আলো থেকে বঞ্চিত হত পৃথিবী।"

আমি এই জামাতকে মন ভরে দেখতে পারলাম না। ইত্যবসরে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল বাবে রহমত হয়ে ভিতরে প্রবেশকারী আরেকটি জামাতের প্রতি। সফলতা, আল্লাহভীতি, দুনিয়া বিমুখতা এবং ইবাদত-বন্দেগীর স্পষ্ট নিদর্শন তাদের চেহারায় দেখা যাচ্ছিল। আমাকে বলা হল, এ জামাতে হাসান বসরী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, সুফিয়ান সাওরী, ফুযাইল ইবনে আয়ায, দাউদ তায়ী ইবনুস সামাক, শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী, নিযামুদ্দীন আউলিয়া, আব্দুল ওয়াহহাব মুতকী প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীনের মত লোকও শোভা পাচ্ছে। যারা তাদের ধর্মে ঈর্ষণীয় অগ্রবর্তী প্রবীণদের স্মৃতি জীবন্ত করে দিয়েছে। নামাযান্তে তারাও রওযা মুবারকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে গেল এবং আপন নবী ও মহান নেতা, সবচেয়ে বড় শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক মুহাম্মাদ (সা) কে দরূদ ও সালাম হাদিয়া করতে থাকে। তারা বলছিল– "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সামনে যদি সেই ইলমী ও জ্ঞানের উপমা না থাকত, যা আপনি পেশ করেছেন, যদি সে আলোর ফোয়ারা নূরের মিনারা না

থাকত, যা আপনার পরবর্তী লোকদের জন্য আপনি স্থাপন করেছেন। যদি আপনার এ বাণী না হত– হে আল্লাহ! জীবন তো আখেরাতের জীবন।" যদি আপনার এই অসিয়ত না হত যে, "পৃথিবীতে এমনভাবে জীবন যাপন করো, যেভাবে কোনও মুসাফির কিংবা পথিক জীবন কাটায়।" যদি সে জীবন পদ্ধতি না শুনতাম, যা হযরত আয়েশা (রা) নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, "এক চাঁদের পর দ্বিতীয় চাঁদ আর দ্বিতীয়টির পর তৃতীয় চাঁদও উদয়ে হয়ে যেত, অথচ নবীজীর ঘরে আগুন জ্বলত না। না চুলায় পাতিল বসানোর সুযোগ হত। তাহলে আমরা দুনিয়ার উপর এভাবে পরকালকে প্রাধান্য দিতে পারতাম না। আর না আমরা কেবল প্রাচুর্যের উপর বসবাস করতে পারতাম। না অল্পে তুষ্টিকে আমাদের জীবনের নিদর্শন বানাতে পারতাম। না আমরা নিজের কুপ্রবৃত্তির তাড়না-কুমন্ত্রণাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম। আর না পারতাম এই দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী চাকচিক্যে, মনোহারিতা, সৌন্দর্য-সৌকর্য, পদমর্যাদা আর ক্ষমতার শক্তি ও টানাপোড়েনের মোকাবেলা করতে।"

তাদের প্রজ্ঞাপূর্ণ শব্দগুলো তখনও আমার মেধা-মননে পুরোপুরি গেঁথে বসেনি। ইতোমধ্যে আমার দৃষ্টি আরেক দলের উপর পতিত হয়। যারা বাবে নিসা (মসজিদে নববীর প্রাচীন দরজা, প্রথম যুগে যেটি শুধু মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।) দিয়ে অত্যন্ত আদব ও মার্জিতভাবে এগিয়ে যাচ্ছিল। ইসলামী আদর্শ, সভ্যতা ও নীতিবিরোধী বাহ্যিক সকল সাজসজ্জা, বেশভূষা ও স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল এ জামাত। এরা ছিল বিভিন্ন বংশ-গোত্র ও দূর-দূরান্ত থেকে আগত নানা দেশের নেককার, ইবাদতগুজার, পুতঃপবিত্র পুণ্যবতী মহিলা। যারা আরব-অনারব, প্রাচ্য-প্রতীচ্য বিভিন্ন ভূ-খণ্ডের সাথে সম্পর্ক রাখত। নিতান্তই ঐকান্তিকতার সাথে হৃদয়স্পর্শী ভাষায় পুরোপুরি আদব ও সম্মানের প্রতি যত্নবান হয়ে তারা তাদের মনের আবেগমাখা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছিল, তারা বলছিল– "আমরা আপনার উপর দরূদ সালাম পেশ করছি। হে আল্লাহর রাসূল! এমন শ্রেণীর দরূদ-সালাম, যার উপর আপনার অনুগ্রহ-দান অপরিসীম। আপনি আমাদেরকে আল্লাহর সাহায্যে জাহিলিয়্যাতের শৃংখল ও বন্দিদশা, জাহেলী রুসম-রেওয়াজ ও বদঅভ্যাস, সমাজের জুলুম-শোষণ, পুরুষের নিষ্ঠুরতা ও বাড়াবাড়ি থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। কন্যা শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়ার কুপ্রথা বিলুপ্ত করেছেন। মায়েদের অবাধ্যতার কারণে সাবধানবাণী শুনিয়েছেন। আপনি আমাদেরকে উত্তরাধিকার সত্ত্বে অংশীদার করেছেন। তাতে আমাদের মা, বোন, কন্যা ও স্ত্রী হিসেবে অংশ পাইয়ে দিয়েছেন। আরাফা দিবসের ঐতিহাসিক ভাষণেও আপনি আমাদের কথা ভুলেননি। সেখানেও বলেছেন–

স্ত্রীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর নামের উসীলায় পেয়েছ। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে আপনি পুরুষদেরকে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহার, সদাচরণ, অধিকার সংরক্ষণ, উত্তম জীবন যাপনের উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে আমাদের এই অবলা নারী জাতির পক্ষ হতে উত্তম থেকে উত্তম প্রতিদান দিন, যা নবী রাসূল এবং আল্লাহর নেক, সৎ ও পুণ্যবান বান্দাকে দেওয়া যায়।"

এই কোমল আওয়াজগুলো আমার কানে গুঞ্জরিত হচ্ছিল। এরই মধ্যে আরেকটি দল দৃষ্টিগোচর হল। বাবুস সালাম দিয়ে আসছিল এ দলটি। আমি তাদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, সেটি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিভিন্ন শাস্ত্রের জনক ও উদ্ভাবক, নাহু, লোগাত (অভিধান) এবং বালাগাত (অলংকার শাস্ত্রের) ইমামগণের দল। সেখানে আবুল আসওয়াদ দুয়ালী, খলীল ইবনে আহমদ, সীবওয়ায়েহ, কাসাঈ, আবু আলী আল ফারসী, আব্দুল কাহের জুরজানী, সাক্কাকী, মাজদুদ্দীন ফিরোজ আবাদী, সাইয়িদ মুরতাজা বলগারামীও ছিলেন। যারা নিজ নিজ শাস্ত্রের সালাম পেশ করছিলেন। নিজের যশ-খ্যাতি ও ইলমী (জ্ঞানগত) মর্যাদার ঋণ শোধ করতে এসেছিলেন তারা। আমি দেখলাম, তারা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের, সাবলীল ও সাহিত্যালংকারপূর্ণ ভাষায় বলছেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি শুভাগমন না করতেন আর এ মহাগ্রন্থ না হত, যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যদি আপনার হাদীসগুলো এবং এ শরী'আত না হত, যার সামনে অবনত মস্তক ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল আর তজ্জন্য আরবী ভাষা শিখা ও তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জনে বাধ্য ছিল। তাহলে এই ইলম জ্ঞান-শাস্ত্রও আবিষ্কৃত হত না, যাতে আজ আমরা ইমামত ও নেতৃত্বের মর্যাদা লাভ করেছি। নাহু, বয়ান, বালাগাত- এর কোনটিই অস্তিত্ব লাভ করত না। এই বিশাল শব্দকোষ, অভিধানও দৃষ্টিগোচর হত না। না আরবী ভাষার শব্দভাণ্ডার নিয়ে এই তথ্যকণিকা ও সূক্ষ্মতার উদ্ভব হত। না আমরা এ পথে এত বেশি ও দীর্ঘ কষ্ট-সাধনার জন্য আমরা প্রস্তুত হতাম। (যাদের কাছে ভাষা-সাহিত্য ও কথাশৈলীর কোনও ঘাটতি ছিল না।) আরবী শিখা এবং তাতে দক্ষতা অর্জন করার কোন ইচ্ছা-আগ্রহ হত না। আর না তাদের মধ্যে সেসব লেখক, কলম সৈনিক ও সাহিত্যিক সৃষ্টি হত, যাদের ভাষা-সাহিত্য ও কথাশৈলীকে আরবী ভাষাবিদগণও অলঙ্ঘনীয় মেনে নিয়েছেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিই আমাদের এবং ইসলামের মাঝে সৃষ্ট সেসব ইলম, জ্ঞান ও শাস্ত্রের মধ্যে মাধ্যম ও সেতুবন্ধন ছিলেন, যা আপনাকে প্রেরণের পর অস্তিত্ব লাভ করেছে। বস্তুতঃ আপনিই আরব-অনারবের মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র মাধ্যম। আপনার মহান সত্ত্বাই এতদুভয়ের মধ্যকার শূন্যতা পূরণ করেছে।

আরব-অনারব এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মানুষকে গলায় গলায় মিলিয়ে দিয়েছে। (তাদের সিংহপুরুষ ও কৃতজ্ঞ বানিয়েছে। তাদের মাঝে সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও মধুর সম্পর্ক তৈরী করেছে।) আপনার কত বড় অনুগ্রহ দান আমাদের তীক্ষ্ম মেধা, মন-মানসিকতা ও ইলম-জ্ঞানের গভীরতায়! আপনার কত বড় করুণা ইলমের এই অমূল্য ধনের ওপর, মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির উর্বরতার ওপর, কলমের শৈল্পিকতার ওপর। ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি না এলে এই আরবী ভাষা অন্যান্য বহু ভাষার মতই ভূ-পৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। যদি কুরআনে কারীমের অবিনশ্বর সহীফা এর রক্ষাকবচ না হত, তাহলে এতে (আরবী ভাষায়) এতটাই পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়ে যেত যে, তার আকৃতিই বিলীন হয়ে যেত। তা ক্রমেই এক নতুন ভাষার রূপ নিত। যেমনটি হয়েছে অন্যান্য ভাষার সাথে ব্যাপকভাবে। অনারব শব্দাবলি ও স্থানীয় ভাষা একে গ্রাস করে ফেলত কিংবা বিকৃত করে দিত। এর বিশুদ্ধতা ও মৌলিকত্ব একেবারে বিনাশ হয়ে যেত। আপনার বরকতময় শুভাগমন, ইসলামী শরী'আত ও এই মহাগ্রন্থের অমূল্য দান এটা, যা এই ভাষাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে। মুসলিম বিশ্বের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে এর ইজ্জত-সম্মানকে। প্রত্যেক মুসলমানের বক্ষ-হৃদয়কে করেছে তার ভালবাসার জিন্দানখানা। আপনার কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ ভাষাকে স্থায়িত্ব দিয়েছেন। এর চিরন্তনতা ও উন্নতি নিশ্চিত করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এ ভাষায় কথা বলে বা লিখে-পড়ে বা এর কারণে কোনরূপ উচ্চ মর্যাদা লাভ করে কিংবা এর প্রতি ডেকে যায়, তার উপর আপনার বড়ই অনুগ্রহ। সে কখনও এই অনুগ্রহ-দানের অস্বীকারকারী কিংবা এর থেকে কখনও দায়িত্বমুক্ত হতে পারে না।

আমি তাদের এই আবেগপূর্ণ শোকরিয়া জ্ঞাপন, কৃতজ্ঞতা, স্বীকারোক্তি ও বাস্তবতার বহিঃপ্রকাশ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম, হঠাৎ করে আমার চোখ পড়ল বাবে আব্দুল আযীয (সুলতান আব্দুল আযীয নামে খ্যাত মসজিদে নববীর নতুন একটি দরজা, যা আধুনিক নির্মাণের পর বাবে মজীদীর দিকে নির্মিত) এর ওপর। এ দরজা দিয়ে এমন এক দল আসছিল, যাদের মাঝে বিভিন্ন জাতি-গোত্র ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের রং-বৈচিত্র শোভা পাচ্ছিল। এ দলে পৃথিবীর বড় বড় সুলতান ইতিহাসখ্যাত বিশিষ্ট রাজা বাদশা ও শাসকবর্গও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হারুনুর রশীদ, ওয়ালিদ ইবনে আব্দুল মালিক, মালেক শাহ সালজুকী, সালাহুদ্দীন আইয়ূবী, মাহমূদ গযনবী, জহিরউদ্দীন বাবর, সুলাইমান আযম, আওরঙ্গজেব আলমগীরও ছিলেন এ দলে। চাকর-নওকর, দূত-পিয়নদের রেখে গিয়েছেন দরজার বাইরেই। দৃষ্টি ছিল অবনমিত। বিনয়-নম্রতার মূর্তপ্রতীক হয়ে ক্ষীণ স্বরে কথা বলে সামনে চলেছিলেন। আমার সাথে

তাদের ব্যক্তিত্ব ও সাফল্যগুলো ভেসে উঠছিল। আমার চোখে এই বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি চক্কর দিয়ে যায়, যেখানে তাদের দাপট চলত। তাদের ডংকা বাজত। তাদের বাদশাহী-রাজত্ব ও শাসনের চিত্র একে একে আমার সামনে ভাসতে লাগল, যা ছিল তাদের পৃথিবীর বড় বড় সম্প্রদায়-জাতি, শক্তিধর সাম্রাজ্য ও জালিম-প্রতাপশালী সম্রাটদের ওপর। তাদের মধ্যে সেসব শক্তিও ছিল, যিনি একখণ্ড মেঘমালা দেখে ঐতিহাসিক এ বাক্যটি বলেছিলেন, "তুমি যেখানে ইচ্ছে বর্ষিত হও! তোমার ট্যাক্স অবশেষে আমার ধনভাণ্ডারেই জমা হবে।" সেই ব্যক্তিত্বও ছিল, যার রাজত্বের প্রশস্ততা ও ব্যাপৃতির অবস্থা ছিল এই যে, যদি সকল দ্রুত গতিসম্পন্ন উষ্ট্রী আরোহী রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যেতে চাইত, তাহলে পনের মাসের কমে তা সম্ভব ছিল না। তাদের মধ্যে সে শাসকও ছিলেন, যিনি অর্ধ পৃথিবী শাসন করতেন। বড় বড় রাজা বাদশাও তাকে ট্যাক্স দিতে বাধ্য ছিলেন। এমন শাসকও ছিলেন, যার প্রভাবে গোটা ইউরোপ ভীত-সন্ত্রস্ত ছিল। গোটা ইউরোপ যার ভয়ে ছিল কম্পমান। যার যুগে মুসলমানদের মান-সম্মানের অবস্থা এরূপ ছিল যে, যখন তিনি ইউরোপে যেতেন, তখন তার ধর্মের সম্মানে এবং তার বড়ত্ব ও দাপটের প্রভাবে গির্জাসমূহের ঘন্টি বাজা বন্ধ হয়ে যেত।

মোটকথা, এ ধরনের কত রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গ, জাতি এই মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। তারা মসজিদে নববীতে নামায পড়ার জন্য সামনে অগ্রসর হতে থাকেন। রাসূলে কারীম (সা) -এর উপর দরূদ-সালাম হাদিয়া পেশ করতেন। একে নিজের জন্য সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য-সাফল্য ও সম্মান মনে করতেন। আকাঙ্ক্ষা করতেন, আহ! যদি তাদের এ নামায ও দরূদ-সালাম কবুল হত! আমি দেখলাম, তারা কম্পিত পদে ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের মনে বিরাজ করছিল অজানা ভয়-শঙ্কা। এমনটি তারা 'সুফফা'র কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন, যা ছিল দরিদ্র অসহায় সাহাবায়ে কিরামের অবস্থানস্থল। তারা স্বল্প সময়ের জন্য সেখানে থমকে দাঁড়ালেন। ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান এবং লজ্জামিশ্রিত আকুলতার সাথে এ স্থানটি দেখতে লাগলেন, যা কোন এক সময় সেসব দরিদ্র-অসহায় সাহাবায়ে কিরামের ঠিকানা ছিল, যাদের পদধূলিকে তারা আজ স্বীয় চোখের সুরমা বানাতে সদা প্রস্তুত। এর সন্নিকটেই তারা 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' হিসেবে দুই রাকাত নামায আদায় করেন এবং রওযা মুবারকের দিকে অগ্রসর হোন। অনন্তর তাদের নবীপ্রেম, ভক্তি-শ্রদ্ধা, আবেগ-অনুভূতি, ইলম ও ঈমান যা কিছু বলতে বাধ্য করেছে, তারা সেকথাগুলো নবীজীর দরবারে আরয করলেন। তবে শরী'আতের আদব লক্ষ্য রেখে এবং নিখুত-নির্ভেজাল একত্ববাদকে সামনে রেখে। আমি শুনলাম, তারা বলছেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনি না হতেন, যদি আপনার এই

জিহাদ ও দাওয়াত না হত, যা পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়েছিল, যাতে বড় বড় রাষ্ট্র বিজিত হয়েছে। যদি আপনার দীন-ধর্ম না হত, যার উপর ঈমান আনার পর আমাদের পূর্বপুরুষগণ নির্জন কুঠুরী ও লাঞ্ছনার গহ্বর থেকে বেরিয়ে সম্মান ও আভিজাত্য, উঁচু সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রশস্ত জীবনে প্রবেশ করেছেন। অনন্তর এর প্রভাবে তারা বিশাল বিশাল রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। দূর-দূরান্তের বহু দেশ জয় করেছেন। সেসব বিজিত জাতি থেকে কর উসূল করেছেন। যারা কোনকালে তাদেরকে স্বীয় লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে ফিরত। ভেড়া-বকরীর পালের মত তাদের তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। যদি অন্ধকার জাহিলিয়াত থেকে ইসলামের দিকে এবং অচেনা-অবাচীন প্রান্ত আর সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ বহুগোত্রীয় জীবন থেকে বিশ্ব জয়ের দিকে এই সফর না হত, যা আপনার বরকতে সুসম্পন্ন হয়েছে, তাহলে পৃথিবীর কোথাও আমাদের ঝাণ্ডা সমুন্নত হত না। আর না কোথাও আমাদের কাহিনী শোনানো হত। আমরা এমনভাবে ঘাস-পানিশূন্য, শুষ্ক-বিরান মরুপ্রান্তরে ও ক্ষুদ্র উপত্যকায়ই পড়ে থাকতাম। যে শক্তিশালী ক্ষমতাধর হত সে দুর্বলের উপর জুলুম করত। বড়রা ছোটদের উপর বাড়াবাড়ি করত। আমাদের খাবার এতই তুচ্ছ এবং জীবনযাত্রা এতই নিম্নমানের ছিল যে, তার চেয়ে নীচুতার কল্পনা করা মুশকিল। পাড়া-গাঁ কিংবা সংকীর্ণ গোত্র থেকে সামনে বেড়ে কোন কিছু চিন্তা-ভাবনা করার কোন যোগ্যতা আমাদের ছিল না। যেখানে আমাদের গোটা জীবন ও সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। আমাদের উপমা ছিল পুকুরের মাছ আর কূয়ার ব্যাঙের মত। আমরা নিজেদের সংকীর্ণ জ্ঞান-অভিজ্ঞতার জালে বন্দি ছিলাম। অথচ অজ্ঞ, মুর্খ ও নির্বোধ পূর্বপুরুষদের প্রশংসায় আমরা ছিলাম পঞ্চমুখ।

হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে আপনার দ্বীনের এমন আলোকবর্তিকা দান করেছেন, আমাদের চোখ খুলে গেছে। চিন্তাশক্তিতে গভীরতা ও প্রশস্ততা এসেছে। দৃষ্টি উজ্জ্বল-সমুন্নত হয়েছে। এরপর আমরা এই প্রশান্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ দ্বীন এবং এই আত্মিক বন্ধন ও সম্পর্ক নিয়ে আল্লাহর বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছি। আমাদের মৃত-নিষ্প্রাণ নিদ্রাবিভোর যোগ্যতাগুলো জেগে উঠেছে। আমরা সেসব যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে শিরক-অংশীদারিত্ববাদ, পৌত্তলিকতা, জুলুম-শোষণে ও মূর্খতার অন্ধকারকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে মোকাবেলা করেছি। এমন বিশাল প্রভাবশালী শাসন ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছি, যার ছায়াতলে আমরা, আমাদের সন্তান এবং আমাদের ভ্রাতৃবর্গ শত শত বছর সুখ-সমৃদ্ধি ও উপকার লাভ করে যাচ্ছি। আজ আমরা আপনার খেদমতে গোলামের মত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছি। আমাদের প্রেম-ভালবাসার আবেগ-আকুলতা, ভক্তি-সম্মানের কর বা ট্যাক্স আমরা স্বেচ্ছায় সন্তুষ্টচিত্তে পরিশোধ করছি। একেই মনে করি, আমাদের গৌরবের

কারণ ও নাজাতের উসীলা। আমরা অকপটে স্বীকার করি যে, এই দ্বীনের আহকাম, ধর্মীয় বিধি-নিষেধ, নিয়মনীতি ও আইন-কানুন কার্যকর করার ব্যাপারে (যার ফলে আল্লাহ্ পাক আমাদের সম্মানিত করেছিলেন) আমাদের দ্বারা নিশ্চিত অনেক ত্রুটি হয়েছে। আমরা আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করছি। নিশ্চয়ই তিনি অত্যাধিক ক্ষমাশীল এবং অসীম দয়ালু।'

আমি সেসব রাজা-বাদশাদের প্রতি মনোযোগী ছিলাম। আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তাদের নীরব ও শ্রদ্ধাভরা চেহারার ওপর। আমার কান নিবিষ্ট ছিল তাদের একাগ্রতাপূর্ণ অসহায় শব্দমালার প্রতি। ইতোপূর্বে যা আর কখনও কোথাও তাদের থেকে শ্রবণ করিনি। ইত্যবসরে আরেকটি দল প্রবেশ করল। বাদশা ও শাসকবর্গদেরকে উপেক্ষা করে তাদের কাতার ভেঙে সামনে চলে গেল দলটি। মনে হচ্ছিল, এসব রাজা-বাদশাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, দাপট-শক্তি ও নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া বা ভ্রুক্ষেপই নেই তাদের মাঝে। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়ত এরা কোনও কবি-সাহিত্যিক কিংবা বিপ্লবী দল। আমরা এ ধারণা ভুল ছিল না। কারণ, এ দলটি ছিল এদুভয় লোকের সমন্বিত। এতে ছিলেন সাইয়িদ জামালুদ্দীন আফগানী, আমীর সাঈদ হালীম, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহারী, শাইখ হাসানুল বান্নার সমমনা তুরস্কের প্রসিদ্ধ কবি মুহাম্মাদ আকিফ এবং হিন্দুস্তানের ডাক্তার মুহাম্মাদ ইকবাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও। ভাষ্যকার হিসেবে তারা শেষোক্ত ব্যক্তি (আল্লামা ইকবাল) কে মনোনীত করেন। এই সুযোগ্য ভাষ্যকার নিম্নোক্ত ভাষায় তার শ্রদ্ধা অনুরাগ প্রকাশ করেন।

উভয় জাহানের সর্দার! বদর ও হুনাইনের সেনাপতি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে সে জাতির বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছি, যারা আজও আপনার নেয়ামতের দস্তরখানার অংশ চয়ন করছে। আপনার রহমতের ছায়া ছাড়া কোথাও তারা আশ্রয় পায় না। আপনার লাগানো বাগান থেকেই ফলমূল ভক্ষণ করে। আজ তারা সেসব রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে নিজের খুশিমত রাজত্ব করছে।

আপনি যে রাষ্ট্রগুলোকে শোষণের যাতাকল থেকে, অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং ঝলমলে সূর্যের আলো ও নির্মল বাতাস এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু যে জাতিই আজ তার মূলোচ্ছেদ করছে, যার উপর এ উম্মতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। তাদের নেতৃবর্গ ও পথপ্রদর্শকগণ আজ চেষ্টা করছে, ঐক্যবদ্ধ এ জাতিকে বহুধা বিভক্ত-বিক্ষিপ্ত জাতিতে পরিণত করতে। এরা সে জিনিসই পুনরুজ্জীবিত করতে চায়, আপনি যা ধ্বংস করেছিলেন। সেই জিনিসকেই এরা বিস্তৃত করছে, যা আপনি নির্মাণ করেছিলেন। এরা এ উম্মতকে জাহিলিয়াতের অন্ধকার যুগে যুগে পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যেখান থেকে আপনি চিরকালের জন্য বের করে এনেছিলেন। এ বিষয়ে তারা

ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ করছে, যারা স্বয়ং মানসিক নিঃস্বতা, বিক্ষিপ্ততা, আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস এবং মানবিক বিকারগ্রস্থতার শিকার। এরা আল্লাহর নেয়ামতরাজিকে অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তন করে স্বজাতিকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে চায়। 'চেরাগে মুস্তফা' (নববী আলো) এবং 'শারারে আবু লাহাবী' (আবু লাহাবী দুষ্টতা) এর মধ্যকার রণউত্তেজনা আজ পুনরায় বিরাজ করছে। দূর্ভাগ্যবশতঃ এসব লোক আবু লাহাবের ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে আছে। যারা নিজেদেরকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করে, মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, আরবী ভাষায় কথা বলে, আজ তারা জাহেলী ও মূর্খতাসুলভ কর্মকাণ্ড ও পৌত্তলিকতায় গর্ববোধ করে, যা আপনি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এসব লোক সেসব ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্য, যারা কেনার সময় বেশি নিতে চায় আর বিক্রির সময় দিতে চায় কম। এরা আপনার মাধ্যমে সবকিছুই অর্জন করেছে, সব ধরনের শক্তি-সম্মানে ভাগ্যবান হয়েছে। আজ এরা সেসব জাতির সাথে, যাদের শাসক ও রক্ষক এরা– এমন আচরণ করছে যে, তাদেরকে জবরদস্তি ও শক্তিবলে ইউরোপের পদতলে ঠেলে দিতে চায়, তাদেরকে জাহেলী বর্বর দর্শন, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের হাতে ন্যস্ত করতে চায়।

আপনি যেসব মূর্তি থেকে বাইতুল্লাহ শরীফকে পবিত্র করেছেন, আজ তা মুসলিম মিল্লাতের মাথার উপর নতুন নামে নতুন সংস্করণে নতুন পোষাকে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি আরববিশ্বের কোনও কোনও ভূ-খণ্ডে, যেগুলো আপনার দূর্গ ও কেন্দ্রস্থল হওয়া উচিৎ ছিল, সেখানে গণবিদ্রোহ দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কোনও ফারুক (রাযি.) সেখানে নেই।

চিন্তাধারা ও মানসিক ধর্মান্তরিতার দাবানল ক্ষিপ্রতার সাথে ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ নেই কোনও আবু বকর রাযি., যিনি প্রচণ্ড-সাহসিকতা ও বীরবিক্রমে ময়দানে অবতীর্ণ হবেন। নির্বাপিত করবেন এই লেলিহান অগ্নিশিখা।

আমার এবং আমার সকল সাথীর পক্ষ থেকে, যাদের প্রতিনিধিত্ব ও অভিব্যক্তি ব্যাখ্যা করার গৌরব আমি পেয়েছি, হৃদয়ের গভীর থেকে নির্গত শ্রদ্ধা ও সম্মানের আকুল উচ্ছাসে ভরা সালাম গ্রহণ করুন। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি এবং আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি সেসব নেতা ও পথপ্রদর্শক থেকে মুক্ত এবং অসন্তুষ্ট, যারা তাদের মুখ ও দৃষ্টি ইসলামের কিবলা থেকে ঘুরিয়ে পশ্চিমাদের প্রতি নিবদ্ধ করেছে। এরাই সেসব লোক, যারা আপনার এবং দ্বীনের সাথে কোনও সম্পর্ক বাকী রাখেনি। আমি আপনার কৃতজ্ঞতা এবং সুন্নত ও আদর্শের অনুসরণের পুনঃঘোষণা দিচ্ছি। যতদিন জীবন থাকবে, এ দেহে প্রাণ থাকবে, ততদিন ইসলামের এ রজ্জুকে ইনশাআল্লাহ দৃঢ়হস্তে আকড়ে রাখব!"

এই সাহিত্যালংকারপূর্ণ ও ঈমান-ইয়াকীনে ভরা শব্দমালা সমাপ্তও হতে পারেনি। মসজিদে নববীর সুউচ্চ মিনারগুলো থেকে আযানের সুমধুর প্রাণস্পর্শী আওয়াজ ভেসে আসে– আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আমি সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে গেলাম। চিন্তা জগতের এই ক্রমধারা, যা ইতিহাসের আশ্রয়ে দণ্ডায়মান হয়েছিল, তা ভেঙে গেল। আমি বললাম–

مؤذن مرحبا بروقت بولا

تری آواز کے اور مدینے

"মারহাবা হে মুয়ায্যিন মাক্কী-মাদানী, করলে বোধ হয় বড়ই ঋণী,
সুসময়ে ডেকে গেল মোরে, তব সুমধুর আযানধ্বনি।"

আমি পুনরায় এই মর্ত্য জগতে ফিরে এলাম। যেখান থেকে গিয়েছিলাম চিন্তার মহারাজ্যে। তখন কিছু লোক নামাযে ব্যস্ত ছিল। আবার কেউ তিলাওয়াত করছিল শাশ্বত গ্রন্থ কুরআন মাজীদ থেকে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত ধর্মপ্রাণ মানুষ দলে দলে রওযা শরীফে এসে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দরবারে দরূদ-সালাম পেশ করছিল। বংশ-বর্ণ ও ভাষা-স্বরের বৈচিত্র্যতা সত্ত্বেও সকলের একই আবেগ-উচ্ছাস, মনের আকুল অভিব্যক্তিগুলো এক বিস্ময়কর অবস্থার সৃষ্টি করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর নামে সীরাতে মুহাম্মাদীর বার্তা

আমাদের সামনে যখন জাহেলিয়াতের নাম আসে, তখন অনিচ্ছায় আমাদের চোখের পর্দায় ষষ্ঠ খৃস্ট শতকের সেই অন্ধকার যুগের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠে, যেখানে মুহাম্মাদ (সা) কে প্রেরণ করা হয়েছে। যেখানে নবীজীর হেদায়াত ও শিক্ষার সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে উজ্জ্বল মুজিযা প্রকাশ পেয়েছে। জাহেলিয়াত শব্দটি শোনামাত্রই আকস্মিকভাবে আরব জাতিকে তাদের সেই সব জাহেলী (মূর্খ) কর্মকাণ্ড ও স্বভাব-চরিত্রের সাথে চলাফেরা করতে দেখা যায়, যার উপযুক্ত বিবরণ আমাদের ঐতিহাসিক ও সীরাত রচয়িতাগণ তুলে ধরেছেন।

কিন্তু জাহেলিয়াত কেবল সে যুগের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামী পরিভাষায় প্রত্যেক সে যুগই আদতে জাহেল যুগ (বর্বর যুগ), যা ওহী ও নবুওয়াতের আলো এবং দিক নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত। যেখানে নবী-রাসূলগণের আলোকরশ্মি পৌঁছেনি কিংবা পৌঁছেছে ঠিক কিন্তু জাতি তার চক্ষুযুগল সেদিক থেকে বন্ধ করে নিয়েছে। চাই সেটি ষষ্ঠ খৃস্ট শতকের জাহেলিয়াত হোক বা ইউরোপের সেই ঐতিহাসিক মধ্যযুগীয় বর্বরতাই হোক, যা সাধারণতঃ অন্ধকার যুগ নামে খ্যাত কিংবা বিংশ শতাব্দীর এই উজ্জ্বল দীপ্তিমান সভ্যতা ও উন্নতির যুগই হোক, যাতে আমরা দিন যাপন করছি। কুরআন মাজীদ বলে বিশ্ব জগতে আলো কেবলমাত্র একটি। তার উৎসও একটি الله نور السموات والارض। কিন্তু অন্ধকার অসংখ্য। তার কোনও সীমা ও হিসাব নেই। যদি আল্লাহ পাকের আলোর (যা কেবল নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আসে) জ্যোতি না থাকে, তাহলে দুনিয়ার অন্ধকারগুলোর কোনও প্রভাকর আশ্রয় নেই। জীবনের প্রতিটি পদে পদে, মোড়ে মোড়ে, প্রতিটি মনজিলে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ.

"অথবা (তাদের কর্ম) উত্তাল সমুদ্রের বুকে গভীর অন্ধকারের ন্যায়, যাকে উদ্বেলিত করে তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, যার উপরে আছে ঘনকালো মেঘ। একের উপর এক অন্ধকার। যখন সে তার হাত বের করে, তখন তাকে একেবারেই দেখতে পায় না। আল্লাহ যাকে জ্যোতি দেন না, তার কোনও জ্যোতি নেই।" (সূরা নূর- ৪০)

কুরআন মাজীদে যেখানে জ্যোতি ও অন্ধকারের বিবরণ একসাথে এসেছে, নূর শব্দটিকে একবচনরূপে আর ظلمات (অন্ধকার) শব্দটিকে বহুবচনরূপে আনা হয়েছে। এতে বুঝা যায়, অন্ধকার বহু রকমের হতে পারে। কিন্তু আলো বা জ্যোতি কেবল একটিই হবে। যদি এই কুদরতী জ্যোতির আলো না হত, তাহলে কৃত্রিম কোনও জ্যোতি এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকারে আলো ছড়াতে পারত না। তাহল তো এই আলো ঝলমলে কর্মব্যস্ত পৃথিবী এক বিশাল বিস্তৃর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন কবরস্থান হয়ে যেত। যেখানে আলোর কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেই। যেখানে শত কোটি আলোর প্রদীপ জ্বালালেও ফর্সা হত না। কবি যথার্থই বলেছেন–

شمیں بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا

أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا.

"আর যে মৃত ছিল এরপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ঐ ব্যক্তির সমতূল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে রয়েছে- সেখান হতে বের হতে পারছে না?" (সূরা আনআম- ১২২)

মনে হয় পাশ্চাত্যের সেই সরেজমীন পর্যন্ত (যেখান থেকে সূর্যোদয় হয় না বরং যেখানে সূর্যাস্ত হয়) নবুওয়াতের আলোকরশ্মি খুবই কম পৌঁছেছে। সেখানে এই আসমানী আলোকরশ্মির কাজ সব সময় মানবীয় আলা আভা দিয়ে করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। ইউনান ও রোমীদের সোনালী যুগ মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাস্ত্রের দিক থেকে নিঃসন্দেহে ইতিহাসের উজ্জ্বল যুগ। কিন্তু নবুওয়াতে শিক্ষা ও হেদায়াতের দিক থেকে এতটাই অনুজ্জ্বল-আলোহীন, যেমনটা হতে পারে অন্ধকার থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন জাহালত ও মূর্খতার যুগ। সেখানে আল্লাহ পাকের সত্ত্বা ও গুণাবলির ব্যাপারে কোন আলোকবর্তিকা ও দিকনির্দেশনা ছাড়াই নিছক অনুমান ও যুক্তিতর্কের মরিচিকা দিয়ে কাজ নেওয়া হয়েছে।

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.

(এ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই; তারা কেবল অনুমান এবং ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করে।) বহুত্ববাদ ও দর্শনের যে ম্যাজিক সেসব রাষ্ট্রের হাকিম-দার্শনিকগণ বিন্যাস করেছেন, নিজের অলীক কল্পনা ও বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টির দিক থেকে প্রাচ্যের হৃদয়বিদারক দৃশ্যে আত্মহারা ভেল্কিবাজি ও বিস্ময়কর উপাখ্যান থেকে কম নয়। সংকট ও আফলাতুনের (এরিস্টটল নয়) কথাবার্তা এবং প্লেটোর চিন্তাধারাগত দর্শনের চারিত্রিক শিক্ষাদীক্ষায় নবী রাসূলগণের শিক্ষার প্রভাবের ছাপ কোথাও কোথাও অবশ্যই এমনভাবে দৃষ্টিগোচর হত, যেমন বর্ষার অন্ধকার রাতে নিশি প্রদীপ জোনাকী পোকার ঝলক। যাতে মনে হয়, নবী রাসূলগণের কিছু কথা তাদের কানে কদাচিৎ পৌঁছেছিল। কিন্তু সে আলো ও দ্যুতি এতটা তীক্ষ্ণ এবং স্থায়ী নয় যে, এর সাহায্যে তারা এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে পারে।

كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۔

"যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তখন তারা সে আলোয় চলতে শুরু করে। আর যখন অন্ধকার ছেয়ে যায়, তখন তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে।" (সূরা বাকারা- ২০)

আশ্চর্যের কথা হল, হযরত ঈশা মসীহ আ.-এর হেদায়াতের আলো প্রাচ্য দেশে দু'শতক পর্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ বায়ুর গতিরোধ করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যে গুণগ্রাহীদের আচলতলে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে থাকে। অর্থাৎ হযরত ঈসা আ. -এর শিক্ষা পশ্চিমা দেশে দিয়ে নিজের মৌলিকত্ব হারিয়ে ফেলে। যেখানে ঈসায়ী ধর্ম বা খৃস্টধর্মের প্রথমবার শক্তি ও রাজত্ব লাভ হয়, শিরক ও পৌত্তলিকতার স্রোত খৃস্টধর্মের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে প্রবাহিত হতে থাকে। খুব কমই হয়ত পৃথিবীর কোনও ধর্মের জন্য (অপর) কোনও নতুন ধর্ম এতটা মঙ্গলজনক হয়েছে, যতটা খৃস্টধর্মের জন্য হয়েছে সম্রাট কন্তুন্তীন ও সিনেটপাল। খৃস্টধর্মের এই ইলহামী বা আল্লাহ প্রদত্ত দ্যুতি অঙ্গার হয়ে যাওয়ার পর গীর্জার পোপ-পাদ্রীরা ধর্মীয় সম্মেলন অনুষ্ঠান করে সেখানে কর্পূরের প্রদীপ জ্বেলে শত শত বছর সৎ বিশ্বাসী খৃস্ট বিশ্বকে আশ্বস্থ ও নিশ্চিন্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে যে, হযরত ঈসা আ. -এর আনীত হেদায়াত ও আলোর প্রদীপ তাদের কাছে বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই আলো প্রকৃতপক্ষে শত শত বছর পূর্বে ঘোর অন্ধকারের অতল গহ্বরে হারিয়ে গিয়েছিল।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.

"তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যে লোক কোথাও আগুন জ্বালাল। আর তার চতুপার্শ্বের সব কিছুকে যখন আগুন স্পষ্ট করে তুলল, ঠিক এমনই সময় আল্লাহ তার চারদিকের আলো উঠিয়ে নিলেন এবং তাদেরকে অন্ধকার ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পায় না।" (সূরা বাকারা-১৭)

এতদসত্ত্বেও অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, খৃস্ট ধর্মের বদৌলতে পশ্চিমা জগতে আল্লাহর বিশ্বাস এবং পরকালের চিন্তাভাবনা পাওয়া যেত। বাস্তবে আসমানী ধর্ম যতটাই বিকৃত হয়ে যাক, আল্লাহ এবং পরকালীন ভাবনা শিরা-উপশিরায় এমনভাবে বিরাজমান ছিল যে, কখনও তা থেকে বের হওয়া সম্ভব হত না। পনের ও ষোল শতকে ইউরোপে জ্ঞানপূজারী আদতে মূলতঃ প্রবৃত্তি পূজা ও বস্তুবাদে যে জোয়ার সৃষ্টি হয়, তা পশ্চিমা বিশ্বকে প্রকাশ্যে খোলামেলা বস্তুবাদের দিকে ধাবিত করে।

ক্রমান্বয়ে ইউরোপ এমন বস্তুবাদী হয়ে যায় যে, তাদের জীবন এবং মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারায় মোটেও আল্লাহ তা'আলা এবং পরকালীন ভাবনার অবকাশ বাকী থাকেনি। গোটা ইউরোপ সরাসরি নিজ মুখে আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করেনি বটে। কিন্তু তাদের জীবনধারা এমনভাবে বদলে যায়, যেন না আছে আল্লাহ; না পরকাল! আজ নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ইউরোপের ধর্ম খৃস্টবাদ বা ঈসায়ী নয় বরং বস্তুবাদ। ইউরোপ দীর্ঘকাল পর্যন্ত পৌত্তলিক ছিল। আর এখন দীর্ঘকাল ধরে খৃস্টধর্মের দাবীদার। কিন্তু তারা এই একাগ্রতা ও আবেগ-আগ্রহের সাথে নিজের এমন আকর্ষণ ও প্রণয়াসক্তি প্রকাশ করেছে এবং এ কঠিনভাবে তার অনুসরণ করেছে, যেরূপ বস্তুবাদের এ ধর্মের সাথে তাদের থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। এই নতুন ধর্মের উপাসনালয় ও গীর্জাগুলো (কল-কারখানা, শিল্প-কারিগরি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং পর্যটন কেন্দ্রগুলো) দিনরাত জনাকীর্ণ। এ ধর্মের পোপ-পুরোহিতের (বড় বড় ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, শিল্পপতি) বড় সম্মানের চোখে দেখা হয় এবং তাদের পূজা করা হয়। পক্ষান্তরে খৃস্টধর্ম ইউরোপে এক ছায়ামূর্তি হয়ে আছে।

পশ্চিমা বিশ্বে এই আত্মবিস্মৃতির এমন সব কুফল প্রকাশ পেয়েছে এবং প্রকাশ পাচ্ছে, যা এই চিন্তাধারা এবং চরিত্র সভ্যতার অনিবার্য পরিণতি। একটি কুফল হচ্ছে, পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ একত্ববাদ ও এক খোদার আঁচল ছেড়ে বহুত্ববাদ ও অসংখ্য খোদার আঁচল জড়িয়ে ধরেছে। এক বাস্তবিক ধনাগার থেকে মাথা উঠিয়ে যেখানে মাথা নত করে, সেসব ধনাগার থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারত, আজ যে কোনও তালাবদ্ধ বন্ধুর ধনাগারে কপাল ঠুকছে। এক আল্লাহকে ছেড়ে দেওয়ার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে সব সময়ই এরূপই হয়। গাইরুল্লাহর বিশ্বাসী এরূপ লোক পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গোটা পশ্চিমা বিশ্ব তাদের অবৈধ দখলের থাবায় বন্দি। এরা কোথাও রাজনৈতিক নেতা, কোথাও অর্থনৈতিক দেবতা, কোথাও তাদের নির্বাচিত জীবন দর্শন, কোথাও নিজের তৈরী আইন-কানুন ও জীবন পদ্ধতি, যা তার পূজারীদের জীবনযাত্রাকে ত্যক্ত বিরক্ত করে রেখেছে। তাদের দ্বারা এমনভাবে দাসত্ব করাচ্ছে, যার সম্মুখে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীর হাজার

মূল্য দিতে হবে। এমন কঠিন শ্রম নিচ্ছে, যা বোবা প্রাণী ও নিষ্প্রাণ মেশিন থেকেও নেওয়া হয় না। এমন ত্যাগ স্বীকারে বাধ্য করছে, যা অদ্যাবধি কোন দেবতার নামে করা হয়নি। এসব আল্লাহ বিমুখ বহুত্ববাদী লোকদের উদ্দেশ্য-চাহিদায় চরম সংঘাত ও টানাপোড়েন রয়েছে। তাদের বিপরীতমুখী ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার কারণে গোটা বিশ্ব উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। তাদের মাঝে দেশের মাটিও একটি বড় ভূত। যা সর্বদা রক্তের নযরানা এবং মানবীয় জীবন ভেট চায়। তাদের আরেকটি ভূত পেট। যার পূজায় বিংশ শতাব্দীর মানুষগুলো অহর্নিশ ডুবে থাকে। কিন্তু তারপরও সে তার উপর সন্তুষ্ট হয় না। কিছুকাল পূর্ব স্যার এলভাব লাজ তার এক ভাষণে বলেছিলেন, "সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন যাপন এখন স্বপ্ন ও উপাখ্যান হয়ে গেছে। আজ না কোন উদ্দেশ্য সামনে আছে, না কোন উঁচু চিন্তাভাবনা আছে। প্রত্যেক মানুষ রাতদিন ষাড়-বলদের মত নিজের কলকারখানা কিংবা অফিসের গোলামীতে ব্যস্ত। দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন আবিষ্কারের লে আজ প্রতি মুহূর্ত সকল মানুষের মাথায় শনির দশা লেগে থাকে বা শনি ভর করে থাকে।"

আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যাওয়া ও বিস্মৃত হওয়ার দ্বিতীয় পরিণতি হচ্ছে, মানুষ স্বয়ং আত্মবিস্মৃত হয়ে গেছে। কুরআন মাজীদ এই চিরন্তন বাস্তবতার বর্ণনা দিয়ে বলেছে, আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার পরিণাম আত্মবিস্মৃতি। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ

"তোমরা সেসব লোকদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন।" (সূরা হাশর- ১৯)

বিংশ শতকের (বর্তমানে আরও বেশি) মানুষ আত্মবিস্মৃতির পূর্ণাঙ্গ উপমা। এই আত্মবিস্মৃতি মানুষকে নিজের বাস্তবতা, মানবীয় বৈশিষ্ট্য, জীবনের লক্ষ্য এবং তার জন্ম-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভুলিয়ে দিয়েছে। আজ মানুষ পুরোপুরি পৈশাচিক কিংবা জড়বাদী জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। সে এমন এক মুদ্রা তৈরীর মেশিন হয়ে গেছে, যে স্বয়ং মুদ্রা দ্বারা কোন উপকার লাভ করতে পারে না। অবস্থা এমন যে শারীরিক আরাম ও মনের সুখ-শান্তি এই চেষ্টা-সংগ্রামের কোনও অর্থে মূল্যবান হতে পারে, তা তার জীবনে নেই, আর না তার এর কোনও অনুভূতি অবশিষ্ট আছে। প্রফেসর জেভিট যথার্থই বলেছেন, "আমাদের যুগের সমাজের যে হালচিত্র, তাতে আমাদের বিশ্বাস হল, দ্রুততার নামই সভ্যতা। এই দ্রুততা বর্তমান যুগের যুবক শ্রেণীর দেবতা। তার আস্তানায় সে সুখ-শান্তি, নিরাপত্তা আর অন্যের সাথে দয়া-মহানুভবতাকে চরম নির্দয়তার সাথে ভেট চাপিয়ে দেয়।"

এই বিশ্ব আত্মবিস্মৃতি ও উন্মাদনায় মানুষের বিষয়বস্তুই পাল্টে দিয়েছে। সে তার নিজের উন্নতির সীমানা ছেড়ে উন্নতির অন্যান্য সীমানায় বড় উন্নতি সাধন করে ফেলেছে। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে সে কোন উন্নতি লাভ করেনি বরং দিন দিন তার মানবীয় গুণ-বৈশিষ্ট্যে অধঃপতন আসছে। বর্তমান উন্নতির প্রতি লক্ষ্য করুন! কিছু হিংস্র পশুর যোগ্যতা-দক্ষতা প্রকাশ পাবে। কিছু পাখির, কিছু মৎসের। জনৈক পশ্চিমা লেখক এই বাস্তব সত্যকে সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের বিস্ময়কর শিল্প বিপ্লব এবং আমাদের চরম লজ্জাজনক চারিত্রিক শিশুসুলভতার মাঝে যে পার্থক্য, তার সাথে আমাদের জীবনের প্রতিটি মোড়ে মোড়ে জড়াতে হয়। একদিকে আমাদের শিল্প-কারিগরি উন্নতির অবস্থা হল, আমরা বসে বসে সমুদ্র তীর থেকে এবং এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশের লোকদের সাথে অনায়াসে কথা বলতে পারি। সমুদ্রের উপরে এবং ভূগর্ভে দৌঁড়াতে পারি। স্যালুন বা হোটেলকক্ষে বসে লন্ডনের বিগ বেন (বড় ঘণ্টা) এর শব্দ শোনা যায় রেডিওয়ের মাধ্যমে। শিশু বাচ্চা টেলিফোনের মাধ্যমে অন্যের সাথে কথা বলে। বৈদ্যুতিক ছবি আসছে। নীরব টাইপ রাইটার চলে এসেছে। কোনও প্রকার কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া দাঁত উপড়ে ফেলা যায়। বিদ্যুতের সাহায্যে ফসল পাকানো যায়। পরিশ্রমের দ্বারা মহাসড়ক হয়ে যায়। এক্সরে-এর সাহায্যে আমরা আমাদের শরীরের ভিতরের অংশ চুপিসারে দেখতে পারি। ছবি কথা বলে, গান করে। لاسلکی লাসকীর সাহায্যে অপরাধী ও হত্যাকারীদের অনুসন্ধান করা যায়। সামুদ্রিক জাহাজ উত্তর মেরু পর্যন্ত আর উড়োজাহাজ দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত উড়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আজ আমাদের দ্বারা এতটুকু সম্ভব হয় না যে, আমরা আমাদের বড় বড় শহরগুলোতে এমন কোনও মাঠ বানিয়ে দেব, যেখানে দুঃস্থ-গরীবদের শিশুরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে খেলাধুলা করবে। এর পরিণামে আজ বছরে দুই হাজার শিশুর জীবন অকালে ঝরে পড়ে। আর আহত হয় নব্বই হাজার। একবার আমি জনৈক ভারতীয় দার্শনিকের সঙ্গে আমাদের সভ্যতার বিস্ময়কর বস্তুগুলোর প্রশংসা করছিলাম। সে যুগে জনৈক গাড়ী চালক তিনশ' বা চারশ' মাইল পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করে রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। অথবা কোনও পাইলট মস্কো থেকে নিউইয়র্কের পথ আমার স্মরণ নেই বিশ কি পঞ্চাশ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিল। আমি যখন সব কথা বলে শেষ করলাম, তখন ঐ হিন্দুস্তানী দার্শনিক আমাকে বললেন– হ্যাঁ। একথা সঠিক যে, তোমরা বাতাসে পাখির মত উড়তে পার, পানিতে মাছের মত সাতার কাটতে পার। কিন্তু তোমরা এখনও মাটির উপরে মানুষের মত চলতে পার না।"

এই আত্মবিস্মৃতির জগতে পশ্চিমাদের উপর আল্লাহ বিস্মৃতির অভিযোগ আনাই অনর্থক। তারা তো আল্লামা ইকবাল (র) এর নিম্নোক্ত ছন্দের যোগ্যপাত্র–

زخود گریختی، آشنا چہ می جوئی
بہ آدمی نہ رسیدی، خدا چہ می جوئی؟

"পালালো যে নিজ হতে ভাই
খুঁজিবে কি সে বন্ধু স্বজন,
লোকালয়েই তো ভীড়ে না সে
কোথায় তার চিরমহাজন।"

এবার পশ্চিমা বিশ্বের পরকাল বিমুখতা ও পরকাল বিস্মৃতির কথা শুনুন। পরকাল অস্বীকারের প্রথম এবং স্বভাবজাত কুফল হচ্ছে, আজ এ কারণে তাদের মাঝে পার্থিব জীবন এবং জাগতিক বস্তু সামগ্রীর স্বাদ ও ভোগের এক উন্মত্ততা ও জোয়ার সৃষ্টি হয়ে গেছে। ভোগ-বিলাসই জীবনের লক্ষ্যস্থির হয়েছে। তাদের গোটা জীবন ভোগ-বিলাস এবং তার উপায়-উপকরণ হাসিলের প্রতিযোগিতায় ব্যয় হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা জীবনকে এমন এক রেসকোর্স বানিয়ে দিয়েছে, যার কোনও প্রান্তসীমা নেই। সেখানে আজ চতুর্দিক থেকে মদ্যপান ও নৃত্য-গানের আওয়াজ এবং ভোগ-বিলাসের শ্লোগান প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই প্রতিযোগিতা জীবনের এক অনিস্প্রভ পিপাসা এবং অতৃপ্ত ক্ষুধা। প্রতিটি মানুষের মুখে هل من مزيد (আরও কি আছে?) এর নিনাদ। জীবনের চাহিদা-প্রয়োজন দিনদিন বেড়েই চলেছে। আর তা শত শত সামাজিক ও জাতীয় সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করেছে। ব্যবসাসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা এতে আরও মদদ যুগিয়েছে। জীবনযাত্রার মান দিন দিন বাড়ছে। এমনকি কেউ চোখ উঠিয়ে তাকালে তার কাছে আসল গন্তব্য অনেক দূরে আর মিছে খোয়াবগুলোকে অনেক সন্নিকটে মনে হয়। ফলশ্রুতিতে এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সে গন্তব্য পৌঁছুতে কিংবা তা অর্জনের প্রত্যাশা ও প্রচেষ্টায় তার জীবন নিরাসক্ত, বিস্বাদ ও বিরক্ত হয়ে যায়। সে লোভ-লালসার এক নিয়মিত আযাব এবং জীবনের সীমাহীন চেষ্টা-সংগ্রামে ডুবে থাকে। যে ধৈর্য ও অল্পে তুষ্টি মনের সুখ ও প্রশান্তির সবচেয়ে উপায় ছিল, তা ইউরোপ থেকে বহু আগে বিলীন হয়ে গেছে।

পরকালকে অস্বীকার ও ভুলে যাওয়ার পর যে স্বাদ ও ভোগ-বিলাসকে আমরা মুসলমান উন্মাদনা মনে করি, পরকাল অস্বীকারকারীদের দৃষ্টিতে তা-ই মূল উন্নতি। যে ব্যক্তি এ জীবনের পর আরেক জীবনের ভাবনামুক্ত, সে কেন এই জীবনের স্বাদ আস্বাদনে এবং মনোবাসনার আগুন নেভাতে ত্রুটি করবে আর কোনদিনের জন্য ভোগ-বিলাসকে অবদমিত রাখবে? কাজেই কুরআন মজীদ ঘোষণা করছে-

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.

"আর যারা কাফির, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুস্পদ জন্তুর মত আহার করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নামে।" (সূরা মুহাম্মাদ- ১২)

ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ.

"আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিত, ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতিসত্ত্বর তারা জেনে নেবে।" (সূরা হিজর- ৩)

اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ.

"যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের দৃষ্টিতে কর্মকাণ্ডকে সুশোভিত করে দিয়েছি, অতএব তারা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াক।" (সূরা নমল- ৪)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا. اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.

"বলুন! আমি কি তোমাদেরক সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্থ। তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়, অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নির্দেশনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামত দিবসে আমি তাদের জন্য কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (সূরা কাহ্‌ফ- ১০৩-১০৫)

এর আরেকটি অনিবার্য পরিণতি হল, জীবনে বাস্তবতা ও বুদ্ধিমত্তার অংশ ও গুরুত্ব কম আর ক্রীড়া-কৌতুকের অংশ বেড়ে যায়। জীবনের বিরাট এক অংশ আনন্দ-উল্লাস, ক্রীড়া-কৌতুক ও আমোদ-প্রমোদের কাজ ও ব্যস্ততা ঘিরে রেখেছে। চরম স্পর্শকাতর ও ভয়াবহ মুহূর্তেও তাদের এই আনন্দ-বিনোদনমূলক ব্যস্ততা এবং উৎসব আমেজে কোনও প্রভাব পড়ে না।

وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَهُمْ لَعِبًا وَّلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا.....

"তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে।"

(সূরা আনআম- ৭০)

এর আরেকটি পরিণতি হচ্ছে, দুর্ঘটনা ও ট্রাজেডির প্রকৃত কারণ ও রহস্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না বরং কিছু বাহ্যিক বিষয়ে তারা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে। তারা কোন বিষয়ের বা কর্মকাণ্ডের নেপথ্যে ও গভীরে পৌঁছতে পারে না। ফলশ্রুতিতে চরম স্পর্শকাতর অবস্থায়ও তাদের আনন্দ উৎসব মত্ততায় এবং উদাসীনতায় ঘাটতি হয় না। তারা সেসব ঘটনাবলির

কোন কাল্পনিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দেয়। সে সবের কোন কাল্পনিক ও অবাস্তবিক কারণ অনুসন্ধান করেই নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আদৌ কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে না। কুরআনে কারীমে বস্তুবাদী ও জড়বাদী জাতিসমূহের মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

"আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। এরপর আমি তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা কাকুতি-মিনতি করে। অনন্তর তাদের কাছে যখন আমার আযাব আসল, তখন কেন কাকুতি মিনতি করল না? বস্তুতঃ তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করেছিল।" (সূরা আনআম– ৪২,৪৩)

পরকাল অস্বীকারের একটি বৈশিষ্ট্য অহংকার। এদের সামনের অহংকারী-আত্মম্ভরী হওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু অন্তরায় বা বাঁধা হয় না। সে তার চেয়ে বড় কোনও শক্তি এবং এ জীবনের পর আরও কোন জীবন ও বিনিময় দিবসের বিশ্বাস রাখে না। তাকে এক নির্বিঘ্ন উট ও দাম্ভিক মানুষ হওয়া থেকে কে ফিরাতে পারে? কাজেই কুরআনে পরকাল অস্বীকারের প্রায় স্থানেই অহংকারের আলোচনা করা হয়েছে। যেন এ দু'টি বিষয় পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ.

"অনন্তর যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে।" (সূরা নাহল– ২২)

وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ.

"ফেরাউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।" (সূরা কাসাস– ৩৯)

وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.

"যখন তোমরা কারও উপর আঘাত হান, তখন তোমরা জালিম ও নিষ্ঠুরের মত আঘাত হান।" (সূরা শুআরা– ১৩০)

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً.

"…. রাজা-বাদশারা যখন কোনও জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে।" (সূরা নামল- ৩৪)

অনুরূপভাবে পশ্চিমা বিশ্ব ঈমান বিল কুরআন তথা আল্লাহ তা'আলার বাণী কুরআনের উপর ঈমান আনয়নের দৌলত থেকেও তারা বঞ্চিত হয়। হযরত ঈসা আ. কে যদিও তারা 'আল্লাহর পুত্র' (!) স্বীকার করেছে। কিন্তু তাকে নিজেদের গোটা জীবনের পথপ্রদর্শক এবং অনুসৃত রাসূল হিসেবে কার্যতঃ স্বীকার করেনি। প্রথমে ব্যাপারখানা একটি চিন্তাগত ও বিশ্বাসগত ছিল। তা মেনে নিলে জীবনযাত্রা এবং আমল আখলাখে কোনও প্রভাব পড়ত না। কিন্তু তাঁকে স্বীয় জীবনের পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক, তাঁর জীবন চরিতকে আপন জীবনের আলোকবর্তিকা এবং তাঁকে নিজের জন্য উত্তম আদর্শ মেনে নিলে জীবনের মোড় ঘুরে যেত। কিন্তু পশ্চিমা গোষ্ঠী তা করেনি। আর না এরূপ করা সহজসাধ্য ছিল। হযরত ঈসা আ. -এর জীবনের মাত্র তিন বছরের অবস্থাচিত্র তাদের কাছে ছিল। আর তা-ও এমন যে, বাস্তব জীবনে তার অনুসরণ-অনুকরণ করা ছিল বড় মুশকিলের ব্যাপার। পাশ্চাত্যবাসী যদি হযরত ঈসা আ. এর জীবনকর্ম ও কথা এবং তার হেদায়াত ও শিক্ষাকে আপন জীবনের আদর্শ আলো বানাত, তাহলে তাদের জন্য এতে কার্যতঃ কষ্ট ক্লেশ ছিল। খৃস্টধর্মের নেতা ও রাহবারদের কাছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় মূলধন ছিল না, যার সাহায্যে তারা পূর্ণ একটি জাতিকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার মত দায়িত্ব পালন করতে পারে। না তারা ধর্মীয় জ্ঞানে এমন ব্যুৎপত্তি-বিচক্ষণতা রাখত, যার মাধ্যমে তারা পাশ্চাত্যের নতুন প্রজন্মকে পার্থিব উন্নতির সাথে ধর্মীয় সীমানায় আগলে রাখতে পারে। যার ফলে খৃস্টজাতিগুলো তাদের ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনকে হযরত ঈসা আ. এর নেতৃত্ব এবং গীর্জার তত্ত্বাবধায়ক থেকে মুক্ত করে নেয়। অনন্তর এমনভাবে জীবন যাপন শুরু করে দেয়, যেন তারা আদৌ কোন নবী-রাসূলের উম্মত নয়। তাদের মন-মগজে হযরত ঈসা আ. এর নিষ্পাপ শিক্ষার গভীর প্রভাব পড়তে পারেনি। তারা সেই চারিত্রিক দীক্ষা, আত্মশুদ্ধি ও পবিত্র জীবন যাপন থেকে বঞ্চিত ছিল, যা নবীর অনুসারীগণ হাসিল করে। তারা আসবাবপত্র ও জীবনোপকরণ প্রচুর অর্জন করেছে। কিন্তু সৎ বাসনা, কল্যাণ ও পূণ্যের আগ্রহ কেবল নবীর শিক্ষার প্রভাব এবং তার দীক্ষা ও সংশোধনীর মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। বৈষয়িক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কারসমূহে তা অর্জিত হওয়ার ছিল না। আর না তাদের অর্জিত হয়েছে। পরিণামে এ সকল উপায় উপকরণ এবং শক্তি, যা মঙ্গলকামিতার সাথে বিশ্ব মানবের উন্নতি-সমৃদ্ধির কারণ হতে পারত, আজ তা পৃথিবী আধিপত্য বিস্তার, সাম্রাজ্যবাদিতার এবং

বিপর্যয় ও ত্রাস সৃষ্টির হাতিয়ার হয়ে গেছে। কারণ, এসবের ব্যবহারকারীদের কর্ণকুহরে কুরআনের এই আওয়াজ পৌঁছে না–

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.

"এ পরকাল আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আল্লাহভীরুদের জন্য শুভ পরিণাম।" (সূরা কাসাস– ৮৩)

এই আল্লাহ বিস্মৃতি, পরকাল বিস্তৃতি এবং নবী রাসূলগণের শিক্ষাদীক্ষা থেকে অমুখাপেক্ষিতা ও আত্মম্ভরিতার পরিণতি হল, আজ পশ্চিমা বিশ্ব এতটাই আলোকিত যে, তাদের রাতও দিন। কিন্তু আবার এত অন্ধকারাচ্ছন্ন যে, দিনও রাত। আলো এবং উন্নতির এ যুগেও তাদের মাঝে আজ এমন সব কর্মকাণ্ড প্রকাশ পায়, যেগুলো হিংস্রতা, বর্বরতা ও জংলী যুগের সাথে বিশেষিত মনে করা হয়। মরহুম আকবর এলাহাবাদী যথার্থই বলেছেন–

لکھے گا کلک حسرت دنیا کی ہسٹری میں
اندھیر ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں

"কঞ্চি কী লিখবে! আফসোস! পৃথিবী ইতিহাসে,
বিদ্যুৎ আলোয় অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছিল"

বিগত যুদ্ধের শেষে মিস্টার লয়েড বলেছিলেন, "যদি হযরত ঈসা মসীহ আ. এ দুনিয়ায় ফিরে আসেন, তাহলে বেশিদিন বাঁচতে পারবেন না। তিনি দেখতে পাবেন, দুই হাজার বছর পরও মানুষ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যা-লুটতরাজের মধ্যে যথারীতি লিপ্ত আছে বরং এখন তো মানবতার শরীর থেকে ইতিহাসের মহাযুদ্ধের প্রভাবে রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ছে। আর পৃথিবীটা এতই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, দুর্ভিক্ষদশা দেখা দিয়েছে, তিনি এসে কি দেখবেন? মানুষ কি ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যতার সাথে পরস্পর হাত মিলায়, করমর্দন করে, নাকি এর সম্পূর্ণ বিপরীত? এই বিশ্বযুদ্ধ অপেক্ষা আরও ধ্বংসাত্মক ও বিভীষিকাময় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। একজন থেকে আরেকজন আরও এগিয়ে যন্ত্রণাদায়ক ও মানবতাবিধ্বংসী মারণাস্ত্র আবিস্কার করছে এবং নির্যাতন ও নৃশংসতার নতুন নতুন পদ্ধতি চিন্তা করছে।"

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে মিস্টার এ্যাডেন বলেছিলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু করা যাবে এবং সংবাদ নেওয়া যাবে, এই পৃথিবীর অধিবাসীরা এ শতকের পূর্বে গিরিগুহায় বসবাসকারী দুনিয়ার আদিম বন্যদের জীবন পদ্ধতি

অবলম্বন করবে এবং সেই হিংস্র ও বর্বরতার যুগ শুরু হয়ে যাবে, যা হাজার হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে চালু ছিল। কত বিস্ময়ের ব্যাপার! সকল রাষ্ট্র এমন এক অস্ত্র থেকে বাঁচার জন্য কোটি কোটি ডলার খরচ করছে, যা নিয়ে সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত। অথচ তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে কেউ সম্মত হয় না। মাঝে মধ্যে অবাক বিস্ময়ে ভাবি, যদি অন্য কোনও গ্রহ থেকে কোনও পর্যটক ও দর্শনার্থী এই মাটিতে আসে তাহলে আমাদের এই পৃথিবীকে দেখে সে কী বলবে? সে দেখতে পাবে, আমরা সকলে নিজেরই ধ্বংস ও বিনাশের হাতিয়ার তৈরী করছি। হাস্যকর বিষয় হল, একে অপরকে এর ব্যবহার কৌশলের তথ্য-সংবাদও দিচ্ছে। আজ থেকে সাড়ে তের শ' (এ প্রবন্ধ রচনার সময় থেকে) বছর পূর্বের সভ্য দুনিয়া, যার নেতৃত্ব রোম-পারস্যের পশ্চিমা সম্রাট-শাসকবর্গের হাতে ছিল, আজকের পৃথিবী থেকে অনেক বেশি সামাজিক ছিল। মানুষ পুরোপুরিভাবে আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস এক ঐতিহাসিক চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞান থেকে বেশি কিছু ছিল না। মানুষ কেবল ঐতিহাসিকভাবে স্বীকার করত যে, এই বিশ্বজগতকে কোন কালে আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন-

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ.

(তুমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা কর, আকাশ-মাটি কে সৃষ্টি করেছে? তারা বলবে– আল্লাহ!)

কিন্তু বাস্তব জীবনের কোন সম্পর্ক এর সাথে অবশিষ্ট ছিল না। কার্যতঃ এমনভাবে জীবনযাপন করছিল, যেন কোনও আল্লাহ (সৃষ্টিকর্তা) নেই। কিংবা আছে বটে, কিন্তু তিনি (মাআযাল্লাহ) নির্জনাবাসে আছেন এবং অন্যদের কারণে রাজত্ব অব্যাহতি গ্রহণ করেছেন। গোটা পৃথিবীতে গাইরুল্লাহবাদীদের দাসত্ব ও পূজা-অর্চনার জাল বিস্তৃত ছিল। কোথাও প্রতিমা পূজা চলত। কোথাও বংশ গোত্রের, কোথাও লোভ-লালসার, কোথাও শক্তি ও নেতৃত্বের, সম্রাট-শাসকবর্গের। আবার কোথাও পোপ-পাদ্রীদের (আলেম ও আবেদদের)। মানুষ তার জীবনে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তার আদি-অন্ত সবকিছু ভুলে গিয়েছিল। জীবনের সঠিক ব্যস্ততা ভুলে ক্রমাগত আত্মহনন ও ভ্রান্ত ব্যস্ততম অবস্থা বিরাজ করছিল। শাসক গোষ্ঠী লিপ্ত ছিল জুলুম-শোষণ, নিষ্ঠুরতা, দখলদারিত্ব, মানুষকে কষ্ট দেওয়া, সম্পদ আত্মস্যাৎ করা ইত্যাদিতে। আমীর-উমারাগণ ভোগ-বিলাসে বিভোর মত্ত ছিল। জীবন যাত্রা এত উন্নত এবং জীবনের আবশ্যকীয় জিনিস এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে, নতুন নতুন ট্যাক্স, জরিমানা ও জুলুম-শোষণেও তা পূরণ হত না। জীবনকালের মান ও জীবন ভাবনা এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, বিত্তশালিতা ও নেতৃত্বের

উপকরণগুলো যার কাছে না থাকত, তাকে মানুষই মনে করা হত না। সমাজে-পার্টিতে তার সাথে মানুষের মত ব্যবহার করা হত না, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং সমসাময়িকদের মাঝে সম্মানী ও অভিজাত হওয়ার ভাবনায় প্রতিটি মানুষ সদাসর্বদা একই চিন্তা ও অস্থিরতায় যন্ত্রণাদগ্ধ হতে থাকত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকজন উঁচু শ্রেণীর লোকদের ভাঁড়ামো ও ঘোড়দৌড় থেকে অবকাশ পেত না। গরীব-অসহায় লোকদের 'জ্বী হুজুর', গোলামী ও নতুন নতুন ট্যাক্সের বোঝা থেকে মাথা উঠানোর সুযোগ হত না। তারা স্বীয় মনিবের আরাম-আয়েশ এবং তাদের বৈধ-অবৈধ ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বোবা জীবজন্তুর মত সদাসর্বদা হাল বয়ে যেত। কখনও যদি এ থেকে সামান্য অবকাশ পেত, তাহলে জীবনের দুঃখ ভোলার জন্য অবৈধ চিত্তবিনোদন ও উন্মাদনায় মন ভাসিয়ে দিত। সময় সময় সারা দেশেও একজন মানুষ এমন খুঁজে পাওয়া যেত না, যার মধ্যে স্বীয় দ্বীন-ধর্ম ও পরকালের চিন্তাভাবনা আছে এবং মৃত্যুর কথা স্মরণ করে। নিষ্পাপ শহরবাসী রাষ্ট্রক্ষমতার মোহ এবং আধিপত্য বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চাকার দু' পাটার মাঝে পিষ্ট হতে থাকে। ইরানী রাজত্ব যৌক্তিক কোন কারণ এবং প্রয়োজন ছাড়াই সিরিয়ার খৃস্ট রাজ্যের উপর সামরিক হামলা চালিয়েছে। নব্বই হাজার নিরাপরাধ মানুষের রক্তে আল্লাহর এ জমীন রঞ্জিত করেছে। এর জবাবে রোম সাম্রাজ্য পারস্য (ইরান সাম্রাজ্য) কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় এবং শান্তিপ্রিয় শহরবাসীর প্রতিশোধ শান্তিপ্রিয় নিরাপদ শহরবাসী থেকে নেয়। বৃহত্তর কোন উদ্দেশ্য এবং চারিত্রিক মহোদ্যম ছাড়াই এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ক্রমধারা বছরের পর বছর চলতে থাকে। পৃথিবীর দুই সভ্য সাম্রাজ্যের অধিবাসী এবং অতি ভদ্র-কৃষ্টিমনা মানুষ হিংস্র দাঁতাল বন্যদের মত একে অপরের সাথে অহিনকুল ও দা-কুমড়ো হয়ে থাকে। সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের উপর সে সময় অন্ধকার ছেয়েছিল। মানুষ অপকর্ম ও পাপাচারের কারণে এক বিশ্বব্যাপী বিশৃংখলা এবং চতুর্মুখী ধ্বংস ছড়িয়ে পড়েছিল।

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.

"স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুণ বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে।" (সূরা রূম : ৪১)

সে সময় এই সভ্য পৃথিবী (যাতে পুরোপুরি ঘুনে ধরেছিল) থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু তার একেবারে সন্নিকটে এবং ঐ দুই প্রতিপক্ষ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাম্রাজ্যের মাঝামাঝি আল্লাহ তা'আলা উম্মী (অক্ষরজ্ঞান শূন্য) লোকদের মাঝে এক উম্মী নবী প্রেরণ করেন। যেন তিনি দুনিয়াকে সেই মহা আযাব থেকে মুক্তি এনে দেন, যাতে তারা শত শত বছর ধরে নিমজ্জিত ছিল। আর

যেন পরকালের সেই আযাব সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেন, যা অবশ্যম্ভাবী। সর্বপ্রকার অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহর ইবাদতে নিবিষ্ট করান, যেন কেটে দেন, সেসব জিঞ্জির ও বেড়ি, যাতে তারা আবদ্ধ ছিল।

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

"তিনি তাদেরকে নির্দেশ দেন সৎকর্মের, বারণ করেন অসৎকর্ম থেকে; তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন আর নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তুসমূহ এবং তাদের উপর থেকে সে বোঝা নামিয়ে দেন এবং বন্দিত্ব অপসারণ করেন, যা তাদের উপর বিদ্যমান ছিল।" (সূরা আরাফ : ১৫৭)

এই উম্মী নবী (সা) সপ্তম হিজরীতে (৬৩০ খৃ.) রোম সম্রাট (হিরাকল) কে মদীনা থেকে একটি চিঠি ও বার্তা পাঠান। দাওয়াত ছিল নিম্নরূপ–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

"হে আহলে কিতাব! এমন একটি বিষয়ের দিকে এসো, যা আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে সমান- আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না, তার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না।" (সূরা আলে ইমরান : ৬৪)

হিরাকল এই দাওয়াতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়। কিন্তু সে নিজের দুর্বলতার কারণে ঐ পালনকর্তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি, যার দ্বারা সে ফায়দা লুটছিল ও সুবিধা ভোগ করছিল। এভাবে রোমবাসী জীবনের এই আযাব থেকে ততক্ষণ মুক্তি লাভ করতে পারেনি, যতদিন না মুসলমান নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদগণ সিরিয়া রোমের দেশগুলোকে তাদের রহমতের ছায়াতলে এনেছেন।

কিন্তু আরবের অসহায় জাতি উম্মী নবী (সা) -এর পয়গাম কবুল করে নেয়। আর তারা সর্বপ্রকার নেয়ামতের ভাণ্ডার লাভ করে, যা ছিল ঐ পয়গামের সুফল। তাদের গোলামীর জিঞ্জিরগুলো আপনা আপনি ছিড়ে যায়। তারা এক আল্লাহর আস্তানায় মাথা নত করে দুনিয়ার সকল আস্তানা-ধনাগার থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়। আজ তাদের মাঝে না রইল প্রবৃত্তি পূজা, না আছে রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গের গোলামী, না কুসংস্কারাচ্ছন্ন রুসম-রেওয়াজ, না গোত্র ও সমাজের সাবেক নির্মম বন্দিত্ব-বাধ্যবাধকতা, না নিজের আনীত কিংবা অন্যের দেওয়া দুঃখ-যাতনা। আল্লাহকে চেনা এবং আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্বের জ্ঞান দুনিয়ার মনগড়া বিচিত্র খোদার ভেল্কিবাজি ভেঙ্গে দেয় এবং সেগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে নিচে নামিয়ে দেয়। আরবের এই দরিদ্র, ছেঁড়া ফাঁটা ও মোটা

জামা পরিহিত বেদুঈন, যে তার মরুভূমি ও উপত্যকা থেকে কখনও বাইরে বের হত না, যারা জাঁকজমকের কোনও প্রদর্শনী দেখেনি, অনারব রাজা-বাদশাদের সাথে এমনভাবে চোখে চোখ রেখে নির্দ্বিধায় কথা বলত এবং তাদের দরবারী আড়ম্বরতাকে এমন ভ্রুক্ষেপহীনতা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত, যেন তা মাটির মূর্তি ও কাগজের খেলনা, যাদেরকে ঝাণ্ডা দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। তারা এমন বাস্তব ও সত্যপন্থী হয়ে গেল যে, বিত্ত-বৈভব ও প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রকাশ্য-প্রদর্শনীও তাদেরকে প্রভাবিত করত না, কখনও তারা নিজের উসূল, মূলনীতি ও উন্নত চরিত্র মাধুরী থেকে সামান্যও অবাধ্যতা-পথচ্যুতি পছন্দ করত না, তারা নিজেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে পুনরায় আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীকে নিমগ্ন করা এবং মানুষের খোদায়ীত্বের ভেল্কিবাজি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য আদিষ্ট ও প্রেরিত মনে করত।

হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. পারস্যবাসীর প্রধান সেনাপতি ও নেতা রুস্তমের আহ্বানে রিবঈ ইবনে আমেরকে দূত হিসেবে প্রেরণ করলেন। পারস্যবাসী অত্যন্ত আড়ম্বরতা ও দাপটের শাহী দরবার সাজাল। স্বর্ণের গালিচা ও রেশমের বিছানা বিছাল। ইয়াকুত ও আবরাদ মুক্তার দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যেত। স্থির থাকত না; রুস্তমের মাথায় ছিল স্বর্ণের মুকুট। শরীরে স্বর্ণখচিত পোশাক, স্বর্ণের চেয়ারে উপবিষ্ট সে। রিবঈ এমনভাবে শাহী দরবারে প্রবেশ করলেন যে, শরীরে তার মোটা ভারী কাপড়, হাতে ঢাল-তরবারী, রানের নিচে খর্বকায় ঘোড়া। তিনি এমন অমুখাপেক্ষিতার বেশে দরবারে এসে উপস্থিত হলেন।

ঘোড়া থেকে নেমে দরবারী উমারাদের একটি চেয়ারের সাথে ঘোড়াটি বেঁধে দিলেন। লৌহবর্ম পরে কোষবদ্ধ তরবারী হাতে দরবারে নেমে আসলেন। দারোয়ান বলল, হাতিয়ার রেখে যান। তিনি বললেন, আমি স্বেচ্ছায়, স্বআগ্রহে আসিনি। তোমাদের আহবানে এসেছি। আমার এভাবে আসা যদি তোমাদের মনঃপুত না হয়, তাহলে আমি ফিরে যাব। রুস্তম বলল, আসতে দাও তাকে। রিবঈ গালিচার উপর স্বীয় বর্শা ছুঁইয়ে এবং তাতে লাঠির মতো ভর করে এমনভাবে নির্দ্বিধায় সামনে এগিয়ে গেলেন যে, গালিচা স্থানে স্থানে কেটে ফেঁড়ে যায়। সেখানে গিয়েই রুস্তমের পাশে বসে গেলেন। রুস্তম জিজ্ঞাসা করল– তোমাদের এদেশে আসার উদ্দেশ্য কী? তিনি জবাবে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করেছেন যে, আমরা তার নির্দেশে তার বান্দাদেরকে বান্দাদের দাসত্ব ও বন্দেগী থেকে বের করে আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগীতে, দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে প্রশস্ততা ও প্রশান্তিতে, ধর্মীয় শোষণ-তোষণ রক্ষা করে ইসলামের সাম্য-ন্যায়

ও ইনসাফের মধ্যে দাখিল করব। তিনি আমাদেরকে তার মাখলুকের প্রতি তার দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন, যেন আমরা সে দ্বীন ও ধর্মের দাওয়াত দেই। যদি সে দাওয়াত কবুল করে, তাহলে আমরা ফিরে যাব আর যে তা অস্বীকার করবে, আমরা তার সাথে সর্বদা লড়াই করে যাব। এমনকি আমরা আল্লাহর পুরস্কার পেয়ে যাব। রুস্তম বলল– কী সে পুরস্কার? তিনি বললেন, যে এ রাস্তায় জীবন দিবে, তার জন্য জান্নাত আর যে বেঁচে থাকবে তার জন্য (আল্লাহর) সাহায্য। রুস্তম বলল, আমি আপনার কথা শুনেছি। আপনারা কি আমাদের এতটুকু অবকাশ দিতে পারেন, যাতে আমরা সাম্রাজ্যের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে নিতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনাদের কতদিনের সময় প্রয়োজন? একদিন, দুইদিন? রুস্তম বলল, এত অল্প সময়ে কী হবে? আমাকে চিঠিপত্র লিখতে হবে। মতামত জানাতে হবে। রিবঈ বললেন, রাসূলে কারীম (সা) শত্রুর মোকাবেলা করার সময় তিনদিনের বেশি অবকাশ দানের নযীর রেখে যাননি। কাজেই এ ব্যাপারে দ্রুত চিন্তাভাবনা করুন এবং তিনটি বিষয়ের (ইসলাম, কর বা ট্যাক্স প্রদান ও যুদ্ধ) কোন একটিকে বেছে নিন। রুস্তম বলল, আপনি কি মুসলমানদের নেতা? রিবঈ রাযি. বললেন, না। মুসলমান সবাই এক দেহ। তাঁদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ট বা নগণ্যেরও সর্বোচ্চ লোক বা নেতার মোকাবেলায় নিরাপত্তা দেওয়ার অধিকার আছে।

একবার দূত হিসেবে হযরত মুগীরা রাযি. সেখানে গেলেন। সেদিন রাজদরবারের চমক ছিল অভিনব। পারস্যবাসী তাদের আড়ম্বরতা, ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিত্ত-বৈভবের চূড়ান্ত দৃশ্যায়ন করেছিল। মুগীরা রাযি. কৃত্রিমতাবিহীন নিঃসঙ্কোচে সেনাপ্রধানের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং বৈঠকের প্রধান ও প্রধান সেনাপতি রুস্তমের হাঁটুতে হাঁটু মিলিয়ে বসলেন। পারস্যবাসী এ দৃশ্য পূর্বে কোথায় দেখেছিল! তারা ধৈর্যহারা হয়ে বাহু ধরে তাকে আসন থেকে নামিয়ে দিল। মুগীরা রাযি. বললেন, মেহমানের সাথে এরূপ আচরণ অনুচিৎ ছিল। আমাদের মাঝে এ ধরনের প্রথা নেই যে, এক ব্যক্তি খোদা হয়ে বসে যাবে আর সমস্ত লোক তার সম্মুখে বান্দা ও দাসদের মত দাঁড়িয়ে থাকবে। তাঁর এই দুঃসাহসী কথোপকথনের যখন ভাষান্তর করা হয়, তখন দরবারে নীরবতা ছেয়ে যায়, সকলেই স্বীকার করে, আমাদেরই ভুল ছিল।

এক রোমীয় রাজসভায় হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. দূত হয়ে গেলেন। দরবারে স্বর্ণনির্মিত গালিচা বিছানো ছিল। মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. মাটিতে বসে পড়লেন। বললেন, আমি এই বিছানা, যা গরীবদের হক মেরে তৈরী করা হয়েছে, তাতে বসতে চাই না। খৃস্টানরা বলল, আমরা তোমাদের সম্মান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা কী করতে পারি। স্বয়ং

তোমাদের নিজের ইজ্জতের ধারণা নেই। মু'আয রাযি. উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, তোমরা যাকে ইজ্জত মনে করছ, আমি এর তোয়াক্কা করি না। মাটিতে বসা যদি গোলামদের স্বভাবরীতি হয়, তাহলে আমার চেয়ে বড় আল্লাহর গোলাম আর কে হতে পারে? এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, মুসলমানদের মাঝে তোমার চেয়ে বড় কেউ আছে? মু'আয রাযি. বললেন, আশ্রয় আল্লাহর! এতটুকুই যথেষ্ট যে, আমি সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট না হই। রোমীরা তাদের সম্রাটের গৌরব করল। তিনি বললেন, তোমরা এতেই সন্তুষ্ট যে, তোমরা এমন রাজার প্রজা তোমাদের জানমাল যার ইচ্ছাধীন। কিন্তু আমরা যাকে আমাদের শাসক বানিয়ে রেখেছি, তিনি কোন বিষয়ে নিজে নিজেকে অগ্রাধিকার বা প্রাধান্য দিতে পারেন না। তিনি ব্যাভিচার করলে তাকে দোররা মারা হবে, চুরি করলে হাত কাটা হবে, তিনি পর্দার আড়ালে বসেন না। নিজে নিজেকে আমাদের চেয়ে বড় মনে করেন না। ধন-সম্পদে আমাদের উপর তার কোনও অগ্রাধিকার নেই।

এই মানসিক পরিবর্তন ও মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের ফলে– যা এক আল্লাহকে নিজের প্রকৃত উপাস্য ও প্রতিপালক মানার কারণে হয়েছে– তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে বদলে গেছে। যারা ছিল পশু চরিত্রের, আজ তারা ফিরিশতা চরিত্রের মানুষ হয়ে গেল। যারা ছিল লুটতরাজকারী ও ছিনতাইকারী, তারা এখন অন্যের জানমাল, মান-সম্মানের রক্ষক হয়ে গেল। যারা জীব-জন্তুকে আগে-পরে পানি পান করানোর ইস্যুতে রক্তের বন্যা বইয়ে দিত, তারা পরের কল্যাণে তৃষ্ণাকাতর জীবন দিতে পছন্দ করতে লাগল। যারা নিজেদের শিশু কন্যাকে নিজ হাতে জীবন্ত মাটি চাপা দিত, তারা অপরের শিশুকন্যা প্রতিপালনের জন্য নিজের কোল খালি করে দিতে লাগল। যারা পরের ধন-সম্পদকে নিজের বলে মনে করত, তারা নিজের অর্থ-সম্পদও অন্যের সম্পদ মনে করতে লাগল। যারা রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে মানুষের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করতেও ভয় পেত না, তারা রাতের আঁধারে পারস্য সম্রাটের কোটি টাকা মূল্যের রাজমুকুট স্বীয় চাদরে লুকিয়ে আমীরের নিকট পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তলব ও আল্লাহ সন্ধান দুনিয়া মোহ ও রিযিক সন্ধানের এই জোয়ার ও স্পর্ধাকে স্তিমিত করে দেয়, যা দুনিয়ার শান্তি-নিরাপত্তাকে সংকুচিত করে দিয়েছিল। আর দুনিয়াকে নিছক একটি বাজার ও মণ্ডপ বানিয়ে দিয়েছিল। প্রতিযোগিতার সে স্বভাবজাত আগ্রহ, যা মানুষের অবদমিত শক্তিকে উস্কে দিত এবং তার রত্নভাণ্ডার চমকাত, যা প্রথমে দুনিয়ার প্রতি মনোযোগী হয়ে জীবনকে এক অশেষ সংঘাত বানিয়ে দিয়েছিল, ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি করেছিল, আজ সেই স্বভাবজাত আগ্রহ দীন-ধর্মের প্রতি ধাবিত হয়ে ভদ্র-সম্ভ্রান্ত মানবীয় গুণাবলী প্রস্ফুটিত করেছে। স্বভাব চরিত্রকে

পবিত্র করে দিয়েছে। এখনও বিভিন্ন মানব গোষ্ঠী এবং তাদের বিভিন্ন লোকদের মাঝে একজন অন্যজন থেকে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা আছে, তবে তা ভাল কাজ, সুকীর্তি, পুণ্য ও সাওয়াব এবং আল্লাহ পাকের ক্ষমতা ও সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য। গরীব মুসলমানগণ রাসূলে কারীম (সা) -এর কাছে অভিযোগ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ধনী ভাইয়েরা আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হয়ে যাচ্ছে। নামায-রোযা তারা আমাদের মতই করে। আর দান-সদকা আমরা তাদের মত করতে পারি না। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে একটি যিকির বলে দিলেন। ধনীরা শুনে তারাও সেটি পড়তে শুরু করল। গরীবরা পুনরায় এসে বলল, হুজুর! আমরা তো আবার পিছনে পড়ে গেলাম। আমাদের ধনী ভাইয়েরাও তাই পড়তে শুরু করেছে, আপনি যা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাদেরকে সান্ত্বনা দিলেন। দুনিয়া বিমুখতা ও অল্পে তুষ্টি দুনিয়াকে জান্নাতোপম বানিয়ে দিয়েছে, যেখানে

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

(যেখানে তাদের কোনও ভয় নেই; তারা তথায় চিন্তান্বিতও হবে না) এর ঝলক দেখা যেত। ধন-সম্পদের মোহ, লোভ-লালসা ও কপটতা বিদূরিত হয়ে যাওয়ার কারণে অন্তরাত্মায় এমন প্রেম-ভালবাসা, সৌহার্দ-সম্প্রীতি ও হৃদ্যতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে,

نَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ.

(আমরা তাদের মনের ভেজাল-খাদ বের করে দিয়েছি) এর যে চিত্র জান্নাতবাসীর বৈশিষ্ট্য, তা দুনিয়ায় দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। অধিকার তলবের পরিবর্তে দায়িত্ব ও কর্তব্যের অনুভূতি এবং লালসার পরিবর্তে ত্যাগের এমন মৌলিকত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে,

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

এর দৃশ্য দর্শনার্থীগণ দেখতে পায়। আর আকাশ-বাতাস বড় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে, মেজবান তার শিশু সন্তানদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুম পাড়িয়ে ও বাতি নিভিয়ে দিয়ে মেহমানকে আশ্বস্থ করেছে যে, সেও তার সাথে খাবারে শরীক আছে, মেহমান তৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠেন আর মেজবান স্ত্রী-সন্তানসহ সারারাত ক্ষুধার্ত রইলেন।

এ সকল আত্মশুদ্ধি ও উন্নতি ছিল আল্লাহ তা'আলাকে এক উপাস্য মেনে নেওয়া, নিজেকে তার ইচ্ছা সমর্পণ করা এবং নিজেকে এক নিষ্পাপ পয়গম্বরের তত্ত্বাবধান ও দীক্ষায় সঁপে দেওয়ার সুফল। ফলশ্রুতিতে তাদের জীবনের পেরেক বসে যায় এবং প্রত্যেক জিনিস স্বস্থানে ঠিক হয়ে যায়।

খৃস্ট দুনিয়া এই পয়গামের মূল্যায়ন করেনি, তাদের পূর্বাংশ তো খুব তাড়াতাড়ি সে সব লোকের সামনে লজ্জাবনত হয়ে যায়, যারা এই পয়গামের ধারক-বাহক এবং স্বীয় নবী (সা) এর সহচর ছিল। কিন্তু তাদের পশ্চিম ও উত্তর অংশ (ইউরোপ) ইসলামের মুজাহিদ ও দাঈগণের মাহফিল থেকে বাইরে থাকে। এরাই পুরো নয় শতক (বা এক হাজার বছর) অজ্ঞতা-মূর্খতা ও অন্ধকারের এমন যুগে বসবাস করেছে, যাকে স্বয়ং তারা নিজের ভাষায় অন্ধকার যুগ (Dark Ages) বলে। মানব ইতিহাসের এই যে দীর্ঘ যুগ হিংস্রতা, মূর্খতা, হতবুদ্ধিতা, প্রবৃত্তি পূজা, বৈরাগ্যতার মানুষ শোষণ ও সংসার বিমুখতা, গীর্জার প্রভুদের অগ্নিশুলি এবং নিষ্ঠুর হিসাব-নিকাশের কুরবানী হয়েছে, এর অনুশোচনা ইউরোপের চিরকাল থাকবে। এর লজ্জায় তাদের মাথা সর্বদা নুইয়ে যাওয়া উচিত। এসবই ছিল বস্তুবাদ ও সৃষ্টিপূজার কারিশমা।

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ بْنَ مَرْيَمَ.

"তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদেরকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও।" (সুরা তাওবা : ৩১)

ষোল শতকে যখন তাদের চক্ষু খুলল, তখন তারা মনে করল, তাদের সকল বিপদ-বিপর্যয়ের প্রতিকার হচ্ছে, তাদের গীর্জার গোলামী থেকে মুক্তি লাভ করা। কিন্তু তারা 'لا اله' এর পূর্ণ মনজিল অতিক্রম করেনি। তারা ' لا كليسا' (নয় গীর্জা) কে 'لا إله' (নয় কোন ইলাহ) এর প্রতিশব্দ মনে করেছে এবং একে অস্বীকার করে আরও অনেক ইলাহ (উপাস্য) নিজেদের উপর চাপিয়ে নিয়েছে। আর 'لا الله' (এক আল্লাহ ছাড়া) এর তো সূচনাই করেনি তারা। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের গুরুত্ববহ ইতিহাসের সেই তিন শতকে নিজেদের পছন্দনীয় এক ইলাহের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে আরও নতুন নতুন অনেক ইলাহ বাছাই করতে থাকে। আর 'اَتَعْبُدُوْنَ مَا تَنْحِتُوْنَ' (যাদেরকে নিজ হাতে তৈরী করলে, তোমরা কি তাদের পূজা-অর্চনায় লেগে যাচ্ছ!) এর নমুনা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আজও তাদেরকে নিজেদের অনেক প্রাচীন প্রভুদের প্রতি অসন্তুষ্ট দেখা যায়। কিন্তু অপর ভ্রান্ত ইলাহ ও প্রভু বেছে নেওয়া হচ্ছে। তার কোন ইলাহের নাম গণতন্ত্র, কোনও ইলাহের নাম একনায়কতন্ত্র (ডিক্টেটরশীপ), কোন ইলাহের নাম পুঁজিবাদ, কোনও ইলাহের নাম সমাজতন্ত্র, কোনটির নাম জাতীয় ঐক্য, কোনটির নাম জাতি, কোনটির দেশ। পশ্চিমা বিশ্ব তাদের জীবনচিত্র মধ্যবয়সী করে বানায় আর জীবনের ঘড়ির পালক এলোমেলো করে জমায়। কিন্তু তার পেরেক বসে না। এই পেঁচানো রশিকে তারা বছরের পর বছর ধরে নিজের নখের কৌশলে সামলে নিচ্ছে। কিন্তু যতখানি সামলাতে চেষ্টা করে, তা আরও পেঁচিয়ে যায়।

এমনকি আজ তাতে স্বয়ং তাদের আঙুলগুলো এমনভাবে ফেঁসে গেছে যে, বের হয় না। তারা জীবনের হাজার নকশা বানাতে পারে, তাতে হাজার বিন্যাস দিতে পারে, তার নতুন নতুন নামও রাখতে পারে, একজনের দায়িত্ব বহুজনের কাঁধে বণ্টন করে দিতে পারে কিংবা বহুলোকের দায়-দায়িত্ব এক সুনির্বাচিত ও অতি দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাঁধে তুলে দিতে পারে এবং সে ব্যক্তি শত শত নিয়ম-কানুন ও শর্ত-শারায়েতে শক্তভাবে বেঁধে দিতে পারে। কিন্তু যাবৎ না ঐ দেহের অন্তরাত্মা পরিবর্তন হবে, সে দায়িত্বশীল সত্ত্বা একজন কিংবা কোনও দল বা গোটা জাতি; যাবৎ না নিজেকে একজন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টার সম্মুখে দায়িত্বরত মনে করবে, তার মনে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের জবাবদিহিতার খটকা নেই, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কল্যাণকামিতা, পুণ্য ও নেককাজ এবং আমানতের নিদর্শন নেই, ততক্ষণ পর্যন্ত কেবল নাম পরিবর্তন এবং আইন কানুন ও বাধ্যবাধকতার দ্বারা বাস্তবিক কোনও পরিবর্তন হতে পারে না।

এই একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর নামে– যার নেতৃত্ব আজ ইউরোপের হাতে, সীরাতে মুহাম্মাদী (সা) -এর আসল পয়গাম হচ্ছে, ওহে আল্লাহ ভোলা মানুষ! আল্লাহর দিকে ফিরে এসো! তাকে ছাড়া আর কাউকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করো না।

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ.

"অতএব আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। তোমরা আল্লাহর সাথে কোনও উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তার পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী।"

(সূরা যারিয়াত ৫০-৫১)

এই পয়গাম মুহাম্মাদ (সা) এর সীরাত, পবিত্র জীবনচরিত প্রতিবছর দুনিয়াকে শোনায়। দুনিয়ার কোনায় কোনায় এ দাওয়াত ও আহ্বান পৌঁছায়। বাতাস তার কাঁধে নিয়ে আর সমুদ্র তার মাথা চোখের উপর রেখে প্রতি বছর এই পয়গাম ও দাওয়াত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির কাছে পৌঁছে দেয়। পৃথিবীর এই কোলাহল-কলরোল, যা কিছুই শুনতে দেয় না, তা যদি সামান্য কমে যায়, তাহলে আজও কানে সেই আওয়াজ, সেই আহ্বান আসছে, যা শুনতে পেয়েছিল প্রথম শতকের আহলে কিতাব–

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ. يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

"তোমাদের কাছে একটি উজ্জ্বল জ্যোতি এসেছে এবং একটি সমুজ্জ্বল গ্রন্থ। এর দ্বারা আল্লাহ, যারা তার সন্তুষ্টি কামনা করে তাদেরকে নিরাপত্তার পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে স্বীয় নির্দেশ দ্বারা অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে আনয়ন করেন এবং সরল পথে পরিচালনা করেন।"

(সূরা মায়েদা : ১৫-১৬)

নবী-রাসূলগণই মানবীয় জাহাজের নাবিক। মানুষের তরী সর্বকালে সর্বযুগে তাদেরই পরিচালনায় তীর পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। কেবল হযরত নূহ আ. -এর সন্তানেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। প্রত্যেক যুগে যেই দাবী করেছে-

سَآوِىْ اِلٰى جَبَلٍ يَّعْصِمُنِىْ مِنَ الْمَآءِ

"আমি তো পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে ঝড় বান থেকে নিরাপদ থেকে যাব।"

সে এ জবাবই পেয়েছে যে, 'لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ' (আজ কোনও রক্ষাকারী নেই)। মুহাম্মাদ (সা)কে পৃথিবীতে প্রেরণের পর সকল মানুষ ও সকল জাতি, প্রাচ্যবাসী ও পাশ্চাত্যবাসী, প্রবীণ-নবীন, অগ্রবর্তী, পরবর্তী সকলের জন্যই আল্লাহ তা'আলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, কল্যাণ-সফলতা ও সৌভাগ্য তারই চাদরে আবৃত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হতভাগ্যতা ও ধ্বংস, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

সমকালীন মুসলমানদের নামে সীরাতের পয়গাম

সকলেই জানেন, রাসূলে কারীম (সা) এর শুভাগমনকালে এই পৃথিবী কোন বিরানবাড়ি কিংবা কবরস্থান ছিল না। জীবনচক্র এখন যেভাবে চলছে, সামান্য ব্যবধানে তখনও এরূপই চলেছে। সকল কাজ কারবার আজকের মতই চলত। ব্যবসা-বাণিজ্যও ছিল; চাষাবাদও ছিল। সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং তাদের সংস্থায় তৎপর ব্যক্তিবর্গও ছিল। তৎকালীন পৃথিবীর মানুষ এই জীবনের উপর সম্পূর্ণ আত্মতৃপ্ত ও প্রশান্ত ছিল। এতে কোনও পরিবর্তন-পরিবর্ধন, সংস্কার, সংশোধন ও শৃঙ্খলার আদৌ কোনও প্রয়োজন অনুভূত হত না।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে তার জমিনের চিত্র এবং দুনিয়ার এই অবস্থা মোটেও পছন্দ ছিল না। হাদীস শরীফে সে যুগের প্রতিচিত্র নিম্নোক্ত ভাষায় বিবৃত হয়েছে–

إِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.

(আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি পৃথিবীর সকল অধিবাসী কি আরব কি অনার,ব সকলকে পছন্দ করলেন। আর তিনি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন কেবল আহলে কিতাবদের কয়েকজন ব্যতীত)। এমতাবস্থায় আল্লাহ পাক মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা)কে প্রেরণ করলেন। তার সঙ্গে দিলেন গোটা এক জাতির আত্মপ্রকাশের উপকরণ। বলাবাহুল্য, তাকে এমন এক মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা অন্য কোনও জাতির দ্বারা পূরণ হচ্ছিল না।

যে কাজ তারা সকলেই পুরোপুরি মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে আঞ্জাম দিতে থাকেন। কাজেই সুস্পষ্টতঃ নতুন কোনও জাতি ও উম্মত সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল না। মানব জীবনের এই প্রশান্ত সমুদ্রে ঐ নতুন তরঙ্গমালার প্রয়োজন ছিল না, যা মুসলমানদের অস্তিত্বে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকম্পন সৃষ্টি করেছে নিখিল বসুন্ধরায় । আল্লাহ তা'আলা যখন হযরত আদম আ.কে সৃষ্টি করলেন, তখন ফিরিশতাগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার তাসবীহ-

তাহলীল ও পবিত্রতা বর্ণনায় আমরা অনুগত ফিরিশিতারাই তো যথেষ্ট ছিলাম। তদুপরি এই মাটির মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন বোধগম্য হচ্ছে না। আল্লাহ তা'আলা বললেন, إِنِّيْ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (আমি যা জানি, তোমরা তা জান না)। যেন তিনি ইরশাদ করেন, (একটু সামনে সুস্পষ্ট করে দেন) আদম আ. কেবল সে কাজের জন্য সৃষ্টি হননি, যা ফিরিশতাগণ করতে পারেন। তার দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ভিন্ন কোনও উদ্দেশ্য আছে।

মুসলমানদেরকে যদি কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সৃষ্টি করা হত, তাহলে মক্কার যেসব ব্যবসায়ী সিরিয়া-ইয়েমেনে বাণিজ্যিক সফর করতেন এবং মদীনার সেসব বড় বড় ইয়াহুদী বণিক, যারা বিশাল পুঁজিপতি দুর্গ হয়ে বসেছিল, তাদের আপত্তি করার অধিকার ছিল, এ খেদমত ও সেবার জন্য আমরা গুনাহগার কম কোথায়? এর জন্য নতুন আরেক উম্মত সৃষ্টি করতে হবে কেন? যদি চাষাবাদ উদ্দেশ্য হত, তাহলে মদীনা ও খায়বারের, তায়েফ ও নাজনের, সিরিয়া ও ইয়েমেনের এবং ইরাকের কৃষকগণ ও কৃষিজীবী বসতিগুলো প্রশ্ন করতে পারত, কৃষিকাজ ও চাষাবাদে আমরা মেহনত-পরিশ্রমের কী ত্রুটি করেছি, যার জন্য নতুন এক উম্মত আবির্ভূত হচ্ছে? যদি পৃথিবীতে চলমান মিশনারীতে শুধু খাঁপ খাওয়া উদ্দেশ্য হত, বেতনভাতা নিয়ে রাষ্ট্রীয় ও সরকারী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অফিসিয়াল কাজকর্ম করা উদ্দেশ্য হত, তাহলে রোম-পারস্যের সরকারী কর্মচারীদের বলার অধিকার ছিল, এসব দায়িত্ব পালনের জন্য আমরাই তো যথেষ্ট। আমাদের অনেক ভাই, বন্ধু এখনও বেকার। এরপরও নতুন আশাবাদী লোকদের কী প্রয়োজন?

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ নতুন এক এবং এমন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, যা পৃথিবীতে কেউ আঞ্জাম দিচ্ছে না আর না দিতে সক্ষম। সেজন্য নতুন এক উম্মতেরই উত্থান জরুরী হয়ে পড়েছিল। সুতরাং কুরআন পাকে ইরশাদ হচ্ছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ.

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যেন তোমরা মানুষদেরকে সৎকাজের আদেশ কর এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ কর। আর আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন কর। (আলে ইমরান : ১১০)

এই সুমহান লক্ষ্যে মানুষ তার দেশ ছেড়ে নির্বাসিত হয়েছে। নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান দিয়েছে। জীবনভর আত্মত্যাগ ও কুরবানী দিয়েছে। নানা জুলুম-নিপীড়ন সহ্য করেছে। নিজের জমজমাট ব্যবসায় ধ্বস নামিয়েছে। ফসলের ক্ষেত ও ফলের বাগান বিরান করেছে। নিজের সুখ-শান্তি ও আরাম-

আয়েশ ভুলে গেছে। পৃথিবীর সকল সাফল্য ও সুখাবস্থা থেকে চোখ বন্ধ করে নিয়েছে। মোক্ষম সুযোগ হাতছাড়া করেছে। ধন-রত্ন বিলীন করেছে। পানির মত রক্তস্রোত বইয়ে দিয়েছে। নিজ সন্তানকে ইয়াতীম এবং স্ত্রীকে বিধবা করেছে। সেসব উদ্দেশ্য ও কর্মব্যস্ততা, যাতে আজ মুসলমান পরিতৃপ্ত দেখা যায়, সেজন্য এই যুদ্ধবাজি ও কিয়ামত ঘটিয়ে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন ছিল না। তা অর্জনের পথ তো সম্পূর্ণ নিরাপদ-নিস্কণ্টক মসৃণ ছিল। এপথে সমকালীন বিশ্ব অপেক্ষা বড় কোন টানাপোড়েন, সংঘাত-সংঘর্ষ ছিল না। আর না এটি আরববাসী এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলোর জন্য অভিযোগের কোনও কারণ ছিল। তারা তো বারবার এসব বস্তু ভেঁট দিয়েছে। (আজ যা মুসলমানদের শেষ অবস্থা) আর প্রত্যেকবারই ইসলামের দাঈগণ সেসব প্রত্যাখ্যান করেছেন। ধন-সম্পদ, নেতৃত্ব, ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের বড় বড় উপঢৌকন ফিরিয়ে দিয়েছেন। এরপরও যদি মুসলমান সে স্তরে নেমে আসে, রাসূলে কারীম (সা) কে প্রেরণের সময়ে যে অবস্থায় ছিল কাফির সম্প্রদায়গুলো আর আজও যে অবস্থায় আছে কোনও কোনও অমুসলিম জনপদ। যদি জীবনের সেসব কর্মকাণ্ডে লেগে যাওয়া এবং আপাদমস্তক ডুবে যাওয়াই উদ্দেশ্য হত, যার মাঝে ডুবে ছিল আরববাসী এবং রোম পারস্যের লোকেরা। যদি সেসব সফলতাকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া হত, যেগুলোকে তাদের নবী-রাসূল (সা) উত্তম সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাহলে এ হত ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসের উপর পানি প্রবাহিত করার নামান্তর এবং এই ঘোষণা, মানবজাতির যে মূল্যবান রক্তস্রোত বদর, হুনাইন, আহযাব, কাদেসিয়া ও ইয়ারমুকে বইয়ে দেওয়া হয়েছে, তা ছিল নিষ্প্রয়োজন।

আজ যদি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কিছু বলার শক্তি-সাহস হয়, তাহলে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে বলতে পারবে, তোমরা যেসবকে জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করছ, সেসব জিনিস আমরা পাপীরা তোমাদের নবীর সামনে পেশ করেছিলাম। সেসব জিনিস তখন এক ফোঁটা রক্ত ঝরানো ছাড়াই অর্জিত হতে পারত। তাহলে সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার সার অর্জন এবং সেসব ত্যাগ তিতিক্ষা ও কুরবানীর মূল্য কি এই জীবন দর্শন ও জীবন পদ্ধতি, যা তোমরা গ্রহণ করেছ। এটাই কি জীবন ও আদর্শ চরিত্রের চূড়ান্ত নমুনা, যার উপর তোমরা আত্মতৃপ্ত? যদি সেই ইসলাম বিদ্বেষী কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কেউ এই জেরা করার অবকাশ পায়, তাহলে আজ আমাদের বড় থেকে বড়, যোগ্যতর উকীলও এর কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারবে না। এতে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উম্মাতের জন্য আর কোনও উপায় নেই। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর মনে মুসলমানদের সম্পর্কে এ আশঙ্কাই ছিল- তারা

দুনিয়ার মোহে পড়ে যেন নিজের আসল উদ্দেশ্য ভুলে না যায় এবং দুনিয়ার সাধারণ ও নিম্ন পর্যায়ে নেমে না আসে।

রাসূলে কারীম (সা) ইন্তিকালের প্রাক্কালে যে অমূল্য ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,

مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنِّى أَخْشَى أَنْ تَسْبُطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بَسَطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ.

"তোমাদের ব্যাপারে আমার দারিদ্র-দৈন্যতা নিয়ে কোনও আশঙ্কা নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, দুনিয়ায় তোমাদের কখনও যেন সেই প্রশস্ততা লাভ না হয়ে যায়, যেমনটি তোমাদের পূববর্তী লোকদের লাভ হয়েছিল। তাহলে তোমরাও তদনুরূপ লোভ করবে, যেমন করেছিল তারা। তখন তোমাদেরকেও তেমনি ধ্বংস করে দেওয়া হবে, যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।"

মদীনার আনসারগণ যখন মনস্থ করলেন, জিহাদের ব্যস্ততা এবং ইসলামের চেষ্টা-সংগ্রাম থেকে কিছুদিনের জন্য অব্যাহতি নিয়ে নিজেদের বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার ও ব্যবসা-বাণিজ্য সচল করবেন এবং কিছুদিনের জন্য শুধু ব্যক্তিগত কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী হওয়ার জন্য অনুমতি নেবেন। তাদের মনে এ আশঙ্কাও আসতে পারেনি যে, তারা আরকানে দ্বীন নামায, রোযা, হজ্ব-যাকাত থেকে সাময়িকভাবে নিজেদের কাজকর্ম ও ব্যবসা দেখাশোনার জন্য নিজেকে মুক্ত করিয়ে নিবেন। তথাপি ইসলামের কার্যতঃ চেষ্টা-সংগ্রাম এবং দীনের প্রচার-প্রসার ও প্রাধান্য বিস্তারের প্রচেষ্টা থেকে তাদের এই আকস্মিক অমনোযোগিতাকেও আত্মহত্যার নামান্তর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনন্তর অবতীর্ণ হয়েছে সূরা বাকারার নিম্নোক্ত আয়াত। যার তাফসীরে হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. বলেন,

وَاَنْفِقُوْا فِى سَبِيْلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، وَاَحْسِنُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

"আল্লাহ পাকের রাস্তায় ব্যয় কর। স্বেচ্ছায় নিজ হাতে ধ্বংসস্তূপে নিপতিত হয়ো না। আর ভালভাবে কাজ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা বাকারা : ১৯৫)

মুসলমানদের প্রকৃত জীবনচিত্র এমনই অর্থাৎ হয়ত সে ইসলামের দাওয়াত এবং কার্যতঃ চেষ্টা-সংগ্রামে আত্মনিয়োজিত থাকবে অথবা এই দাওয়াত ও চেষ্টা-সংগ্রামে নিয়োজিত লোকদের আশ্রয় হবে। পাশাপাশি তাদের সাথে কার্যতঃ চেষ্টা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও সংকল্প

রাখবে। নিশ্চিন্ত-ভাবনাহীন এক নাগরিক এবং শুধুমাত্র ব্যবসায়ী জীবন ইসলামী জীবন নয়। আর তা কোনভাবেই একজন মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য হতে পারে না। জীবনের বৈধ কাজকর্ম, বৈধ পেশা, বৈধ জীবনোপকরণ কখনও নিষিদ্ধ নয় বরং নেক নিয়ত ও বিনিময় প্রত্যাশার সাথে ইবাদত এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তবে যখন তা সবই দীনের ছায়ায় হবে এবং সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাধ্যম ও উসীলা হবে; স্বয়ং মুখ্য উদ্দেশ্য নয়।

সীরাতে মুহাম্মাদী বা নববী জীবন চরিতের সবচেয়ে বড় পয়গাম এটি। যা খাঁটি মুসলমানের নামে প্রেরিত। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করার অর্থ, তার উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করা এবং সবচেয়ে বড় বাস্তবতাকে অস্বীকার করা, যা সীরাতে মুহাম্মাদী (সা) বিশ্ব মুসলমানদের সামনে পেশ করে।

রহমতে আলমের দুয়ারে আল্লামা ইকবাল

আল্লামা ইকবাল (র) -এর গোটা জীবন ইশকে রাসূল (সা) এবং মদীনার পুণ্যময় স্মৃতিচারণে নিয়োজিত ছিল। তার জীবন্ত কথামালা সে দিনগুলোর আলোচনায় ভরপুর। কিন্তু জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে ইশক ও মহব্বতের এই অঙ্গীকার এমনভাবে ব্যাপৃতি লাভ করে যে, মদীনা শরীফের নাম এলেই তার ভালবাসার অশ্রু তৎক্ষণাৎ জারি হয়ে যেত। তিনি তার সে দুর্বল দেহ নিয়ে নিশ্চিত রাসূলের মদীনায় হাজির হতে পারেননি ঠিক। কিন্তু তার আশাভরা ও ব্যাকুল প্রাণ, নিজের চিন্তাশক্তি ও ভাষার সাবলীলতায় তিনি হিজাযের প্রেমময় স্থানগুলোতে বারবার উড়ে গিয়েছেন এবং তার চিন্তা ও কল্পনার বিহঙ্গ সবসময় ঐ ধনাগারে ডানা মেলে উড়েছে।

তিনি প্রিয়নবী (সা) এর দরবারে নিজের হৃদয়-মন, প্রেম-ভালবাসা, একাগ্রতা-একনিষ্ঠতা ও কৃতজ্ঞতার উপহার পেশ করেন। রহমতের নবীজীকে সম্বোধন করে নিজের আবেগ অনুভূতি, উদ্বেগ-ব্যাকুলতা এবং নিজের জাতি ও সমাজের চিত্তাকর্ষক চিত্র অংকন করেছেন। এমন মুহূর্তে তাঁর যে কবিত্ব রত্নের মাধুর্য প্রকাশ পেত এবং অর্থের নিদ্রামগ্ন মুক্তা প্রস্ফুটিত হত, তা সেই নিগূঢ় বাস্তবতা, যার লাগাম তিনি দৃঢ় হস্তে ধরে রেখেছিলেন, তখন পর্দাহীন উন্মুক্ত হয়ে সামনে এসে পড়ত এবং তার বিচিত্র সৌন্দর্যের ঝলক দেখাত।

بحرفے می تواں گفتن تمنائے جہانے را
من از شوق حضوری طول دادم داستانے را

'মহাবিশ্বের স্বপ্ন-সাধনা আমি
বলব প্রিয় কোন্ ভাষায়
দীর্ঘায়িত করেছি গল্প ওগো
তব নৈকট্যের আশায়।'

এই বিষয়বস্তুর উপর তার ভাষা-অভিব্যক্তি সবচেয়ে প্রাঞ্জল, সাবলীল, জীবন্ত প্রভাবময়ী, তার আবেগ-ব্যাকুলতার সঠিক ব্যাখ্যা, তার জ্ঞান-

গবেষণা-অভিজ্ঞতার সারনির্যাস, তার যুগ-সময় অঙ্গীকারের প্রতিচ্ছবি এবং তার স্পর্শকাতর অনুভূতি ও চিন্তাধারার নিখুঁত দর্পণ।

সামনে তার যেসব ছন্দ-কবিতা পেশ করা হচ্ছে, তাতে তিনি কল্পনা জগতে মক্কা শরীফ ও মদীনা মুনাওয়ারায় ভ্রমণ করেছেন। ঐ প্রতিচ্ছবিসহ সেই আগ্রহ-উদ্দীপনার কাফেলার সাথে নরম মরুভূমিতে তীব্র গতিসম্পন্ন। সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেম-ভালবাসার এই বালিরাশি তার কাছে রেশম অপেক্ষা কোমল অনুভূত হয়েছে বরং মনে হচ্ছে, মরুপ্রান্তরের প্রতিটি বালিকণা জীবন্ত আত্মা হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে। সে উষ্ট্রীচালককে বলছে, এই ভীত-প্রকম্পিত প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং নরম আচরণ ও কোমলতা গ্রহণ করুন।

چه خوش صحرا که شامش صبح خنداست شبش کوتاه وروزاو بلند است
قدم اے راه رو آہسته تر نه چو ما ہر ذرهٔ او درو مند است

কী যে সুখী সে মরু বিয়াবান!
সন্ধ্যা যেন তার স্নিগ্ধ সকাল
রাত্রি ছোট, দিন যে সুমহান।
আস্তে ফেল কদম তোমার হে পথিক
ধরো না অধর চেপে,
প্রতিটি কণাই যে তার ব্যথা কাতর।

হুদী গায়কের গান শুনে তার প্রেমের আগুন আরও তীব্রতর হতে থাকে। হৃদয়ের ক্ষত-জখমগুলো জীবন্ত হয়ে যায়। তার গোটা অস্তিত্ব জুড়ে এক উষ্ণতা এবং জীবনের তরঙ্গ বয়ে যায়। তার কাব্যিক মন ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে প্রভাবময় সাবলীল কবিতা-ছন্দে সুরে সুরে তন্ময় হয়ে যেতে থাকে।

অনন্তর তিনি এই কল্পনার রাজ্যে রাসূলে কারীম (সা) এর দরবারে হাজির হলেন। পাঠ করেন দরূদ-সালাম। প্রেম-ভালবাসার যবান তার মনের ভাষ্যকার হয়ে যায়। আর তিনি এই বরকতময় ও মূল্যবান মুহূর্তে লাভবান হয়ে আপন মনের অভিব্যক্তিগুলো বর্ণনা করেন। মুসলিম উম্মাহ ও মুসলিম বিশ্বের অবস্থা, তাদের সমস্যা-সংকট, তাদের বিপদ-বিপর্যয় ও পরীক্ষা, সেই সাথে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতি, বস্তুবাদী দর্শন-চিন্তাধারা ও আন্দোলনের সামনে তাদের হাতিয়ার নিক্ষেপ ও অসহায়ত্ব, নিজ দেশে তাদের দৈন্যতা, পরবাস এবং স্বজাতির মধ্যে তার পয়গামের অবমূল্যায়ন ও অবমাননাকর অভিযোগ করেন। কখনও তার চক্ষুযুগল অবিরাম অশ্রুসিক্ত হয় আবার কখনও মনের কথাগুলো মুখ দিয়ে অকপটে বেরিয়ে আসে।

তিনি এই কাব্য সংগ্রহের নাম দিয়েছেন, 'আরমগানে হিজায' বা 'হিজাযের উপহার'।

বস্তুতঃ এটি গোটা মুসলিম বিশ্বের জন্য বিরাট পূণ্যময় এক উপহার এবং হিজাযের প্রাতঃহাওয়ার এক সুগন্ধিময় পরশ।

باد نسیم آج بہت مشکبار ہے
شاید ہوا کے رخ پر کھلی زلفِ یار ہے

"ভোরের বিমল হাওয়া আজ বড়ই সুঘ্রাণযুক্ত। মনে হয়, বন্ধু আমার তার খোলা চুলগুলো বাতাসে মেলে দিয়েছে।"

ডা. ইকবালের এই আত্মিক ভ্রমণ সে সময় হয়েছিল যখন তার বয়স ষাটের উর্ধ্বে। তার শরীর ছিল দুর্বল। এই বয়সে মানুষ যখন আরাম করাকেই অগ্রাধিকার দেয় এবং নির্জনতা পছন্দ করে, এ সময় তাকে এত দীর্ঘ ও কষ্টের সফরে যে জিনিস উৎসাহী করেছিল, তাকে প্রেমের আদেশ পালন এবং জীবনের লক্ষ্য পূরণ ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

بایں پیری رہ یثرب گرفتم — نوا خواں از سرور عاشقانہ
چو آں مرغے کہ در صحرا سر شام — کشاید پر بہ فکرِ آشیانہ

"তিনি বলেন, যখন আমার জীবনের সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এমতাবস্থায় যদি আমি মদীনা মুনাওয়ারার (যা মনের আসল ঠিকানা এবং মুমিনের প্রকৃত বাসস্থান) পথ ধরি, তাহলে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। যেভাবে সন্ধ্যাবেলা পাখিরা নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যায়। তদ্রুপ আমার আত্মা-মনও এখন তার আসল ঠিকানায় ফিরে যেতে যায়।"

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মাঝে তার উটনী যখন স্বীয় গতিবেগ তীব্রতর করে দেয় তখন তিনি উটনীকে সম্বোধন করে বলেন, আরোহী তোমার বড়ই জীর্ণশীর্ণ ও রুগ্ন। কিন্তু উটনী তার এই পরামর্শ গ্রহণ করে না। সে এত দ্রুত ও ধৃষ্টতাপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়, মনে হয় যেন তা প্রস্তরভূমি নয় বরং রেশমের একটি বিছানা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

سحر باناقہ گفتیم نرم تر رو — کہ راکب خستہ و بیمار و پیر است
قدم مستانہ زد چنداں کہ گوئی — پیائش ریگ ایں صحرا حریر است

এবার এই মদীনার পর্যটক দরূদ-সালামের সওগাত নিয়ে স্বীয় অভিষ্ট গন্তব্যে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। ঐ মনমুগ্ধকর পরিবেশে তিনি আশাবাদ

ব্যক্ত করছেন, আহ! তিনি যদি এই উষ্ণ বালিতে এমন একটি সিজদা দিতে পারতেন, যা তার ললাটে স্থায়ী চিহ্ন হয়ে থাকবে। তিনি তার বন্ধুকেও এই প্রেমের সিজদা দেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন।

چہ خوش صحرا کہ دروے کار وانہا　　درو دے خواند و محمل براند
بہ ریگ گرم او آور سجودے　　جبیں را سوز تا داغے بماند

প্রেমের আবেগ, আসক্তি যখন বেড়ে যায়, তখন আল্লামা ইরাকী ও মোল্লা জামীর কবিতামালা তার মুখ দিয়ে অজান্তেই বের হতে থাকে। মানুষ অবাক-বিস্ময়ে দেখতে থাকে, এই অনারবী শেষ পর্যন্ত কোন ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করছে! কবিতাগুলো তো বুঝে আসে না, কিন্তু প্রেম-বিরহ ও ভালবাসার উচ্ছাসে মন ভরে দেয় এমনভাবে যে, মানুষের নাওয়া-খাওয়ার কথাও মনে থাকে না, পানি ছাড়াই তার তৃষ্ণা নিবারণ এবং নিঃস্বতা দূরীভূত হয়ে যায়।

امیر کارواں آں اعجمی کیست　　سرود او بآہنگ عرب نیست
زند آں نغمہ کز سیرابی او　　خنک دل در بیابانے تواں زیست

পথের কষ্ট-ক্লান্তিতে তার আনন্দ ও স্বাদ অনুভূত হতে থাকে। বিনিদ্র রজনী, স্বল্প নিদ্রা ও আরামহীনতায় তার সুখ লাগে। তিনি পথকে দীর্ঘ মনে করেন না আর দ্রুত পৌঁছার আকাঙ্ক্ষাও করেন না বরং স্বীয় উষ্ট্রীচালকের কাছে আশা প্রকাশ করেন, সে যেন তাকে আরও দূর-দূরান্তের পথ দিয়ে তাকে নিয়ে যায়, যেন এই সুযোগে প্রেম-বিরহের সময়ও কিছুটা দীর্ঘ হয় এবং প্রতীক্ষার অন্তর্জ্বালা (যা প্রেমিকদের পথের সম্বল এবং চিন্তা ও চোখের আনন্দ মনে করা হয়ে থাকে) আরও বেড়ে যায়।

غم راہی نشاط آمیز تر کن　　فغانش را جنوں انگیز تر کن
بگیر اے ساربان راہِ دروازے　　مرا سوز جدائی تیز تر کن

এরূপ আনন্দ, আবেগ-অনুভূতি ও ব্যাকুলতার সাথে সারাটি রাস্তা অতিক্রম করে তিনি মদীনা শরীফে গিয়ে পৌঁছেন। সফরসঙ্গীকে বলেন, আমরা দুজন একই গুচ্ছতে বন্দি। আজ আমার আপন মনের সাধ পূরণ এবং স্বীয় মনিব ও প্রেমাস্পদের পদতলে নিজের পালকগুলো বিছিয়ে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি। তাই আজ আমাদের চক্ষুযুগলের উপর থেকে বাধ্যবাধকতা উঠিয়ে নেওয়া উচিৎ। আর এই অশ্রুস্রোত, যা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত জন্য অধীন হয়ে আছে– তা ক্ষণিকের জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিৎ।

بیا اے ہم نفس باہم بنالیم — من و تو کشتۂ شانِ جمالیم
دو حرفے بر مرادِ دل بگویم — بپائے خواجہ چشماں را بمالیم

তিনি নিজের উপর ঈর্ষা করে বলেন, কি সৌভাগ্য ও অপার আনন্দের স্থান! এই সৌভাগ্য ও নেয়ামত তিনি লাভ করেছেন। এই অসহায় ভিক্ষুককে নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও তার শাহী দরবারে সম্মানের আসন দিয়েছেন, যেখানে বড় বড় জ্ঞানী-গুণী এবং রাজা-বাদশারও উপস্থিত হওয়ার তাওফীক হয়নি।

حکیماں را بہا کمتر نہادند — بناداں جلوۂ مستانہ دادند
چہ خوش بختے چہ خرم روزگارے — درِ سلطاں بہ درویشے کشادند

কিন্তু এই আনন্দমত্ততা ও প্রেম-বিরহ ও ব্যাকুলতার মুহূর্তেও তিনি মুসলিম উম্মাহ এবং হিন্দুস্তানের মুসলমানের কথা ভোলেন না। পূর্ণাঙ্গ সত্যনিষ্ঠ বিবরণ ও সাবলীল ভাষায় তার মনের ব্যথা গ্রন্থের মতই স্পষ্ট আকারে তুলে ধরেন।

مسلماں آں فقیر کج کلاہے — رمیداز سینۂ او سوز آہے
کلش نالد چرا نالد ندانم — نگاہے یا رسول اللہ نگاہے

তিনি বলেন, এই উম্মতের বড় পরীক্ষা হচ্ছে, এই অলিন্দ উপর থেকে ধ্বসে পড়েছে। আর যে যতখানি উপর থেকে পতিত হয়, সে তত বেশি আঘাত পায়–

چہ گویم زاں فقیرے دردمندے — مسلمانے بہ گوہر ارجمندے
خدا ایں سخت جاں را یار بادا — کہ افتاد است از بامِ بلندے

তিনি বলেন, এ জাতির জীবন জীবিকার অস্থিরতা এবং তাদের বিশৃংখলা ও দুরাবস্থার বড় কারণ হল, দল আছে; নেতা নেই। জনগণ আছে; শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা নেই।

ہنوز ایں چرخ نیلی کج خرام است — ہنوز ایں کارواں دور از مقام است
زکار بے نظام او چہ گویم — تو می دانی کہ ملت بے امام است

তিনি বলেন, আজ তাদের রক্তে তেজোদীপ্ততা, তাপ-উষ্ণতা এবং তাদের ভেতর সেই সাহসিকতা, পৌরুষ ও বীরত্বের যোগ্যতা বাকী নেই, যা তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। আজ দীর্ঘকাল ধরে তাদের কোষ তরবারী শূন্য, তাদের বিধ্বস্ত পতিত জমি ফুলগুল্ম থেকে বঞ্চিত।

نماند آں تاب وتب در خون نابش   نروید لالہ از کشت خرابش
نیام او تہی چوں کیسۂ او   بطاق خانہ ویراں کتاب است

তিনি বলেন, এ জাতি তাদের আশা-প্রত্যাশার ধন এবং গবেষণার আগ্রহ হারিয়ে চাকচিক্য-মরিচিকা ও রং-ঢংয়ে ডুবে গেছে। তাদের কান নরম-কোমল সুরতরঙ্গের মসৃণ গদি হয়ে গেছে, স্বাধীনচেতা মানুষের আহ্বান-শব্দধ্বনি তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে গেছে।

دل خود را اسیر رنگ وبو کرد   تہی از ذوق وشوق آرزو کرد
صفیر شاہباز اں کم شناسد   کہ گوشش باطنین پشہ خو کرد

আজ না তাদের চোখে ঈমান-ইয়াকীনের জ্যোতি আছে; আর না আছে প্রেমের অনাবিল সুখ-আনন্দ, না আজ তাদের মনপ্রাণ কারও ভালবাসায় মাতাল; না তাদের বক্ষ কারও স্মরণে সমৃদ্ধশালী। তারা নৈকট্য থেকে বহু দূর এবং আসল মনযিল সম্পর্কে অজ্ঞ-উদাসীন ও বিচ্ছিন্ন।

بچشم او نہ نور ونے سرو راست   نہ دل در سینۂ او ناصبور است
خدا ایں امتے را یار بادا   کہ مرگ او ز جان بے حضور است

অনন্তর তিনি এ জাতির গৌরবময় অতীত ঐতিহ্যের মূল্যায়ন ও তুলনা করছেন (যখন তার প্রতি আনন্দ ও সাহায্যের বিশেষ দৃষ্টি ছিল) এই কলুষিত অবস্থার সাথে। তিনি অত্যন্ত সাবলীলতা সাহিত্যালংকার ও চমৎকার শৈল্পিকতার সাথে বলেন, আপনি যাকে অফুরন্ত ফুল ও ফলের মধ্যে লালন-পালন করেছেন। অসংখ্য নাজ-নেয়ামতের মধ্যে রেখেছেন। আজ সে ঐ বিরান মরুপ্রান্তরে জীবন-জীবিকা খুঁজে ফিরছে। আর ক্রমেই বিভ্রান্তি ও বিপথগামিতায় বাধ্য হচ্ছে।

مپرس از من کہ احوالش چناں است   زمینش بد گہر چوں آسمان است
بر آں مرغے کہ پروردی بانجیر   تلاش دانہ در صحرا گران است

তিনি ধর্মহীনতার বিপদজনক এই ঝড়ের উল্লেখ করেন, যা মুসলিম বিশ্বের দিকে তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে। ডাক্তার মুহাম্মাদ ইকবাল (যিনি স্বয়ং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনের ডুবুরি ছিলেন, এর অলিগলি তার দেখা ছিল) ভালভাবেই বুঝতেন, মুসলিম বিশ্বের লা-দ্বীনিয়্যাত ও ধর্মহীনতার সবচেয়ে বড় প্রবেশ পথ 'বিশুদ্ধ বস্তুবাদী চিন্তাধারা', 'আত্মিক দৈন্যতা' এবং 'মনের শীতলতা'। অপব্যয়ী ও রাজকীয় জীবন যাপনে এতে আরও শক্তির

সঞ্চার হচ্ছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মহীনতার এই প্লাবন এবং বস্তুবাদী জীবন দর্শনের মোকাবেলা যদি কোনও কিছু করতে পারে, তাহলে তা হচ্ছে যুহদ ও মহব্বত অর্থাৎ দুনিয়া বিমুখতা ও ভালবাসা। তার উপর যদি কোনও জিনিস বিজয় লাভ করতে পারে, তবে তা হচ্ছে হযরত আবু বকর রাযি. এর দুনিয়া বিমুখ ও প্রেমময় জীবন। তিনি বিশ্ব মুসলিমীনের জন্য এই আদর্শ জীবনের আকাঙ্ক্ষা করেন, যা জীবনের প্রতিটি শাখায় প্রভাবময় ও ক্রিয়াশীল হবে। তিনি মনে করেন, এমন জীবন যদি বাস্তবে অস্তিত্ব লাভ করে, তাহলে গোটা পৃথিবী তার সামনে মাথা নোয়াতে এবং তাঁর সম্মান করতে বাধ্য হবে।

دگر گوں کرد لادینی جہاں را — زآثار بدن گفتند جاں را

ازاں فقرے کہ باصدیق دادی — بشورے آور ایں آسودہ جاں را

তিনি মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ দৈন্যতা-দরিদ্রতা এবং জাগতিক বা বস্তুগত আসবাবপত্রের স্বল্পতা মনে করেন না বরং তিনি এর ব্যাখ্যা করেন, এই জীবন রশ্মির নিষ্প্রভতা ও উদাসীনতা দ্বারা, যা কোনকালে তাদের বক্ষে ভরপুর ছিল। তিনি বলেন, যখন এই দরবেশ-ফকীর এক আল্লাহর জন্য সিজদাবনত ছিল; অন্য কারও নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করত না, তখন রাজা-বাদশাদের পকেট তাদের হাতের মুঠোয় ছিল। কিন্তু যখন সে অগ্নিশিখা নিষ্প্রভ ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল, তখন তাদেরকে দরগাহ ও খানকাসমূহে আশ্রয় নিতে হল।

فقیراں تا بمسجد صف کشیدند — گریباں شہنشاہاں دریدند

چوں آں آتش درون سینہ افسرد — مسلماناں بدرگاہاں خزیدند

তিনি মুসলমানদের ইতিহাস ও অতীত-ঐতিহ্য পর্যালোচনা করেছেন। তার প্রতিটি পৃষ্ঠা এক এক করে উল্টে দেখেছেন, সেখানে তিনি স্থানে স্থানে এমন বিষয় পেয়েছেন, যাতে একজন মুসলমানের মাথা লজ্জা-অনুতাপে নিচু হয়ে আসে। অনেক বিষয় এমনও পরিলক্ষিত হয়, যার সাথে নবুওয়াতে মুহাম্মাদী, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উঁচু মর্যাদা ও আদর্শ এবং নিয়ম-নীতির ন্যূনতম কোন সামঞ্জস্যও নেই। তিনি অসংখ্য শিরকী বিষয়, গাইরুল্লাহর পূজা, জুলুম-শোষণ, রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গের তোষামোদ এবং তাদের অভি প্রশংসার এমন দৃষ্টান্ত দেখতে পান, যার কারণে একজন অতি লজ্জাশীল ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের ললাট ধূলি-ধূসরিত হয়ে যায়। ডা. ইকবাল (র) নীরবে একেকটি বিষয় দেখতে থাকেন। অবশেষে অত্যন্ত স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্টতার সাথে কিন্তু খুবই সাবলীলতা, চমৎকার সাহিত্যালংকার সম্বলিত

ভাষায় সংক্ষেপে বলেন, সঠিক কথা হল, এসব নীচুতা ও অধঃপতনের সাথে আমরা আদৌ আপনার মর্যাদা যোগ্য ছিলাম না। আমাদের যোগাযোগ সম্পর্ক আপনার মর্যাদার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বেয়াদবী।

نالم از کسے می نالم از خویش
کہ ماشیانا شانِ تو نبودیم

তিনি তার এই দেখাশোনা ও জানা মুসলিম বিশ্বের উপর দৃষ্টিপাত করেন এবং তার পর্যবেক্ষণের সারকথা হিসেবে বলেন, একদিকে খানকাগুলোর মটকা শূন্য অপরদিকে বিদ্যালয় ও শিক্ষিতমহলগুলো আধুনিকতা ও শৌর্য-বীর্য থেকে অসহায়-অক্ষম। তাদের কাজ শুধু এতটুকুই বাকী আছে যে, তারা অতিক্রান্ত পথ বারবার অতিক্রম করে। সাহিত্য-কাব্যচর্চা নিষ্প্রাণ মৃত এবং ঐকান্তিক আগ্রহ-উদ্যম থেকে বঞ্চিত।

سبوئے خانقاہاں خالی ازے — کند کتب رو سے کردہ راسے
زبزم شاعراں افسردہ رفتم — نوا ہا مردہ بیروں افتادنے

তিনি বলেন, আমি মুসলিম বিশ্বের দিকদিগন্তে অনুসন্ধান চালিয়েছি। কিন্তু সেই মুসলমান আমি পাইনি, যে মৃত্যুর আশঙ্কায় ভীত সন্ত্রস্ত হওয়ার পরিবর্তে মৃত্যু তাকে ভয় করবে এবং যে স্বয়ং মৃত্যুর জন্য মরণবার্তা ও মৃত্যুদূত হবে।

بآں بالے کہ بخشیدی پریدم — بسوز نغمہائے خود تپیدم
مسلمانے کہ مرگ ازوے بلرزد — جہاں گردیدم وادا ندیدم

তিনি মুসলমানের মনের অস্থিরতা, অনুরক্ত উন্মাদনা ও উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরার রহস্য ফাঁস করে বলেন, যেসব লোক কিংবা দল মন তো রাখে, কিন্তু প্রেমাস্পদ নেই। ভালবাসা আছে কিন্তু প্রিয়জন নেই। তারা মনের স্থিরতা ও প্রশান্তি থেকে সব সময় বঞ্চিত থাকে। তার সকল শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। তার চেষ্টা-শ্রম কখনও এক মনযিলে ও এক কেন্দ্রে স্থির থাকে না।

شبے پیش خدا بگریستم زار — مسلماناں چرا زارند وخوارند
ندا آمد نمی دانی کہ ایں قوم — ولے دارند ومحبوبے ندارند

কিন্তু এসব সাহসভাঙ্গা অবস্থা সত্ত্বেও তারা মুসলমানদের প্রতি হীনমন্য এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ নয় বরং এই নৈরাশ্যতা, অন্যের উপর ভরসা করা এবং প্রত্যেক বিষয়কে অন্যদের দৃষ্টিতে দেখার প্রতি উদ্বুদ্ধকারীদের উপর চরম ঘৃণা সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বলে,

হেরেমের তত্ত্বাবধায়ক মন্দিরের রক্ষক হয়ে বসেছে। তাদের বিশ্বাস ও ঈমান মৃত ও ক্ষয়প্রাপ্ত আর তাদের দৃষ্টিও দূরন্ত ও বিদেশীদের কৃতজ্ঞ।

نگہبانِ حرم معمار دیر است   یقینش مردہ و چشمش بغیر است
زانداز نگاہ او تواں دید   کہ نومید از ہمہ اسباب خیر است

তিনি বলেন, মুসলমান যদিও ঘোড়া ও সৈন্য-সামন্ত শূন্য কিন্তু তাদের প্রতিভা বাদশাদের চেয়েও উঁচু। তাদের দৃষ্টি সুলতান-শাসকবর্গ থেকেও উন্নত। যদি অল্প সময়ের জন্য তাদেরকে সে স্থান দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাদের এই যোগ্যতা ও সৌন্দর্য হবে বিশ্ব উজ্জ্বলকারী। তাদের এই মাহাত্ম্য ও সৌকর্য বিশ্ব বিনির্মাণে দৃষ্টান্তও স্থাপন করতে পারে।

مسلماں گرچہ بے خیل وسپاہے است   ضمیر او ضمیر بادشاہے است
اگر اورا مقامش باز بخشند   جمال او جلال بے پناہے است

তিনি নিজের এবং সে যুগের কথা বর্ণনা করেন, যার সামনে তিনি বর্শার ফলার মাথার মত, যা প্রতি পদে পদে তার জন্য ব্যতিক্রমধর্মী এক পরীক্ষা।

گہے رفتم گہے مستانہ خیزم   چہ خوں بے تیغ و شمشیرے بریزم
نگاہ التفاتے برسر بام   کہ من باعصر خویش اندر ستیزم

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ডা. মুহাম্মাদ ইকবাল (র) এর পুরো জীবন আধুনিক যুগের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও টানাপোড়েনের মধ্যে কেঁটেছে। তিনি পশ্চিমা সভ্যতা ও বস্তুবাদী জীবন দর্শনকে কেবল অস্বীকরই করেননি এবং এক্ষেত্রে আগে বেড়ে কঠোর নিন্দাবাদ করেছেন। একে চ্যালেঞ্জ করেছেন। অত্যন্ত সাহসিকতা, স্বচ্ছ প্রাণ, গভীরতা ও সূক্ষ্মতার সাথে একে মিথ্যা-কলুষিত প্রমাণ করেছেন। ছিন্ন করেছেন, সেই প্রতারণার জাল, যা তার প্রকৃত ও জঘন্য ঘৃণিত রূপকে সর্বসাধারণের চোখের অন্তরালে লুকিয়ে রেখেছিল। বস্তুতঃ তিনি নতুন প্রজন্মের অভিভাবক; আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা, তদ্রুপ স্বীয় এবং ইসলামী স্বকীয়তার পরিপূর্ণ চেতনার ধারক-বাহক, বস্তুগত উৎসমূল ও বস্তুবাদী চিন্তাধারার কঠিন প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিলেন। বাস্তবিকই তার একথা বলার অধিকার ছিল।

چو رومی در حرم وادم اذان من   ازو آموختم اسرارِ جاں من
بدورِ فتنۂ عصر کہن او   بہ دورِ فتنۂ عصر رواں من

তিনি পশ্চিমা শিক্ষার সাথে নিজের বৈরিতা-বিদ্রোহ, তার ফাঁদ থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজের ঈমান-আকীদা ও স্বকীয়তা সংরক্ষণের আলোচনা করে অত্যন্ত রেশম কোমল দাবী করেন যে, তিনি পশ্চিমা দর্শন ও সভ্যতার নমরুদী অগ্নিকাণ্ডের মাঝে ইবরাহীমী অবস্থা পরিবেশের চেতনা প্রদর্শন করেছেন, তিনি আনন্দ আপ্লুত হয়ে গর্বের সাথে ঘোষণা করেন, তিনি এসব জ্ঞান ও শিক্ষার মগজ ও আবৃত রহস্য জেনে গেছেন এবং চামড়া ও খালকে ছুঁড়ে ফেলেছেন। শুধু তা-ই নয় বরং সফলতার সাথে তার জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এসেছেন। এমনকি তার হৃদয়বিদারক দৃশ্যের ম্যাজিক ও ভেল্কিবাজি লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছেন, যা প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়কে নজরবন্দি করে রেখেছে।

طلسم علم حاضر را شکستم   ربودم دانہ و دامش گستم
خدا داند کہ مانند براہیم   بہ نارا وچہ بے پروا نشستم

তিনি তার সে জীবনের কথা স্মরণ করেন, যা ইউরোপের বড় বড় শহরে কেটেছে। যেখানে শুষ্ক-নিরস, সূক্ষ্ম দার্শনিক-বিতর্ক, বিপদ-সংকুল সৌন্দর্য, মনোলোভা-চিত্তাকর্ষক দৃশ্যপট ছাড়া তিনি কিছুই পাননি। আর যদি কোন কিছু পেয়ে থাকেন, তাহলে সেটি ছিল আত্মবিস্মৃত, যা তাকে স্বীয় অস্তিত্ব থেকেও বঞ্চিত করতে চাচ্ছিল।

بہ افرنگی بتاں دل باختم من   زتاب دیریاں بگداختم من
چناں از خویشتم بیگانہ بودم   چو دیدم خویش را نشناختم من

আজও যখন তার সেদিনগুলোর পেরেশানী, অস্থিরতা ও আলোশূন্যতার কথা স্মরণ হয়, তার মন-মানসে অজানা ভয় শঙ্কা ছেয়ে যায়। তিনি অত্যন্ত আবেগ-উৎসাহের সাথে বলেন, পাশ্চাত্যের শরাবখানায় বসে আমার মাথা ব্যথা ছাড়া আর কিছুই মিলেনি। এর চেয়ে বেশি অনিয়ম, আলোশূন্য ও অস্থিরতাপূর্ণ রাতদিনের কথা-গোটা জীবনে আমার মনে পড়ে না, যে রাতদিন ঐ পশ্চিমা জ্ঞানী-গুণীদের সাথে কেটেছে।

مے از میخانۂ مغرب چشیدم   بجانِ من کہ دردِ سر خریدم
نشستم باںکویانِ فرنگی   ازاں بے سوز تر روزے ندیدم

অনন্তর তিনি বড় ব্যথা ভারাক্রান্ত হয়ে বলেন, আমি তো আপনার এক অনুগ্রহ দৃষ্টির পোষ্যপুত্র। কথিত 'বিদ্বান' ও 'বুদ্ধিজীবি'দের এসব সৃষ্টিকর্তা তত্ত্ব ও অদৃশ্যতা আমার জন্য মাথা ব্যথার কারণ ও জীবনাশঙ্কা। আমি তো কেবল আপনার দুয়ারের ভিক্ষুক। আপনার পথের ফকীর। আমার কী প্রয়োজন কারও পাথুরে আস্তানায় কপাল ঠোকা ও ভাগ্য পরীক্ষার?

فقیرم از تو خواہم ہر چہ خواہم — دل کوہے خراش از برگ کاہم

مرادرس حکیماں درد سرداد — کہ من پروردۂ فیض نگاہم

তারপর তিনি সেই শ্রেণীর প্রতি মনোনিবেশ করছেন, যাদেরকে ইলমে দ্বীন বা ধর্মীয় জ্ঞানের পথিকৃত মনে করা হয়। তিনি তার শুষ্কতা স্থবিরতা, প্রেম-মহব্বত ও হৃদয়জ্বালা থেকে বঞ্চনা জ্ঞানের উষ্ণতা এবং পরিভাষাসমূহের চড়ামূল্যের অনুযোগ করে অত্যন্ত পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও সাহিত্যালঙ্কারে সমৃদ্ধ ভাষায় বলেন, তার মরুপ্রান্তর হিজাযের যমযম শূন্য এবং বাইতুল্লাহ থেকে বঞ্চিত। তিনি বলেন, হিজাযের প্রস্তরাকীর্ণ মরুপ্রান্তরের দাম তো বাইতুল্লাহ ও যমযমের পানির কারণে। যদি তা না হত, তাহলে ঐ উত্তপ্ত মরুভূমি ও বিজন পর্বতমালার কী উপকারিতা আছে? অনুরূপভাবে ঐ ধর্মীয় আলেম কতখানি দৈন্য ও নিঃস্ব অসহায়, যা জ্ঞান-বিজ্ঞান, গভীর বিচ্ছুরণশীল ভাষা ও বুদ্ধি-মেধার অধিকারী। অথচ তার চোখ ভালবাসার এক অশ্রু এবং মনের এক ব্যাকুলতা সম্পর্কেও অজ্ঞ। যার ভাগে নিছক এই পুণ্যভূমির রূক্ষতা ও উষ্ণতা জুটেছে; শীতলতা ও আর্দ্রতা জুটেনি।

دلِ ملا گرفتار غمے نیست — نگاہے ہست در چشمش نمے نیست

ازاں بگریختم از مکتب او — کہ در ریگ حجازش زمزمے نیست

তিনি বলেন, আমি একবার গাইরুল্লাহর উপর ভরসা করেছিলাম। এর শাস্তি হিসেবে আমাকে দুইশতবার স্বস্থান থেকে নিচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এটি সেই স্থান, যেখানে তরবারী-হাতিয়ার এবং চমৎকার কৌশল কাজে আসে না, একটি আল্লাহর তাকদীর, সিদ্ধান্ত ও ইচ্ছার স্থান। এখানে মানুষের একটি পদস্খলন তাকে অনেক নিচে নামিয়ে দিতে পারে।

دلِ خود را بدستِ کس ندادم — گرہ از روئے کار خود کشادم

بغیر اللہ کردم تکیہ یک بار — دو صد بازار مقامِ خود فتادم

তিনি বলেন, এই ইখলাসহীনতা, একাগ্রতা ও মনোব্যথা শূন্যতার মুহূর্তে, যা কল্যাণ ও উপকারিতা ছাড়া অন্য কিছুর সাথে অপরিচিত এবং যার কৃত্রিম ও পশু প্রকৃতির মন-প্রাণ সর্বপ্রকার সূক্ষ্ম অনুভূতি ও একনিষ্ঠ আগ্রহ-উদ্যম থেকে অক্ষম, আমার জন্য অর্ন্তজ্বালার আগুনে পোড়া এবং কলিজার রক্তপান ছাড়া আর কী?

نگاہم زانچہ بینم بے نیاز است — دل از سوزِ درونم در گداز است

من و ایں عصر بے اخلاص و بے سوز — بگو با من کہ آخر ایں چہ راز است

তিনি বলেন, পূর্ব পশ্চিমে কোথাও আমার কোনও সমমনা-সহমর্মী নেই। আমি আমার মনোকষ্ট-মনোব্যথা স্বয়ং নিজের মনের সাথেই বলি এবং নিজেই তিরস্কার করি।

من اندر مشرق ومغرب غریبم — کہ از یاران محرم بے نصیبم
غم خود را بگویم باول خویش — چہ معصومانہ غربت را فریبم

আল্লামা ইকবাল (র) অভিযোগ করে বলেন, তার একনিষ্ঠ উপদেশমালা ও পরামর্শগুলোর উপর কেউ আমল করেনি। তার ইলমের বৃক্ষের ফল কেউ ভক্ষণ করেনি। তিনি কবিতায় অদৃশ্য আনন্দের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে কেউ কর্ণপাত করেনি। সবাই তাকে বাস্তবতার ব্যাখ্যাতা মনে করার পরিবর্তে গজল ও সংগীত পরিবেশক ভেবেছে।

بآں رازے کہ گفتم پے نبردند — زشاخ نخل من خرما نخوردند
من اے میرا مم داد از تو خواہم — مرایا راں غزل خوانے شمردند

তিনি রাসূলে কারীম (সা) এর কাছে অভিযোগ করেন, আপনার হুকুম ও নির্দেশ তো হল, মানুষকে জীবন ও চিরস্থায়ীত্বের পয়গাম পৌঁছাও। কিন্তু অসত্যপন্থী আমার কাছে দাবী করছে যে, আম পেশাদার কবি-সাহিত্যিকদের মত আমিও যেন মানুষের মৃত্যু তারিখ বের করি এবং ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পেশ করতে থাকি।

تو گفتی ازحیاتجاوداں گوئے — بگوش مردۂ پیغام جاں گوئے
ولے گویند ایں ناحق شناساں — کہ تاریخ وفات ایں واں گوئے

তিনি অত্যন্ত ব্যথাভারাক্রান্ত, অন্তর্জ্বালা, আক্ষেপ ও তিক্ততার সাথে অনুযোগ করে বলেন, যে জ্ঞান-ইলম ও বাণী তাঁর কবিতার প্রাণ ও আসল মূল্যমান, সে সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ কম। তাতে তিনি খুবই আত্মতুষ্টি ও দুনিয়াবিমুখতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার সমুদয় সম্পদ খুলে বাজারে রেখে দিয়েছি। কিন্তু এই দুর্লভ সামগ্রীর কোনও ক্রেতা পাইনি। আমি ঐকান্তিক উপহার পেশ করতে চেয়েছি, কিন্তু তারও কোনও মূল্যদাতা দৃষ্টিগোচর হয়নি। আমার চেয়ে বেশি বিশ্বদরিদ্র, অপরিচিত, নিঃস্ব-অসহায় এই পৃথিবীতে আর কে হতে পারে?

ولے برکف نہادم، دلبرے نیست — متاعے داشتم غارت گرے نیست
دروں سینہ من منزلے گیر — مسلمانے زمن تنہا ترے نیست

অবশেষে তিনি সুলতান ইবনে সউদকে সম্বোধন করেন, কিন্তু তার বাচনভঙ্গি বস্তুতঃ সকল আরব সম্রাট এবং মুসলিম বিশ্বের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ইংগিতবহ। এখানে তিনি ভিন্ন রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীলতার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তদস্থলে আল্লাহ্ তা'আলার উপর এবং এরপর আত্মনির্ভরশীলতায় আস্থা ও বিশ্বাস রাখার আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রশি যদি তোমাদের হয়, তাহলে যখন যেখানে খুশি তাবু স্থাপন করতে পারবে এবং সর্বত্রই মনযিল ও ঘর বানাতে পারবে। নতুবা তোমরা ভাড়া নিয়ে কিংবা ঋণ করে স্বাধীনভাবে কোথাও পা বাড়াতে পারবে না।

তিনি বলেন, নিজেকে একটু চেনার চেষ্টা কর। এই নিখিল বিশ্বে তোমরা এমন মর্যাদার অধিকারী, যার সন্ধ্যাও অন্যদের নির্মল প্রভাতের চেয়ে অধিক উজ্জ্বল-স্বচ্ছ দর্পণ।

ترا اندر بیابانے مقام است   کہ شامش چوں سحر آئینہ فام است
بہر جائے کہ خواہی خیمہ گستر   طناب از دیگراں جستن حرام است

নিখিল জাহানে রয়েছে তোমার
এমনই উঁচু মর্যাদার আসন,
সন্ধ্যা যেখানে নির্মল প্রভাত
পরাজিত স্বচ্ছ আয়না-বাসন।
যেখানে খুশি বাঁধিতে পার
তোমার সখের তাবু,
রশি-খুঁটি সবি যে তোমার
করিবে কে তোমায় কাবু?

নৈকট্য ও আনন্দ

তাকিয়ে দেখুন! ঐ দুই দিগন্তেই সারিসারি পর্বতমালা। কি যে আশ্চর্য! রাসূলে কারীম (সা) এর উটনী হেলে দুলে এ পথ দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। এই পরিবেশের মনোহারিতা, এই বায়ূ-সমীরনের মিশ্‌কতুল্য সুঘ্রাণ তো এ কারণেই ছিল যে,

الا إن وادی الجزی اضحی ترابه + من المسك كافورا واعواده رندا

وما ذاك إلا ان هندا عشية + تمشت وجرت فی جوانبه بردا

এই তো মীসাজদ (মদীনার পথে একটি স্থানের নাম) এসে গেল! এখন বীরে আলী (যুলহুলাইফাহ) এর পালা!

منزل دوست چوں شود نزدیک

آتش شوق تیز تر گردد!

'বন্ধুর বাড়ি যবে কাছে এলো,

অন্তর্জ্বালা আরও বেড়ে গেল।'

মুখে দরূদ শরীফ। প্রেম আগুনে অন্তর উদ্বেলিত। আরবী ড্রাইভার বিস্ময়ে হতবাক- এই অনারবী লোকটা কী পড়ছে। কেন অঝোর ধারায় অশ্রুসিক্ত হচ্ছে। কখনও আরবীতে গোঙ্গাচ্ছে! কখনও অন্য ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। হালকা হালকা চাঁদের আলো। মদীনা শরীফ যতই কাছে আসছে, বাতাসের শীতলতা, পানির মিষ্টতা ও ঠাণ্ডা, কিন্তু মনের উষ্ণতা বাড়ছে। শুনুন কে যেন বলছে,

بادِ نسیم آج بہت مشکبار ہے　　شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلف یار ہے

وہ ایک بار ادھر سے گئے مگر اب تک　　ہوائے رحمت پروردگار آتی ہے

عجب کیا گر مہ وپرویں مرے نخچیر ہوجائیں　　کہ برفتراک صاحب دولتے بستم سرخودرا

وہ دانائے سب ختم الرسل مولائے کل جس نے　　غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا

خاک یثرب از دو عالم خوشتر است　　اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

داغِ غلامیت کرد رتبۂ خسرو بلند　　میر ولایت شود بندہ کہ سلطاں خرید

محمد عربی کا بروے ہردوسر است　　کسے کہ خاک درش نیست خاک برسراو

ধরুন! যুলহুলাইফা এসে গেল। রাতের বাকী অংশ এখানে কাটাতে হবে। গোসল করলেন। সুগন্ধি লাগালেন। খানিক আরাম নিন এবং কোমর সোজা করুন। সকাল হল। নামায পড়লেন। গাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে। কী, যেখানে কপাল ঠুকে আসা উচিৎ ছিল, সেখানে মোটর গাড়ীতে চড়ে যাবেন? ড্রাইভারের পাশে বসায় কাজ হল। 'আতীক উপত্যকায় বীরে উরওয়াহ'র এর কাছে নামিয়ে দিবে। সামানপত্র নারী ও দুর্বলরা আরোহিত থাকবে। কথায় কথায় বীরে উরওয়াহ এসে গেল। আল্লাহর নামে নেমে আসুন। দেখুন। জাবালে উহুদ (উহুদ পাহাড়) দেখা যাচ্ছে। ذلك جبل يحبنا ونحبه (ঐ তো পাহাড়! যা আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তা ভালবাসি।) ঐ তো মদীনা নগরীর গাছপালা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এ কি সেই বৃক্ষলতা, যার সম্পর্কে মরহুম শহিদী বলেছিলেন-

تمنا ہے درختوں پر ترے روضہ کے جا بیٹھے
قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا

ঐ তো সবুজ গম্বুজ। মনপ্রাণ সামলে নিন। পা বাড়ান। আগে চলুন। মদীনায় প্রবেশ করুন। মসজিদে নববীর প্রাচীরের নিচে বাবে মজীদী দিয়ে অতিক্রম করে বাবে জিবরীলে গিয়ে দাঁড়ান। নৈকট্য পাওয়ার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কিছু হাদিয়া দান করলেন এবং ভিতরে প্রবেশ করলেন। মেহরাবে নববীতে গিয়ে দু' রাকাত নামায আদায় করলেন। পাপ-পঙ্কিল চক্ষুযুগলকে কলিজার পানি দিয়ে আত্মশুদ্ধির গোসল দিলেন; অযু করলেন। তারপর নবীজীর মুবারক দরবারে গিয়ে হাজির হলেন।

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله، الصلوة والسلام عليك يا نبى الله، الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلوة والسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم، الصلوة والسلام عليك يا رافع لواء الحمد يوم القيامة، الصلوة والسلام عليك يا صاحب المقام المحمود، الصلوة والسلام عليك يا مخرج الناس باذن الله من الظلمات الى النور، الصلوة والسلام عليك يا مخرج الناس من عبادة العباد الى عبادة الله وحده، الصلوة والسلام عليك يا مخرج الناس من جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة، الصلوة والسلام عليك يا صاحب النعمة الجسمة، الصلوة والسلام عليك يا صاحب المنة العظمة، الصلوة والسلام عليك يا امن خلق الله على خلق الله اشهد ان لا اله الا الله وحده وانك عبده ورسوله قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت فى الله حق جهاده وعبدت الله حتى

اتاك اليقين، فجزاك الله عن هذه الامة خير ما جزى نبيا عن امته ورسولا عن خلقه اللهم ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما بركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد.

"আপনার উপর অফুরন্ত রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক হে আল্লাহর রাসূল! –হে আল্লাহর নবী! –হে আল্লাহর প্রিয়তম! –হে মহান চরিত্রের অধিকারী! –হে কিয়ামত দিবসে আল্লাহর প্রশংসার ঝাণ্ডা সমুন্নতকারী! –হে প্রশংসিত স্থানের অধিকারী! –ওহে আল্লাহর হুকুমে বিশ্ব মানবকে বহুমুখী তমসাচ্ছন্নতা থেকে আলোর পথে বেরকারী! –ওগো, বান্দাকে বহুত্ববাদের দাসত্ব থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বে প্রবিষ্টকারী! –হে ধর্ম-বর্ণের শোষণ থেকে বের করে মানুষকে ইসলামের সাম্য-ন্যায় ও ইনসাফের ছায়াতলে প্রবিষ্টকারী এবং দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে বের করে পরকালের বিশাল প্রশস্ততায় পৌঁছিয়ে দাতা! –ওহে মানবতার সবচেয়ে বড় ত্রাতা বন্ধু! –হে মানুষের উপর সবচেয়ে বড় সুহৃদ দরদী। –ওহে সেই ব্যক্তিত্ব, আল্লাহর পরে সৃষ্টিজীবের উপর যার সর্বাপেক্ষা বেশি অনুগ্রহ-দান! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ইবাদত-উপাসনার যোগ্য আর কেউ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। আপনি আল্লাহর বাণী পুরোপুরি পৌঁছে দিয়েছেন। আমানত রক্ষা করেছেন। উম্মতের হিতাকাঙ্ক্ষা ও মঙ্গলকামিতায় ত্রুটি করেননি। আল্লাহর রাস্তায় পুরোপুরি চেষ্টা করেছেন। মৃত্যুবধি আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এই উম্মত এবং তার সকল সৃষ্টিজীবের পক্ষ থেকে এমন উত্তমতর প্রতিদান দিন, যা কোন নবী-রাসূল তার উম্মত ও আল্লাহর সৃষ্টিজীবের পক্ষ থেকে পেয়ে থাকেন– হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সা) কে নৈকট্য ও সুউচ্চ মর্যাদা এবং সেই সম্মানিত প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাকে দিয়েছেন। আপনি নিশ্চয় স্বীয় প্রতিশ্রুতর বরখেলাপ করেন না। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ (সা) -এর উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর আপনার অফুরন্ত রহমত বর্ষিত করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইবরাহীম আ. এর তাঁর পরিবারবর্গের উপর রহমত অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত এবং অতি মহান। হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ (সা) এবং তার পরিবার-পরিজনের উপর অবারিত বরকত বর্ষণ করুন, যেভাবে আপনি হযরত ইবরাহীম আ. এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর অবতীর্ণ করেছেন। নিঃসন্দেহে আপনি অতি প্রশংসিত ও অতি মহান।"

এরপর দুই বন্ধু ও উযীরকে প্রেম নিবেদন এবং শ্রদ্ধার উপহার সালাম ও দু'আ রূপে পেশ করে অবস্থানস্থলে আসুন।

এখন কেবল আপনি এবং মসজিদে নববী। মনের কোনও সুপ্ত বাসনা যেন বাকী না থাকে। দরূদ শরীফ পাঠ করার এর চেয়ে উত্তম সময় ও উৎকৃষ্ট স্থান আর কী হতে পারে? এখনও যদি উপস্থিতি ও নৈকট্য লাভ না হয়, তাহলে আর কবে হবে! জান্নাতের উদ্যানে "روضة من رياض الجنة" নামায পড়ুন। তবে লক্ষ্য রাখবেন, কারও যেন এতটুকু কষ্টও না হয়। ভীড় জমানো, কোন স্থান নিজের জন্য সংরক্ষণ করা, মসজিদে দৌড়াদৌড়ি করা সর্বত্রই নিন্দনীয়। কিন্তু যেখান থেকে এই বিধান প্রচারিত ও দুনিয়াব্যাপী প্রসারিত হয়েছে, সেখানে তার বিপরীত বা বেয়াদবী করা জঘন্য ঘৃণিত। এখানে হৈ চৈ হবে না, উচ্চ আওয়াজ হবে না। "ان تحبط وانتم لا تشعرون" এখানে দুনিয়াবী কথা হবে না, মসজিদকে চলার পথ বানানো যাবে না। অযুবিহীন প্রবেশ করা থেকে যথাসম্ভব সতর্ক থাকবেন। ক্রয়-বিক্রয় থেকে বেঁচে থাকবেন।

দিনে যতবার খুশি হাজিরা দিবেন এবং দরূদ-সালাম পেশ করবেন। আপনার ভাগ্য খুলে গেছে। এখন কেন অলসতা বা ত্রুটি করবেন? তবে প্রত্যেকবার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সম্মান ও আদব এবং আগ্রহ-উদ্যম নিয়ে। মনের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। সে-ও ঘুমায়, জাগে, উঠে। মন জাগ্রত হলে বুঝবেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন। হাজিরা দিন এবং নিবেদন করুন–

زچشم آستیں برداو گوہر را تماشا کن

কখনও মন চাইবে গোলামের কাফেলার সাথে একাকার হয়ে হাজির হতে। প্রেমিকদের চক্ষুযুগল দিয়ে, যারা বিচ্ছেদ বিরহে কাটায় আর রাত্রি কাটে শোকাতুর– যখন অশ্রুমালার বৃষ্টি বর্ষিত হবে, তখন হতে পারে কোন ছিটা তাকেও ছুঁয়ে যাবে। রহমতের বাতাস যখন প্রবাহিত হবে, তখন হয়ত কোনও পরশ তারও লেগে যাবে। কখনও পায়া ভারী লোকদের চক্ষু ফাঁকি দিয়ে একাকী হাজির হতে মন চাইবে। এ সময় মনের সকল আবেগ-উচ্ছাস পূরণ করে নিন। কোনও আক্ষেপ-অনুতাপ যেন থেকে না যায়। কখনও শুধু অশ্রু দিয়ে মুখের কাজ করুন। কখনও আবেগ-উচ্ছাসের ভাষায় নিবেদন করুন। দরূদ দীর্ঘও আছে, সংক্ষিপ্তও আছে। মনে যা ধরে এবং যার প্রতি আগ্রহ জন্মে, তাই অবলম্বন করুন। তবে এতটুকু অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, তাওহীদ ও একাত্ববাদের সীমানা থেকে পা বের না হয়ে যায়। আপনি তাঁর সামনে দণ্ডায়মান, যার কাছে من ما شاء الله و شئت এবং

بعضهما ('যা আল্লাহ চান এবং যা আপনি চান' এবং 'যে তাদের দুজনার নাফরমানী করবে') শোনাও পছন্দ হয়নি।[৩] সিজদা তো দূরের কথা।[৪]

এখন আমরা মদীনা শরীফে অবস্থানরত। যেখানের মেথরীকেও অলি আল্লাহ ও রাজাবাদশাগণ সৌভাগ্য মনে করতেন। সেখানে আপনি সব সময় হাজির আছেন। এক এক দিন এবং এক এক মুহূর্তকে গণীমত মনে করুন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে নববীতে জামাতের সাথে পড়ুন। প্রয়োজনে বাইরে কোথাও যেতে হলেও এমন সময় যাবেন, যেন কোন জামাত ছুটে না যায়। তাহাজ্জুদে হাজির হবেন। এ সময় নীরবতার। মানুষ রওযায়ে জান্নাতের দিকে দৌড়ায়। সেখানে তো দৌঁড়ঝাপ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যতীত জায়গা-পানি পাওয়া মুশকিল। আপনি প্রথমে মুখোমুখি আসুন। এ সময় হয়ত আপনি শুধু প্রহরীকে (সৈন্য) পাবেন। প্রশান্তির সাথে সালাম নিবেদন করুন। তারপর যেখানে জায়গা পান, নফল নামায পড়ুন। অনন্তর সকালের নামায (ফজর নামায) ও ইশরাক পড়ে বাইরে আসুন।

এখন আসুন জান্নাতুল বাকীতে। যেটি আম্বিয়া কিরামের মাজারের পর সত্যতা ও ইখলাসের সবচেয়ে বড় কবরস্থান। কবির ভাষায়–

دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز

"সমাহিত হয়নি কোথাও কখনও এমন রত্নভাণ্ডার।"

আপনার যদি সীরাতে নববী (সা) এবং সাহাবায়ে কিরামের অবস্থা ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য থাকে, জ্ঞান থাকে, তাহলে সেখানে আপনার সঠিক উপলব্ধি হবে। আপনি প্রতিটি পদক্ষেপে থমকে দাঁড়াবেন। চাইবেন এক একটি মাটির স্তূপকে আপন চোখের অশ্রুমালায় সিক্ত করতে। এখানে এক একটি কোষে কোষে ঈমান, জিহাদ ও প্রেম-ভালবাসার ইতিহাস খোদাইকৃত। একেকটি স্তূপে

---

৩ হাদীস শরীফে আছে, জনৈক ব্যক্তি একবার বলল, ما شاء الله و شئت ('আল্লাহ যা চান এবং আপনি যা চান') রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করলেন, لجعلتنى لله ندا (তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমতুল্য বানিয়ে দিলে!) ما شاء الله وحده (যা কেবল আল্লাহই চাইবেন) বলবে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে- এক ব্যক্তি বক্তৃতা প্রদানকালে বলল- من يطع الله و رسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى (যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করল, সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হল, আর যে তাদের উভয়ের নাফরমানী করল, সে পথভ্রষ্ট হল।) রাসূলে কারীম (সা) তা অপছন্দ করলেন- আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর আলোচনা এভাবে একই শব্দে করা হবে, যাতে উভয়ের সমতার সংশয় জাগবে- এটা তিনি পছন্দ করলেন না। তিনি বললেন, بئس خطيب القوم انت -তুমি জাতির বড় নিকৃষ্ট বক্তা।

৪. রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত কায়েস ইবনে সা'দ রাযি. কে বললেন, তুমি যদি আমার কবরের পাশ দিয়ে যাও, তবে কি তথায় সিজদা করবে? কায়েস রাযি. বললেন, না। নবীজী বললেন, তাহলে আমাকে জীবদ্দশায়ও কর না। (আবু দাউদ; বিবাহ পর্ব)

ইসলামের রত্নভাণ্ডার গচ্ছিত। এবার জান্নাতুল বাকীতে প্রবেশ করলেন। গাইড আপনাকে সোজা পুন্যবতী আহলে বাইতের কবরস্থানে নিয়ে যাবে। সেখানে রাসূলে কারীম (সা) এর সম্মানিত চাচা সাইয়িদুনা আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি., নবীজীর কন্যা জান্নাতী রমনীদের সরদার হযরত ফাতেমা রাযি.. জান্নাতী যুবকদের সরদার হাসান ইবনে আলী রাযি., সাইয়িদুনা আলী ইবনে হুসাইন যাইনুল আবেদীন, সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ বাকির, সাইয়িদুনা জাফর সাদিক রাযি. প্রমুখ আরাম নিদ্রায় শায়িত আছেন। সেখান থেকে সামনে এগিয়ে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাযি. এবং (হযরত খাদিজা ও মাইমুনা রাযি. ব্যতীত) সকল আযওয়াজে মুতাহহারাত (মুহতারামা নবীপত্নীগণ) তারপর পূণ্যবতী নবীকন্যাগণের কবর দেখতে পাবেন। তারপর রয়েছে দারে আকীল ইবনে আবী তালিব। যেখানে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ও আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর রাযি. প্রমুখ শায়িত আছে। তার সামনে আপনি একাংশ পাবেন, যেখানে ইমাম দারুল হিজরাহ সাইয়িদুনা মালেক ইবনে আনাস সাহেবে মাযহাব এবং তার উস্তাদ নাফে' (র) আরাম করছেন। আরেকটু সামনে গিয়ে আপনি একটি বুকআয়ে আনওয়ার (পুণ্যভূমি) পাবেন। এটি এক মুহাজিরের প্রথম সমাধিস্থল। এখানে সেই উসমান ইবনে মাযউন রাযি,. সমাহিত করা হয়, যার ললাটে রাসূলে কারীম (সা) চুমো খেয়েছিলেন। এটিই নবীপুত্র সাইয়িদুনা ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ (সা) -এর স্বপ্নালয়। এখানেই ফকীহ সাহাবী সাইয়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ইরাক বিজেতা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি. সা'দ ইবনে মাআয রাযি. যার ইন্তিকালে স্বয়ং আরশে আযীমে কম্পন সৃষ্টি হয়েছিল, হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. ও অন্যান্য আকাবিরে সাহাবা রাযি. সমাহিত আছেন। সেখান থেকে সামনে এগিয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে প্রাচীর সংলগ্ন সেই সত্তরজন শহীদ সাহাবায়ে কিরাম ও মদীনাবাসী চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন, যাদেরকে ইয়াজীদের শাসনামলে ৬৩ হিজরীতে হিরাতের ঘটনায় শহীদ করা হয়েছিল। একেবারে কোনায় পূর্ব উত্তর দিকে ইমাম মুজলুম শহীদুদ দার ইসমান ইবনে আফফান রাযি. আরাম নিদ্রায় শায়িত। এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়ান। প্রেম-ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভরা যে অশ্রুস্রোত হযরত আবু বকর রাযি. এবং হযরত উমর ফারুক রাযি. এর কবরস্থানে প্রবাহিত হতে বাকি ছিল, সে অশ্রুমালা তাদের তৃতীয় সঙ্গীর মাটিতে বইয়ে দিন।

آسماں اس کی لحد پر شبنم افشانی کرے
سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

"আকাশ তার কবরে করিবে শিশিরপাত, আলোর মিনারা সে ঘরের রক্ষক।"

আরেকটু সামনে সাইয়িদুনা আবু সাঈদ খুদরী, হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওজহাহু, ফাতিমা বিনতে আসাদ রাযি. এর কবর। সবাইকে সালাম নিবেদন করুন এবং ফাতিহা পাঠ করুন। এরপর খানিক দাঁড়িয়ে পুরো বাকীতে শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার দৃষ্টি দান করুন। আল্লাহু আকবার! কত সত্য! তারা কত সত্যবাদী ছিলেন। এসব আল্লাহর বান্দা যা কিছু বলতেন, করে দেখিয়েছেন।

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه

মক্কায় যার হাতে হাত রেখেছেন, মদীনায় এসে তারই পদতলে লুটিয়ে পড়েছেন। কবির ভাষায়–

جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم

سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے

"তুমি বিনে বাঁচিতে মোদের দেয়নি যে সায়
সেই মহান প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে মোরা চলেছি তায়।"

সবুজ গম্বুজের প্রতি এক পলক তাকান। এরপর মদীনার এই নীরব শহরকে দেখুন। সততা ও ইখলাছ, দৃঢ়তা ও কৃতজ্ঞতার এর চেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যাবে? আসুন, জান্নাতুল বাকীতে ইসলামের খেদমত করার শপথ নিন। আর আল্লাহর কাছে দু'আ করুন– তিনি যেন আমাদেরকে ইসলামেরই পথে বাঁচিয়ে রাখেন এবং এরই সাথে কৃতজ্ঞতার মরণ হয়। জান্নাতুল বাকী'র পয়গাম এটিই। এখানের শিক্ষা তা-ই।

কুবাতেও হাজিরা দিন। এটি সেই পূণ্যভূমি, যা রাসূলে কারীম (সা) -এর পদচারণায় মদীনারও পূর্বে সম্মানিত হয়েছে। এখানে সেই মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর রাখা হয়েছে, যে মসজিদ.لمسجد أسس على التقوى من أول يوم এর সম্বোধন পেয়েছে। মুহাব্বত ও শ্রদ্ধার সাথে হাজির হোন। এই মাটিতে নামায পড়ুন। আপনার কপাল রাখুন সেই মাটিতে, যা রাসূলুল্লাহ (সা) এবং رجال يحبون أن يتطهروا তথা সাহাবায়ে কিরামের পদধূলিতে ধন্য হয়েছে। এই আবহাওয়া-পরিবেশে শ্বাস নিন, যেখানে আজও সেই পবিত্র ও পূণ্যাত্মাগণ অবস্থান করছেন।

بر زمینے کہ نشانِ کف پائے تو بود

سالہا سجدۂ صاحب نظراں خواہد بود

আজ উহুদ পাহাড় এবং সেখানকার শহীদগণের মৃত্যুস্থানে (আম জনশ্রুতিতে যাকে সাইয়িদুনা হামযা বলে) উপস্থিতির পালা। দুই তিন মাইলের দূরত্ব। কথায় কথায় পৌঁছে গেলেন। এটি সেই ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে

ইসলামের সবচেয়ে মূল্যবান রক্ত ঝরেছে। সবচেয়ে সত্য, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বোচ্চ প্রেম-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার পূণ্যস্মৃতি বিজড়িত ঘটনাবলি, যা পৃথিবীর পূর্ণ ইতিহাসে নেই, তা এখানে, এই মাটিতে সংঘটিত হয়েছে। শহীদগণের সরদার হযরত হামযা রাযি. এর নবীপ্রেম, রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুহাব্বত এবং ইসলাম রক্ষায়, ইসলামের কৃতজ্ঞতায় এখানেই অকাতরে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। তার কলিজা চিবিয়ে খাওয়া হয়েছে। আম্মার ইবনে যিয়াদ চোখ ঘষে ঘষে এখানেই জীবন দিয়েছেন। আনাস ইবনে নযর এ পাহাড়ের পাদদেশ থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনতে পেয়েছেন। আশিটিরও বেশি আঘাত খেয়ে এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। রাসূলে কারীম (সা) এর দাঁত মুবারক শহীদ হয়েছে এখানেই। মাথায় যখম এখানেই হয়েছে। তাঁর নিবেদিতপ্রাণ আশেক-প্রেমিকগণ এখানেই নিজ হাত-পেটকে প্রিয় প্রেমাস্পদের জন্য ঢাল বানিয়ে দিয়েছেন। মক্কার বিলাসপুত্র মুসআব ইবনে উমায়ের রাযি. এখানে একটি কম্বল গায়ে শহীদ হয়েছেন এবং একটি কম্বলে সমাহিত হয়েছেন। এখানেই ইসলামের সিংহ শায়িত আছেন। এই পূর্ণ জমিন নবুওয়াত মশালের সফল মাটি। রাসূলুল্লাহ (সা) -এর আশেক এবং ইসলামের নিবেদিত প্রাণ মানুষের আবাসভূমি।

یہ بلبلوں کا صبا مشہد مقدس ہے قدم سنبھال کے رکھیو یہ تیرا باغ نہیں

এতো গানপাখিদের পূবালী হাওয়া
শহীদের স্মৃতিমাখা পূণ্যভূমি,
ওহে কদম তোমার সামলে রাখ
এ তোমার হাতে গড়া বাগান নাহী।

এখানকার আবহাওয়া-পরিবেশ, এখানকার পর্বতমালা এখনও موتوا على ما مات عليه رسول الله (সেজন্য জীবন দাও, যার উপর রাসূলে কারীম (সা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।) এর আহ্বান বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আসুন! ইসলামের উপর বেঁচে থাকা এবং জীবন দানের শপথ ও অঙ্গীকার পুনর্বার তাজা করুন।

মদীনা তাইয়িবার অনুকণাগুলোকেও ভালবাসা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখুন। ঘৃণার দৃষ্টি ও সমালোচনার জন্য সারা দুনিয়া পড়ে আছে। জীবনের কিছুদিন কণ্টকমুক্ত কেটে যাবে, তাতে ক্ষতি কী? তারপরও যদি আপনার দৃষ্টি কোথাও বাঁধাগ্রস্থ হয়, থমকে যায়, তাহলে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার সাথে কাজ নিন। তা আমাদের ত্রুটি ছাড়া আর কী? আমরা দীন-দুনিয়ার কল্যাণ এখান থেকেই পেয়েছি। মনুষ্যত্ব এখানেই শিখেছি। যদি এখানের সাহায্য-তত্ত্বাবধান না হত,

তাহলে আমাদের কত লোক (মা'আযাল্লাহ) দেবালয়-মন্দির, অগ্নিকুণ্ড ও গীর্জায় পড়ে কপাল ঠুকত। কিন্তু আমরা তার কী অধিকার সংরক্ষণ করেছি! কী মূল্য পরিশোধ করেছি! এখানকার শিশুদের শিক্ষাদীক্ষা, এখানকার মানুষের মাঝে দ্বীনের প্রাণ ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধ সৃষ্টির কী চেষ্টা করেছি? দূরত্বের আপত্তি যথার্থ নয়। সেখানের মহান বুযুর্গগণ সমুদ্র ও মরুভূমি পাড়ি দিয়ে পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে ধর্মের বাণী-দ্বীনের পয়গাম আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা কি আদৌ কখনও নিজের দায়িত্ব উপলব্ধি করেছি? আমরা মনে করি– দ্বীনের ইহসান, ধর্মের অনুগ্রহের বদলা আমরা সামান্য নীরবতার মাধ্যমে আদায় করে দিব, যাকে আমাদের হাজীগণ নিজের অদূরদর্শীতা ও অজ্ঞতার কারণে ইহসান মনে করে মদীনার অলিতে-গলিতে বিলি করে বেড়ায়।

মদীনা ইসলামী দাওয়াতের রত্নখনি। এই দাওয়াত এখান থেকে অর্জন করুন। নিজ নিজ দেশের জন্য সেই শান্তির সওগাত বয়ে নিয়ে আসুন। রকমারি খেজুর, গোলাপ ও পুদিনা, ঔষধি মাটি– প্রেম ভালবাসার চোখে সবকিছুই আছে। কিন্তু এই পূণ্যভূমির আসল উপহার এবং এখানকার সবচেয়ে বড় সওগাত হচ্ছে, দাওয়াত এবং ইসলামের জন্য চেষ্টা-সাধনা, সংগ্রাম ও জীবন দানের দীপ্ত শপথ। মদীনা, মসজিদে নববীর অনুকণা, জান্নাতুল বাকীর ধূলিবালি, উহুদের প্রতিটি কঙ্কর থেকে এই বাণী-আহ্বান শোনা যায়। মদীনায় গিয়ে কেউ কিভাবে ভুলতে পারে যে, এ শহরের ভিত্তি স্থাপনই হয়েছে দাওয়াত ও জিহাদের ওপর। এখানে সেসব লোকই মক্কা থেকে এসে জনবসতি গড়ে তুলেছিলেন, যাদের মক্কায় সবকিছু ছিল। কিন্তু দাওয়াত ও জিহাদের সুযোগ ছিল না। এখানকার জনবসতি দু'ভাগেই বিভক্ত ছিল। প্রথমতঃ যারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণ করে দিয়েছে এবং ইসলামের পথে জীবন-প্রাণকে জীবনদাতার জন্য সঁপে দিয়েছে। দ্বিতীয়তঃ যারা নিজেদের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার তখনও তাদের দ্বারা আরও কাজ নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, তাদের যতটা সময় অতিবাহিত হত, অপেক্ষায় কাটত। শাহাদাত লাভের অধীর আগ্রহে অতিবাহিত হত। কুরআনে এসেছে–

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتر وما بدلو تبديلا.

মুসলিম বিশ্বের অবস্থা এরূপই হওয়া উচিত। এখানেও হয়ত তদ্রুপ হওয়া উচিত, যারা নিজ নিজ কাজ পূর্ণ করে ফেলেছে অথবা যারা সময়ের অপেক্ষায় আছে। আর তৃতীয় শ্রেণীর লোক হচ্ছে, যারা জীবনের মোহগ্রস্থ, দুনিয়ার প্রতি লালায়িত, দুনিয়া পেয়ে সন্তুষ্ট, মৃত্যু ভয়ে ভীত এবং খেদমত থেকে বিমুখ। জীবন জীবিকা নিয়ে আপাদমস্তক নিমজ্জিত এবং ক্ষণস্থায়ী ও

জাগতিক কর্মব্যস্ততায় সর্বশরীরে ডুবে আছে। তাদের স্থান না ছিল মদীনায় আর না ইসলামী বিশ্বের কোথাও হওয়া উচিৎ।

এবার মনে করুন, মদীনায় অবস্থানের সময় ফুরিয়ে এল। বলা হচ্ছে, আগামী দিন কাফেলা যাত্রা করবে।

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد
روئے گل سیر ندیدیم وبہار آخر شد

এবার থেমে থেমে এই অবস্থানের সুবাধে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো এবং এখানের মর্যাদা রক্ষায় নিজের ব্যর্থতা ও অযোগ্যতাগুলো মনের মধ্যে কামড় দিচ্ছে। তাই এখন ইস্তিগফার, অনুতাপ-অনুশোচনা ছাড়া আর উপায় কী? আজকের রাত মদীনার শেষ রাত। একটু ভোরেই মসজিদে চলে আসুন।

تمتع من شميم عرار نجد + فما بعد العشية من عرار.

অবশ্য মনে এতটুকু সান্ত্বনা, একটু স্বস্তিও আছে। শেষ এখন কোথায় যাচ্ছেন? আল্লাহর রাসূলের শহর ছেড়ে আল্লাহর শহরের দিকে। আল্লাহর ঘরের কাছে, যাকে হযরত মুহাম্মাদ (সা) এবং তাঁর সাথীবর্গ সাহাবায়ে কিরাম তাদের পবিত্র হাতে নির্মাণ করেছেন। আল্লাহর সেই ঘরের দিকে, যা তাঁর পিতামত হযরত ইবরাহীম ও তাঁর পুত্র নিজের পুণ্যময় হাতে তৈরী করেছেন। আর কেন যাচ্ছেন? আল্লাহর নির্দেশে এবং রাসূলে কারীম (সা) এর মর্জি ও হিদায়াত পেয়ে। এই দূরত্ব কবে দূরত্ব হয়েছে? এই বিচ্ছেদ কবে বিরহের?

نہ دوری دلیل صبوری بود
کہ بسیار دوری ضروری بود

আখেরী সালাম নিবেদন করলেন। মসজিদে নববীর প্রতি আক্ষেপের দৃষ্টি দিলেন এবং বাইরে বেরিয়ে এলেন। গোসল করে ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। যুল-হুলাইফা যাবেন, এ সুযোগ হোক বা না হোক। গাড়ীতে চড়ে বসলেন। প্রিয় শহরের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে রইলেন। এগিয়ে চললেন সম্মুখে। উহুদ পাহাড় হারিয়ে গেল। দু'চোখে গভীরভাবে দেখলেন। এখন মদীনা থেকে বাইরে চলে এলেন। যতই সময় যাচ্ছে, মদীনা দূরে চলে যাচ্ছে আর মক্কা কাছে আসছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা হারামাইনের মাঝেই আছি। কবির ভাষায়–

শত সহস্র শোকরিয়া!
আমরা দুই অনুগ্রহকারীর মাঝেই আছি।

মদীনার স্মৃতি

লোকজন আমার কাছে আবেদন করল, হিজাযের কিছু কথা শোনান। সেখানে আপনি যা কিছু দেখলেন, তা আমাদেরও দেখান। এই আবেদন আমার শিরোধার্য। কারণ "প্রিয়জনের স্মরণ তার মিলনের চেয়ে কম নয়।"

সেদিনের কথা আমার মনে নেই, যেদিন মক্কা-মদীনার নাম আমার কাছে নতুন ছিল। আর সেটিই ছিল প্রথমদিন, যখন আমি রাসূলে কারীম (সা) -এর পূণ্যময় জন্মস্থান এবং ইসলামের দোলনা রাসূলুল্লাহ (সা) -এর শহর দারুল হিজরাহ সম্পর্কে কিছু শুনেছি।

আমি সকল মুসলিম শিশুদের মত এমন এক পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছি, যেখানে হিজায এবং ঐ পবিত্র শহর দু'টির আলোচনা চলত। আমার ভালভাবে স্মরণ আছে, মানুষ দ্রুততার সময় প্রায় 'মক্কা-মদীনা' বলত। যেন তা একটি মাত্র শহরের নাম। তারা এ শহর দু'টির কোনও একটি সম্পর্কে আলোচনা করলে অবশ্যই অপরটিরও উল্লেখ করত। তাদের কথায় আমি মনে করতাম, এ মক্কা-মদীনা একটি শহরের নাম। আমার এই পার্থক্যজ্ঞান তখন হয়েছে, যখন আমি কিছুটা বড় হয়েছি এবং কিছুটা জ্ঞানবুদ্ধি হয়েছে। তখন আমি বললাম, এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র শহর। এতদুভয়ের মাঝে দূরত্বও কম নয়।

আমি শৈশবে যেভাবে মানুষকে জান্নাত এবং তার নেয়ামতরাজির আলোচনা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে করতে শুনেছি, তদ্রুপ হিজায এবং তার দু'টি শহরের আলোচনাও করতে শুনেছি। জান্নাত লাভ করা এবং হিজায দেখার তীব্র বাসনা তখন থেকেই আমার মনে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল।

আমি যখন আরেকটু বড় হলাম এবং বুঝলাম, জীবদ্দশায় জীবন্ত চোখে জান্নাত দেখা সম্ভব নয়, তবে হিজায পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব। হিজাযে কাফেলা বরাবরই আসা-যাওয়া করে। তখন আমি বললাম, তাহলে ঈমানের এই জান্নাত সফল কেন করব না? কেন ঘুরে আসব না নৈসর্গিক এই জান্নাত! দিনের পর দিন যেতে লাগল আর আমিও বড় হতে লাগলাম। এরপর যখন আমি রাসূলে কারীম (সা) -এর পবিত্র সীরাত (জীবন চরিত) এবং ইসলামের ইতিহাস পাঠ করলাম, তখন আমার সেই পুরনো আগ্রহ-বাসনা সজীব-প্রাণবন্ত হয়ে গেল। আদরে আদরে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়ানো আকাঙ্ক্ষাগুলো

জেগে ওঠল। আর আমি অহর্নিশ হজ্জ ও যিয়ারতের অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনতে লাগলাম। তারপর এমন হল যে, আমি সে জায়গায় এসে পৌঁছলাম, যেখানকার মাটিতে না কোমল ঘাস-গুল্মের বিছানা আছে আর না তার কোল ঘেষে নদীরা ছুটে গেছে। তার চতুর্পার্শ্বে পাহাড়-পর্বত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু হাফিযের ভাষায়–

نہ اس میں گھاس اگتی ہے نہ اس میں پھول کھلتے ہیں
مگر اس سرزمیں سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں

না জন্মে সেখানে তৃণলতা
আর না ফোটে ফুল
আকাশও তবু লুটিয়া হেথায়
লভিয়াছে মরুর ধূল।

আমি বাহ্যিক সৌন্দর্যশূন্য এই ভূ-খণ্ড দেখে মনে মনে বললাম, এ শহর নয়নাভিরাম দৃশ্যপট ও মনোহারিতা থেকে কতটা রিক্তহস্ত! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও চিন্তা করলাম যে, এ শহরই তো মানবতা ও সভ্যতার উপর কত বড় অনুগ্রহ করেছে! যদি এ শিল্পকর্ম শূন্য এই শহর ধরাপৃষ্ঠে না হত, তাহলে পৃথিবী হত স্বর্ণের এক পিঞ্জিরা আর মানুষ হত নিছক বন্দি। এটিই সেই শহর, যা মানুষকে পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে বের করে বিশাল প্রশস্ততার সাথে পরিচিত করেছে। বিশ্ব মানবতাকে তার হারানো নেতৃত্ব এবং ভূলুণ্ঠিত স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিয়েছে। এ শহরই মানবতার উপর চাপিয়ে দেওয়া ভারী বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। সেই হাতকড়া, বেড়ি ও শিকল ছিন্ন করেছে, যা জালিম-শোষক, রাজা-বাদশা এবং অনভিজ্ঞ মূর্খ শাসক-বিচারকগণ তৈরী করে রেখেছিল।

যখন আমি চিন্তা করলাম, 'যদি এই শহর না হত', তখন আমার মনে হল, আমি পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলোর সাথে এ শহরের তুলনা করব এবং দেখব, যদি এই শহরের অভ্যুদয় না হত, তাহলে বিশ্ব সভ্যতা, বিশ্ব মানবতা ও মনুষ্যত্বে কী ক্ষতি ও ঘাটতি হত!

আমার সম্মুখে এক একটি শহর ভেসে উঠল। আমি দেখলাম, এসব শহর মুষ্ঠিমেয় কিছু মানুষের জন্য প্রাণচঞ্চল ও জনাকীর্ণ ছিল। তারা মানবতার তেমন কিছু বৃদ্ধি করেনি। এরা বিভিন্ন যুগে মানবতা ও সভ্যতার দুশমন ছিল। নিজের সামান্য স্বার্থের জন্য বহুবার একটি শহর অসংখ্য শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছে। এক জাতি বহু জাতিকে নিজের খোরাক বানিয়েছে। কত শত বার কয়েকজন মানুষের জন্য হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এটি এক বাস্তব সত্য যে, পৃথিবীর

মানচিত্রে যদি ঐ শহর না থাকত, তাহলে মানবতা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির কোন বিকৃতি ঘটত না। পৃথিবীতে বড় কোন ঘাটতি বা ত্রুটি দেখা দিত না। কিন্তু যদি মক্কা শহর না হত, তাহলে বিশ্ব মানবতার সেসব আত্মিক তাৎপর্য, স্বার্থকতা, বাস্তবতা, সূক্ষ্মতা, আখলাক-চরিত্র, ঈমান-আকীদা, জ্ঞান-প্রজ্ঞা, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব থেকে রিক্ত হস্ত হত, যা তার সবচেয়ে মূল্যবান পুঁজি এবং তার সর্বাপেক্ষা বড় সৌন্দর্য। এরই বদৌলতে পৃথিবী ঈমানের সেই শ্বাশত চিরন্তন সম্পদ ফিরে পেয়েছে, যা মানুষ বিনষ্ট করে ফেলেছিল। বিশ্ব সেই সঠিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা লাভ করেছে, যা সংশয়-সন্দেহ ও ধারণার পর্দায় আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবী পুনরায় সেই ইজ্জত-সম্মান পেয়েছে, যা দাম্ভিক-অহংকারী, অবাধ্য জালিমদের হাতে কবরস্থ হয়ে গিয়েছিল। বস্তুতঃ এখানে মানবতা পুনর্জন্ম লাভ করেছে। ইতিহাস মোড় নিয়েছে নবদিগন্তে।

কিন্তু আমার কী হল– আমি যে বলছি, যদি মক্কা না হত? যদি মক্কা না হত, তাহলে কী হয়ে যেত? মক্কা তো তার অনুর্বর শুষ্ক পর্বতমালা, বালুকাময় উপত্যকা বরং কা'বা ঘর এবং বরকতময় যমযম কূপকে ষষ্ঠ খৃস্ট শতক থেকেই তার কোলে নিয়ে আছে। আর মানবতা শ্বাস ভারী ও ওষ্ঠাগত হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সাহায্যের কোনও হাত বাড়ায়নি। মক্কা তখনও শুষ্ক পাহাড়-পর্বত, প্রস্তরাকীর্ণ উপত্যকা বেষ্টিত, দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন এমনভাবে দিন কাটাচ্ছিল, যেন মানব গোত্রের সাথে তার কোনও সম্পর্কই ছিল না। বিশ্বের মানচিত্র ছিল ভিন্ন।

কাজেই আমাকে বলতে হবে, মক্কা নয় বরং মক্কার সেই মহান প্রজন্ম ও মানুষগুলো যদি না হত, যারা ইতিহাসের গতিধারা বদলে দিয়েছে, জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে এবং পৃথিবীকে নতুন পথ, নতুন এক দিগন্ত দেখিয়েছে, তাহলে পৃথিবীর চিত্র এমন হত না।

এসব ভাবতে ভাবতে আমার চোখের পাতায় কয়েকটি দৃশ্যপট ভেসে ওঠে। আমার কাছে এমন মনে হতে লাগল, যেন কুরাইশ সরদার একাকী কা'বা শরীফ তাওয়াফ করছেন। মানুষ তাকে বিদ্রুপ করছে। তাকে কটুক্তি ছুঁড়ে মারছে। অশ্রাব্য কথা বলছে। কিন্তু চরম ধৈর্য ও আত্মতৃপ্তির সাথে তাওয়াফ করছেন তিনি।

যখন তিনি তাওয়াফ সমাপ্ত করলেন, কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু কা'বাঘরের মুতাওয়াল্লী চাবিরক্ষক উসমান ইবনে তালহা তাকে কঠোরভাবে বাঁধা দিচ্ছে। সরদার ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে কাজ নেন। সরদার বললেন, 'উসমান! সেদিনটি কেমন হবে, যখন এই চাবি থাকবে আমার হাতে আর আমি যাকে খুশি তা দিয়ে দেব?' সরদার জবাব দেন, 'না! বরং সেদিন তারা প্রকৃত মর্যাদা পাবে।' অনন্তর আমি দেখলাম, ঐ সরদার মক্কা

বিজয়ের দিন কা'বাঘর তাওয়াফ করছেন। সঙ্গে তার সেসব সাথীবর্গ, যারা নিজেদেরকে তার জন্য কুরবান করে দিয়েছিল। তার চতুর্পার্শ্বে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সে সময় তিনি কা'বা চাবিরক্ষককে ডেকে আনালেন এবং বললেন, 'উসমান! নাও, এই তোমাদের চাবি। আজকের দিন নেক আমল এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষার, ওয়াদা পূরণের দিন।'

ইতিহাস সাক্ষী, তিনি নিছক ঐ চাবিরই মালিক হননি, যার দ্বারা কা'বা শরীফের দরজা খুলতে পারতেন বরং তার কাছে সেই চাবিও ছিল, যার দ্বারা শাসক-দার্শনিকের পক্ষে অদ্যাবধি খোলা সম্ভব হয়নি। এই চাবি কুরআন মাজিদ, তার তাঁর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে; রিসালত, যা তাকে প্রদান করা হয়েছে, যা মানবতার সকল সমস্যা-সংকট নিরসন করতে পারে এবং সর্বকালের সকল জটিলতার সমাধান দেয়।

হজ্ব পালন শেষে অন্তর্জ্বালা ও আগ্রহের ডানায় ভর করে মদীনা মুনাওয়ারার দিকে চললাম। মুহাব্বাত ও কৃতজ্ঞতার আকর্ষণ আমাকে মদীনার দিকে স্বভাবতই হাতছানি দিচ্ছিল। পথের ভীড়কে আমি রহমত মনে করেছিলাম। আমার চক্ষুযুগলে সেই প্রথম মুসাফিরের প্রতিচ্ছবি ভেসে বেড়াচ্ছিল, যার উটনী এ পথ ধরেই গিয়েছিল। আর তিনি এ পথকে তার বরকতে ভরে দিয়েছিলেন।

আমি মদীনায় পৌঁছে সর্বপ্রথম মসজিদে নববীতে দু' রাকাত নামায আদায় করলাম এবং এই সৌভাগ্য লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা ও শোকরিয়া জ্ঞাপন করলাম। এরপর আমি রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সম্মুখে হাজির হলাম। আমি তাঁর সেসব অনুগ্রহ-দানের ছায়ায় ডুবে ছিলাম, যার ফলে কর্তব্য পূর্ণ করা সম্ভব ছিল না। আমি রাসূলে কারীম (সা) -এর উপর দরূদ-সালাম পাঠ করলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর পয়গাম ও বাণী যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সমর্পিত আমানত পুরোপুরি আদায় করেছেন। উম্মতকে সরল-সহজ সোজা পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহর পথে শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পুরোপুরি চেষ্টা-সাধনা করেছেন। এরপর আমি তাঁর সম্মানিত বন্ধুদ্বয়কে সালাম জানিয়েছি। এরা দুজনই এমন বন্ধু, যাদের চেয়ে বেশি বন্ধুত্বের অধিকার রক্ষাকারী মানব ইতিহাসে অপর কাউকে দেখা যায় না। আর না এমন কোন সহযোগী সহচর দৃষ্টিগোচর হয়। যে তদপেক্ষা উত্তমরূপে সাহচর্যের দায়িত্ব পালন করেছে।

দরূদ সালাম পাঠ থেকে অবসর হয়ে আমি জান্নাতুল বাকীর দিকে গেলাম। এটি ধরাপৃষ্ঠের ক্ষুদ্র একটি অংশ। যেখানে সততা-নিষ্ঠা, পাক-পবিত্র, প্রেম-ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতার অমূল্য ভাণ্ডার গচ্ছিত রয়েছে।

دفن ہوگا نہ کہیں ایسا خزانہ ہرگز

'কখনও সমাহিত হয়নি কোথাও এরূপ রত্নভাণ্ডার।'

এখানে সেসব মহাপুরুষগণ শায়িত আছেন, যারা পরকালের জন্য পার্থিব জীবনকে ত্যাজ্য করেছেন। এরা সেসব লোক, যারা নিজের ঈমান-ইয়াকীন এবং দ্বীন-ধর্মের জন্য স্বদেশে পরবাস ও দৈন্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তারা রাসূলে-কারীম (সা) -এর পদতলে পড়ে থাকার জন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের নৈকট্যকে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করেছেন।

رجال صدقوا ما عاهد الله عليه

"কিছু লোক এমন, যারা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছে।"

এখান থেকে অবসর হয়ে আমি উহুদ পাহাড়ের দিকে গেলাম। উহুদ সেই চিত্তাকর্ষক পূণ্যভূমি, যেখানে এশক ও প্রেম এবং কৃতজ্ঞতার সর্বাধিক আকর্ষণীয় দৃশ্যপট দেখা গেছে। এ প্রান্তরেই মানব ইতিহাস ঈমান-ইয়াকীনের জীবন্ত কৃতিত্বের রূপ দেখতে পেয়েছে। এখান থেকেই অভিধানে বীরত্ব ও সাহসিকতার শব্দ চয়ন হয়েছে। এই পাহাড়ী ভূমিই পবিত্র ভালবাসা ও দুর্লভ বন্ধুত্বের নযীর দুনিয়াকে দেখিয়েছে। এখানে পৌঁছে আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন হযরত আনাস ইবনে নযর রাযি. কে বলতে শুনছি- "আমি উহুদ পাহাড়ের এ দিক থেকেই জান্নাতের সুসংবাদ শুনতে পাচ্ছি।" আমার কাছে অনেকটা এমন মনে হচ্ছিল যে, হযরত সা'দ ইবনে মা'আয রাযি. রাসূলে কারীম (সা) -এর শাহাদাতের খবর শুনে বলেছিলেন–"নবীজীর পর এখন যুদ্ধ-জিহাদ করে লাভ কী?" আর আনাস রাযি. বলে উঠলেন, "কিন্তু তাঁর পরে জীবনেরই কী স্বাদ ও অর্থ আছে?"

এই উহুদ পাহাড়ের বক্ষেই হযরত আবু দাজানা রাযি. নিজের পিঠকে রাসূলে কারীম (সা) -এর ঢাল বানিয়ে দিয়েছিলেন। তীর-বল্লম আবু দাজানা রাযি. -এর পিঠ এফোড়-ওফোড় করে যাচ্ছিল। কিন্তু তিনি এতটুকু কাতরও হতেন না। এ স্থানেই হযরত তালহা রাযি. রাসূলে কারীম (সা) -এর উপর বর্ষিত তীরগুলো এমনভাবে নিজের হাতে নেন যে, হাত পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে যায়। এ ময়দানেই হযরত আমীর হামযা রাযি. শহীদ হয়েছেন এবং তাকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হয়। মুস'আব ইবনে উমায়ের রাযি. যিনি কুরাইশের বড় সৌখিন যুবক ছিলেন– এখানেই এমন অবস্থায় শহীদ হয়েছেন যে, তার জন্য কাফনেরও সুব্যবস্থা হয়নি। একটি মাত্র কম্বল ছিল, যার দ্বারা মাথা ঢাকলে পা খুলে যেত আর পা ঢাকলে মাথা কাপড়শূন্য হয়ে যেত।

আহ! আহ! উহুদ যদি দুনিয়াবাসীকে তার এই বেনযীর ভালবাসার ভাণ্ডার থেকে কিছু দিয়ে দিত! আহ! আজ যদি সেই আগের ঈমান-ইয়াকীনের এতটুকু ছিঁটে-ফোঁটাও পৃথিবীর নসীব হত! যদি এমনটি হয়, তাহলে এই পৃথিবীর ভাগ্য বদলে যাবে, এ পৃথিবী জান্নাত হয়ে যাবে।

লোকজন আমাকে বললেন, আপনি আমাদেরকে কাহেরা ভ্রমণ করিয়েছেন। সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরিচয় করিয়েছেন। আপনি দামেশক এবং দামেশকবাসীদের কথা শুনিয়েছেন। সেখানকার কবি-সাহিত্যিক ও উলামায়ে কিরামের সাথে সাক্ষাৎ করিয়েছেন। আমাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যে নিয়ে গেছেন। সেখানে ভ্রমণ করিয়েছেন। এবার হিজায এবং হিজাযের নেতৃবর্গ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বেরও পরিচিতি পেশ করুন। কিন্তু আমি কী করব? হিজাযের তো একজন মহাপুরুষই আছেন, যার কথা বলা যায়, যার কারণে হিজায পৃথিবীতে হিজায হয়েছে। ইসলামী বিশ্ব হয়েছে ইসলামী বিশ্ব। কবির ভাষায়-

آبروئے ما زنام مصطفٰے است

"আমাদের ইজ্জত-সম্মান তো মুহাম্মাদ (সা) -এর নামের বদৌলতে।"

সূর্যের সামনে তারকারাজি, শত সহস্র প্রদীপ-বাতি এবং তার আলোয় আলোকিত গ্রহের কী মূল্য আছে! ব্যাস, এটিই হিজাযের কাহিনী। এতটুকুই হিজাযের পরিচয়।

ما انچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم
الا حدیث دوست کہ تکرار می کنیم

'পড়িয়াছি যা কিছু মোরা
আজ ভুলিয়াছি সব
কেবলই আছে বন্ধুর কথা
পুনঃ পুনঃ করি তার জপ।'

ফারসী কবিদের শ্রদ্ধা উপহার

আল্লাহ্ তা'আলা আমার এক প্রিয় বন্ধুকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁর নিয়ম হল, বন্ধুদের জন্য কাজ ও সুর সংগীতের স্বাদ এবং ভোজ উৎসবের আয়োজন করার পরিবর্তে আনন্দ-বিনোদনের নিমন্ত্রণ, নিরস আবেগ-অনুভূতি ও ঘুমন্ত চিন্তাধারার জন্য প্রাণ-চঞ্চলতা, তৎপরতা, আনন্দ-প্রফুল্লতার খোরাক যোগাড় করে দেন। তিনি প্রায়ই এমন সাহিত্য সভার আয়োজন করেন, যেখানে কবি-সাহিত্যিক অথবা নিজের কথা উপস্থাপন করেন কিংবা প্রবীণ ও প্রাচীন কবিদের প্রভাবশালী ও জ্বালাময়ী কবিতাসমগ্র পড়ে শোনান।

যার সুফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও মন-মানসে এক ধরনের উষ্ণতা এবং জীবনে এক গতি সঞ্চার হয়। তাতে হৃদ্যতা, কোমলতা জ্বলনের এবং বিশেষ এক আবহ সৃষ্টি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আঁখিযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তার পঙ্কিলতা, ধূলিবালি ও ময়লা-আবর্জনা উত্তমরূপে পরিষ্কার হয়ে যায়। বস্তুবাদের গভীর পরিবর্তন সূচিত হয়। এসব মাহফিলে লোকজন ক্ষণিকের জন্য তাদের এই দুনিয়ার যতসব চিন্তা-বিষণ্নতা, বিপদাপদ, তিক্ততা-বিষাদ এবং জীবনের নানা চাহিদা ও চাওয়া-পাওয়ার জগদ্দল পাথরের নিচে ধ্বসে যাচ্ছে, যার প্রত্যেকটি জিনিস শক্ত-ভারী ও কাঁধের বোঝা। যার প্রতিটি পদক্ষেপ ভারী শিকল পায়ে ফেলতে হয়, চলতে হয় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, পা হেঁচড়ে। মনে হয় যেন সে চরম কষ্টে সকল উচ্চতা-উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া এবং আকাশে চড়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেসব বেড়ি, হাতকড়া ও শিকলের কারণে পেরে উঠছে না –এ লোকগুলো ক্ষণিকের জন্য এমন এক জগতে চলে যায়, যেখানে কেবল আনন্দ-মত্ততা ও উৎসাহ-কৌতূহলের রাজত্ব। যেখানে সব সময় পবিত্র জগতের সুখকর প্রাণসঞ্জীবনী বায়ু প্রবাহিত হয়। এখানে এসে তাদের আত্মিক প্রশান্তি, প্রাণচঞ্চলতা, আন্তরিক আনন্দ, সূক্ষ্মানুভূতি ও নফসের পবিত্রতার বিস্ময়কর উপলব্ধি হয়। জীবনের অগ্নিগর্ভ ফুলে ফুলে সুবাসিত হয়ে উঠে। তার সকল স্থূলতা তৎপর, হালকা ও তীক্ষ্ম হয়ে যায়।

তিনি গতকাল এমন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যার প্রতিপাদ্য ছিল, "আরব-অনারবের সরদার রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সমীপে অনারব কবিদের শ্রদ্ধা-অনুরাগ" অর্থাৎ অনারব কবিগণ কিভাবে তাদের আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালবাসা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছেন। নবীজীর শহর মদীনার ভালবাসা ও প্রতীক্ষার ব্যাপারে নিজের ঈমান-ইয়াকীন এশক ও প্রেমের কী উপমা পেশ করেছেন?

যেসব চিন্তাবিদ-গবেষকগণ ইসলামের বিশ্বজয়ী সাহিত্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, যারা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ভাষা-সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং তাদের কাব্য-কবিতা পাঠে আনন্দ আপ্লুত হোন, তারা ভাল করেই জানেন, ফারসী ভাষা রাসূলে কারীম (সা) -এর গুণগান ও স্তুতি-প্রশংসায় সবচেয়ে বেশি ভাগ্যবান ও সমৃদ্ধশালী। এর পরের স্থানই উর্দু সাহিত্যের, যা স্বয়ং ফারসী সাহিত্যের আশ্রয়নির্ভর বরং এক হিসেবে তার ফসল। এ কারণেই উপরিউক্ত বিষয়ে যতটা সাবলীল, জীবন্ত, প্রাঞ্জল, যাদুময়ী, মিষ্টিমধুর, প্রাণবন্ত ও জ্বালাময়ী আলোচনা এই দুই ভাষায় পাওয়া যায়, অপর কোনও ভাষায় এতখানি আদৌ পাওয়া যায় না। এতে আবেগ-অনুভূতির যে প্রশস্ত তা, গভীরতা. উষ্ণতা ও ব্যাকুলতা পরিলক্ষিত হয়, তা অন্যান্য সাহিত্যে দৃষ্টিগোচর হয় না। এটি বাস্তব সত্য যে, অনারব কবি-সাহিত্যিকগণ এমন এমন আলোচনা, প্রতিপাদ্য ও চিন্তাধারা উপহার দিয়েছেন এবং এমন নতুন নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও রচনাশৈলী আবিষ্কার করেছেন, যেখানে তাদের অগ্রগামী-অনুসৃত কেউ ছিল না। এটি ইসলামী সাহিত্য-সভ্যতার ইতিহাসের এক দার্শনিক প্রশ্ন, আজও যার সন্তোষজনক কোনও জবাব পাওয়া যায়নি।

কোন চিন্তাবিদ এর ব্যাখ্যা দেন, এর সম্পর্ক ইরানী ও হিন্দুস্তানী মন-মানসের সাথে। তারা বলেন, ইরানী ও হিন্দুস্তানী উভয়ের স্বভাব চরিত্রেই প্রেম-প্রীতি আছে। আর তার প্রয়োগ হয়েছে এক্ষেত্রে। এজন্য তাদের ভাষাও আবেগ-উচ্ছাসের ভাষা এবং প্রেম-ভালবাসার ভাষ্যকার। এই যোগ্যতার গতি যখন এমন এক ব্যক্তির প্রতি হল, যাকে সৌন্দর্য, সৌকর্য ও অনুগ্রহ-দানের সবচেয়ে বড় প্রতিচ্ছবি ও মহানুভবতা, উদারতা এক কথায় সকল উৎকৃষ্ট মানবীয় গুণাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতিসূক্ষ্ম পথিকৃৎ বলা সবদিক থেকে যথার্থ। ফলে সে কুদরতীভাবে তার কথার এমন বিস্ময়কর দুর্লভ ও ভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, যা তার সাথেই বিশেষিত। কথাশৈলী, ভাষার সাবলীলতা ও চমৎকার উপস্থাপনা-চিত্র ভালবাসার আবেগ-উচ্ছাস, অন্তর্জ্বালা, মনের ব্যাকুলতা ও ভালবাসার প্রতিক্রিয়ার সাথে মিলিত হয়ে আপন প্রেমাস্পদ ও প্রশংসিত সত্ত্বার স্তুতি গুণগানে, যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা নিজ

ভালবাসার জ্যোর্তিময় স্থান বানিয়েছেন এবং বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য-বৈশিষ্ট্যের সবচেয়ে দামী পোশাকে অলংকৃত করেছেন। এমন এক উপমা তৈরী করেছেন, যাতে চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জনের সকল খোরাক বিদ্যমান ছিল।

কেউ কেউ এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, দূরত্ব ও হিজরত বলে। কারণ, প্রেম-ভালবাসা ও মনের জলপ্রপাত ও প্রস্রবণী উত্তেজিত করা, নতুন নতুন কথাশৈলী, বাচনভঙ্গি ও অর্থভাবের আশ্রয় গ্রহণ, সুপ্ত প্রতিভা ও ঘুমন্ত শক্তিকে কাজে লাগানো এবং স্তিমিত স্ফুলিঙ্গ প্রজ্জ্বলিত দাবানলে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে এ দু'টি জিনিসের বিরাট দখল আছে। সেসব কবিদের অধিকাংশই আরব উপদ্বীপ ও মদীনা শরীফ থেকে বহু দূরে ছিল। অধিকন্তু সে সময় হিজায সফর করা এখনকার মত এতটা সহজ ছিল না। বিশৃংখলা ও অনিরাপত্তার যুগ ছিল। হাজীদের কাফেলা প্রায়ই লুটতরাজ ও ডাকাতির শিকার হত। এই বিপজ্জনক ও দীর্ঘ সফরের ভোগান্তি ও কষ্ট-যাতনা, বাঁধা-বিপত্তির ব্যাপকতা এবং যিয়ারত থেকে বঞ্চনা-মাহরূমী এমন বিষয় ছিল, যার উপশম তারা এসব প্রেম-অনুরাগের কবিতার মাধ্যমে করতে চাইত। যেগুলোকে সবসময় অন্তরের পত্রবাহক মনে করা হয়েছে আর যা বাস্তব পত্রবাহক কবুতরের মত অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে না পৌঁছে নিঃশ্বাস ফেলত না।

কারও কারও মতে এর বড় কারণ তাসাওউফ, যা ইরান ও হিন্দুস্তানে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং যা (অনেক নিরীক্ষক ও বিরুদ্ধাচারী ভুলে কিংবা যথার্থভাবে একে নিজের লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া সত্ত্বেও) এশক-প্রেমের আবেগ-উচ্ছাসকে প্রাণবন্ত করা এবং তার লালন ও উন্নতিতে খুব ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী মাধ্যম। এ কথা অবশ্যই বলা যায় যে, এর ভিত্তিও ভালবাসা, মনের ব্যাকুলতা ও আবেগ-উচ্ছাসের উপর ছিল। আর যেসব লোকের ভেতরে এই ভালবাসা ও মনের ব্যাকুলতায় সামান্য দখলও ছিল না, তারা অধিকাংশই এ ক্ষেত্রে সফলকাম হয়নি। মোটকথা, এই তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতা, যা ইরানী সাহিত্যের পূর্ণ সফরে সাহায্য করেছে এবং যা তার প্রশস্ততা, উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং তার সৌন্দর্য, সাবলীলতা ও সৌকর্য বর্ধনে বিরাট ভূমিকা রেখেছে, তা ঐ কবিতা আবৃত্তি, সংগীত চর্চা, প্রাণস্পর্শী মর্মব্যথা ও অন্তর্জ্বালার বিবরণ এবং প্রেমের কবিতা রচনার বিরাট বড় উৎসমূল ছিল। যখন দাড়িপাল্লা ভারী হয়ে যায়, তখন ঝুঁকেও পড়ে। পানপাত্র ও মটকার পরে আত্মবিস্মৃতি আবশ্যক। এক আরবী কবি এ রহস্যকেই অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন এবং সকল প্রেমিকের মনের বিবরণ তুলে ধরেছেন–

سقونى وقالوا لا تغن ولو سقوا
جبال سليمى ما سقيت لغنت

"মন ভরিয়ে সে পান করাল ফের
বলল, সাবধান! করবে না গান,
ছালীমা পাহাড়ও তা পান করিলে
গাহিত সে-ও, নাচিত প্রাণ।"

মোটকথা, কারণ যাই হোক ফারসী কবিত্বের আঁচল চাই তা ইরানী হোক, হিন্দুস্তানী হোক, গজল আবৃত্তির আবেগ-উচ্ছাস এবং অতি মূল্যবান মনিমুক্তায় পুরোপুরি সমৃদ্ধ। আর আমার সেই মহান বিজ্ঞ বন্ধু এ অনুষ্ঠানের জন্য উক্ত আলোচ্য বিষয় নির্বাচন করে নিঃসন্দেহে তার উন্নত মানসিকতা ও শুভ উদ্যোগের প্রমাণ দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সমবেত প্রায় কবি-সাহিত্যিকই কেবল ফারসী ভাষা-জ্ঞানের অধিকারীই ছিলেন না বরং এর স্বাদ সম্পর্কেও সম্যক অবগত ছিলেন। তাদের কোনও অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য কতিপয় বিজ্ঞ আরবী বন্ধুও ছিলেন এই মাহফিলে। তারা এ ভাষা সম্পর্কে জানতেন না। কিন্তু ফারসী ভাষার মাধুর্য, এর চিত্তাকর্ষক বাচনভঙ্গি ও শ্রুতিমধুরতার স্বাদ আস্বাদনে তারাও অংশীদার ছিলেন। তাদের সৌজন্যে মুহতারাম এক বন্ধু, যিনি উভয় ভাষায় সমান জ্ঞান রাখতেন, তিনি এসব কবিতাগুলোর ভাষান্তর ও বিন্যাসের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিলেন। এভাবে উক্ত অনুষ্ঠানে কেউ বঞ্চিত ও নিরস নিরাসক্ত রইল না।

এবার আমাদের অনুষ্ঠানের লক্ষণীয় কবিতা আবৃত্তি শুরু হল, যার জন্য সমবেত অতিথিগণ পূর্ব থেকে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। তারা একাধিক কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষিত ও প্রতিভাবান যুবকদেরকে ইরান ও হিন্দুস্তানের প্রসিদ্ধ ফারসী কবিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারাও খুব ভালভাবে একথা নিজের মনে গেঁথে রেখেছেন এবং অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও চমৎকার ভঙ্গিতে এমন গাম্ভীর্যপূর্ণ উদাহরণ ও সফল চিত্র অংকন করেছেন, যাতে সৃজনশীলতা, চমৎকার মননশীলতা ও সাবলীল সাহিত্যশৈলী উভয় বিষয়ের উজ্জ্বল আবহ পরিলক্ষিত হয়েছে।

সর্বপ্রথম এ মাহফিলকে হযরত শাইখ সা'দী প্রাণবন্ত ও আলোকিত করে তিনি সমবেত লোকদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। তার সন্ধানী দৃষ্টিতে যেসব শে'র-কবিতা আকর্ষিত হয়েছে, তা খুবই সুখপাঠ্য, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং শ্রোতাদের জন্য মনোলোভা ছিল। তাতে সমুদ্রকে কূপে বন্দি করে দেওয়া হয়েছিল কিংবা বলা যায়, বিশাল বিশাল গ্রন্থাগারের সুঘ্রাণ এক এক চরণে নিয়ে আসা হয়েছিল।

তিনি বলেন, এমন এক অনাথ-ইয়াতিম শিশু, যে ভালমত লেখাপড়াও জানত না, সপ্তাবিশ্বের গ্রন্থাগারে সে উজ্জ্বলতা দান করে এবং সংশোধন-সংস্কারের রেখা টেনে দেয়।

یتیمے کہ ناکردہ قرآں درست
کتب خانۂ ہفت ملت بشست

যে ইয়াতীম জগতের কারও থেকে
শিখেনি এক বর্ণমালা
সে-ই পাছে ধুয়ে দিল
সপ্ত জাতির গ্রন্থশালা।

তিনি এই ছন্দে ঐ মহাবিপ্লবের চিত্র অংকন করে দিয়েছেন, যা সকল ধর্ম-বিশ্বাস, আখলাক-চরিত্র, সমাজ-জাতি, শিক্ষা-সাহিত্য, সভ্যতা সাংস্কৃতিক ময়দানে পৃথিবীর সকল প্রাচীন ও আধুনিক বিপ্লবকে হার মানিয়েছে। তিনি বলেন, কত বিস্ময়কর বিরল অলৌকিকতা যে, এমন একজন উম্মী (নিরক্ষর) ব্যক্তি, যিনি জীবনে একদিনও মক্তব কিংবা পাঠশালায় বসেননি, যিনি একটি পৃষ্ঠাও কলমে এঁকে কালো করেননি, তিনি এমন এক ইলম-জ্ঞানের যুগের সূচনা করেন, যা কেউ পরিবর্তন বা রহিত করতে পারেনি। যার উৎকৃষ্টতা ও উঁচুতার সম্মুখে সর্বকালের বরং পুরো মানব ইতিহাস অবনত মস্তক লুটিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণ নিরক্ষরতা সত্ত্বেও এত বড় জ্ঞান কিভাবে অস্তিত্ব লাভ করল!

এটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন, মহান আল্লাহ তা'আলার অনন্ত-অসীম কুদরত ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা যার ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। আর যদি তাওয়াতুর বা নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা, স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতা, পর্যবেক্ষণ এবং অকাট্য মুসলিম ইতিহাস ও প্রকৃত অবস্থা এর সঙ্গে না হত, তাহলে এর উপর ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করাও মুশকিল ছিল।

এরপর শাইখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (র.) -এর পালা আসে। তার ব্যথা ভারাক্রান্ত মধুময় কবিতায় তাওবা-অক্ষমতা প্রকাশ, বিনয় নম্রতা, আল্লাহর ভয়-ভীতি এবং নিজের নগণ্যতা ও তুচ্ছতার অনুভূতি স্পষ্ট ছিল। তিনি একটি পংক্তিতে খুবই দরদমাখা প্রভাবময় ভঙ্গিতে বলেন, তাঁর সে মহান নামেরও একটি হক আছে, যে নামে তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ, ভদ্র-সম্মানিত লোকদের আদর্শ হল, তাঁদের শুভাকাঙ্ক্ষী-গুণগ্রাহীদের কারও নাম যদি তার নামের পাশে রাখা হয়, তিনি শেষ নিঃশ্বাস অবধি এর সম্মান রক্ষা করেন এবং তার সাথে সদাচরণ করেন।

گرچہ ضائع کردہ ام عمر از گناہ — توبہ کردم عذر من از حق بخواہ
اے شفاعت خواہ بنی تیرہ روز — لطف کن شمع شفاعت بر فروز
از گنہ رویم مگر دانی سیاہ — حق ہم نامی من داری نگاہ

যদিও পাপাচারে করেছি বরবাদ
এ জীবন আমি জানি,
তাওবা করছি, দুর্বলতা মম
সমীপে তাঁর যিনি মহাজ্ঞানী ॥
ওহে সুপারিশকারী! দেখবে যবে
তিমির আঁধার রাতি,
করুণাভরে জ্বালিও সেদিন
শাফা'আতের প্রদীপবাতি ॥
বলল যেন, না হয় মম মুখে
আর পাপের কালিমা লেপন,
আমার নামের হকের প্রতি
রইবে সদা সজাগ-সচেতন ॥

তারপর মাহফিলে আসন অলংকৃত করলেন আমীর খসরু। ইরানী কবিদের মাঝেও তার প্রতিভা, নিপুণ ব্যক্তিত্ব ও ভাষার সাবলীলতা স্বীকৃত। তার কথাকে ইরানী শিক্ষকদের সমতুল্য মনে করা হয়। তিনি আসতেই মানুষের দৃষ্টি অকৃত্রিমভাবে তার উপর নিবদ্ধ হয়। তিনিও তার ভাষার মাধুর্য ও স্বকীয় বাচন-ভঙ্গিতে উপস্থিত লোকদের মন জয় করে নেন। তিনি রাসূলে কারীম (সা) -এর সৃষ্ট বিস্ময়কর বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আবু লাহাবের ঐ অগ্নি প্রদীপকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়েছেন, যা গোটা বসুন্ধরাকে জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। আর দু'টি পদক্ষেপে তিনি এক জগৎ থেকে আরেক জগৎ এবং ঘর থেকে বাইরে সকল শূন্যস্থান অতিক্রম করে ফেলেছেন।

دم خلقش کہ جاں دادہ عرب را — فروگشتہ چراغ بو لہب را
دو گامے زیں جہاں تا آں جہانش — دو جو لان از مکان تا لا مکانش

ওগো তোমার চরিত্র মাধুরী যেন
আরব জাহানে আনিল নতুন প্রাণ,
করিল নিষ্প্রভ শত জনমের
আবু লাহাবী অগ্নিবান।

দু' কদমেই যেন ঘুরে এলে
মর্ত্যজগৎ থেকে উর্ধ্বজগত,
মাটির পৃথিবী থেকে
উর্ধ্বলোকের মহাপথ।

এরপর মাওলানা জামী (মৃতঃ ৮৯৮ হিঃ) তাশরীফ নিলেন। রাসূলে কারীম (সা) -এর শানে নাত পাঠকবর্গের মহতী জলসার শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি তাকেই মানাচ্ছিল। সকলেই তার সম্মান করলেন। মাহফিলের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনে সমাসীন করলেন তাকে। তিনি এ সুযোগে তার এক প্রসিদ্ধ না'ত পরিবেশন করলেন। তাতে তিনি রাসূলে কারীম (সা)এর খেদমতে আরয করলেন, আপনি যদিও কোন সাদা কাগজ কালো করেননি কিংবা কালিতে আরও বেশি কালো বর্ণ বৃদ্ধি করেননি, তাতে কী আর ক্ষতি হয়েছে? আপনি তো গোটা বিশ্বকে আলোকজ্জ্বল করেছেন। আপনার শৈশবকাল নিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কালো করে দেওয়া হয়েছে। কত কালো আমলনামা মিটে গেছে এবং উজ্জ্বল হয়ে গেছে। আপনার উম্মতের কলম সৈনিক ও লেখকগণ পৃথিবীর গ্রন্থাগার ভরে দিয়েছেন। আপনার সৌন্দর্য-সৌকর্য ও আপনার পুতঃপবিত্র চেহারা আরব-অনারব সকলকে আপনার নিবেদিত প্রাণ আশিক অনুরাগী বানিয়ে দিয়েছে। আপনার ফাসাহাত-বালাগাত, সাহিত্য সাবলীলতা সকল যাদুমুগ্ধ ও অভিভূত করেছে।

اے عربی نسبت وای لقب — بندۂ تو ہم عجم وہم عرب
تیغ عرب زن کہ فصاحت تراست — صید عجم کن کہ ملاحت تراست
چوں زتو خوانند ونویسندہم — گر تو نخوانی نہ نویسی چہ غم
از سیاہ راست سفیدی امید — بہ کہ سیاہی نہ نہی بر سپید

রহমতের নবী তুমি বংশে আরবী
উম্মী তব ডাকনাম,
আরব-অনারব আমরা সবাই
দ্বীন-দুনিয়ায় তোমরাই গোলাম।
তোমার ভাষার মাধুর্য যেন
আরবের শাণিত তরবারী,
রূপ-লাবণ্য যেন অনারবীদের
শিকারীর ফাঁদ (হে জাতির কাণ্ডারী)।
তোমার থেকেই মোরা শিখিলাম,
লিখনী ও পঠন রীতি

জান না তুমি লেখাপড়া, তাই--
বাড়ে আরও বিরহ গীতি।
কাগজের পাতা কালো তুমি
যদিও করনি কভূ
তিমির পান্থ থেকে তুলে সঠিক পথের
দিয়েছ দিশা তবু।

এ সাবলীল সাহিত্যালংকার সমৃদ্ধ পংক্তিমালা উপস্থিত সকলের হৃদয়ে মারাত্মকভাবে রেখাপাত করল। তাদের প্রেম-আবেগের আগুন দ্বিগুণভাবে জ্বলে উঠল। সকলেই নিজের অজান্তে সমস্বরে বলে উঠলেন-

مصلحت نیست مرا سیری ازیں آب حیات
ضاعف اللہ بہ کل زمان عطشی

লাভ নেই কোন পান করে মোর
অমৃত সুধা উদর ভরে,
যুগে যুগে আল্লাহ যেন এই
পিপাসা রাখেন দ্বিগুণ করে!

শ্রোতামণ্ডলীর আবেদন গ্রহণ করে মাওলানা আরও কিছু পংক্তিমালা আবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন, কাবা শরীফ অর্থব প্রতিমায় ভরা ছিল। আল্লাহ প্রেমিক ও সন্ধানীদের জন্য হারাম শরীফ ছিল সংকীর্ণ। রাসূলে কারীম (সা) এসে সেসব প্রতিমাগুলোর মূলোৎপাটন করেছেন। এমনকি তার নাম চিহ্ন পর্যন্ত বাকী থাকেনি। তার বরকতময় পদধূলিতে মাকামে ইবরাহীম হয়েছে মর্যাদাময় মাকামে ইবরাহীম। সে তার স্বকীয় মর্যাদা পুনঃ ফিরে পেয়েছে।

کعبہ بے دے از بتاں پرسنگ بود — بر خدا جویاں حریمش تنگ بود
سعی اواز بیخ وبن بر کند شاں — در بیابانِ عدم افگند شاں
شد قدم گاہ خلیل اورا بکام — عالی ازیمن قدومش آں مقام

কা'বাঘর ছিল পাথর মূর্তি ভরা
ছিল না তার বর্তমান অবস্থা,
আল্লাহ প্রেমিকদের ছিল না হেরেমে
প্রবেশাধিকার, সুযোগ-ব্যবস্থা।
দয়াল নবীর চেষ্টা-সাধনায়
ধ্বংস হল সমূলে সব,

নিক্ষিপ্ত হল আস্তাকুড়ে
ধ্বনিত হল আল্লাহ্ আল্লাহ্ রব।
রইল কেবল পুণ্যময় মাকামে ইবরাহীম
অধিষ্ঠিত পূর্ণ মর্যাদায় তার,
পদধূলিতে আখেরী নবীর আরও
বাড়িল সম্মান যার।

উপস্থিত লোকজন এসব পংক্তিমালা শুনে যাদুমুগ্ধ হয়ে তার কাছে আরও শোনার আবেদন করেন। তারা জানতেন, মাওলানা জামী (র) কত বেশি আবেগ-উচ্ছাস ও আগ্রহ-অনুরাগ নিয়ে মদীনা শরীফ সফর করেছেন। কতটা পাগলপারা ও নিবেদিতপ্রাণ হয়ে মসজিদে নববীতে হাজিরা দিয়েছেন। পেশ করেছেন তার সেই প্রসিদ্ধ কবিতা, যা প্রত্যেক ফার্সীজ্ঞানীর তীক্ষ্ণভাষা ও মনের অভিব্যক্তি। কোন কোন পংক্তি শ্রোতাদের মুখস্থ হয়ে গেল। লাভ করল প্রবাদ ও দৃষ্টান্তের মর্যাদা। তারা আবদার করলেন, তিনি যেন তার সেই অতুলনীয় "না'তে রাসূল" থেকে সমবেত লোকদের বঞ্চিত না করেন। এই না'তের নাম এলেই হযরতের উপর বিশেষ অবস্থা আবর্তিত হয়ে গেল। মনে হল, এ যেন স্বয়ং তাঁর ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও মনের কথা ছিল। এই আবদার তার মনের পর্দা ছিড়ে দিল। তিনি বলেন, আমার স্বীয় ডানায় ভর করে রাসূলে কারীম (সা) -এর পূণ্যময় দরবারে উড়ে যাওয়া এবং নিজের ভাগ্যকে সুখসমৃদ্ধ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি স্বীয় জীবনপ্রাণকে তার আলোকরশ্মির অঙ্গীকার বানিয়ে নিলাম। আমার অতন্দ্র আঁখিদ্বয়, যা প্রেমাস্পদের সাক্ষাৎপিপাসায় বহু বছর ধরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়নি, তাঁর পবিত্র রওযা শরীফে বারিপাত করল এবং সিঞ্চনকারীর কাজ সম্পাদন করল। যেখানে যেখানে তার পদধূলি লেগেছে, তাকে আমি আমার চোখের রক্তাশ্রু দিয়ে ধৌত করেছি। আর যেখানে আল্লাহর খাটি বান্দাগণ নামায পড়েছেন, সেখানে আমিও নামায পড়েছি। যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেও সততা ও সত্যপথ দান করেন।

خوشاکز گرد رہ سویت رسیدیم — بدیدہ گرد از کویت کشیدیم
بمسجد سجدۂ شکرانہ کردیم — چراغت راز جان پروانہ کردیم
زدیم از اشک ابر چشم بے خواب — حریم آستانہ روضہ ات آب
بسوئے منبرت رہبر گرفتیم — زچہرہ پایہ اش ازدر گرفتیم
زمحرابت بسجدہ گام جستیم — قدم گاہت بخون دیدہ شستیم
بپائے ہرستوں قدر است کردیم — مقام راستاں درخواست کردیم

কী যে আনন্দ! পৌঁছতে পেরেছি
তব অনুসৃত পথের পাশে,
চিনে নিয়েছি নিজেই মোরে মদীনায়
বুঝে শুনে তোমার প্রেমের আশে।
শোকরানা সিজদা করেছে অধম
মসজিদে তোমার মন ভরে,
তোমারি প্রদীপ জ্বেলেছি ওগো
রাখিয়া অনল এই অন্তরে।
বিনিদ্র আঁখি থেকে ঝরালাম প্রিয়
প্রেমের অশ্রু কত,
রওযা তোমার শান্তিময় ঠিকানা তাদের
তোমার পাগল প্রেমিক যত।
তোমার পূণ্যময় রওযা পানে
করেছি শুরু পথ চলা,
পদধূলি তার মেখেছি মুখে
(হৃদয়ে সেকি সুখের দোলা।)
মেহরাবে তোমার সিজদায় পড়ে
যাচিয়াছি যত মনের আশা
রক্তাশ্রুতে ধুয়েছি কদম তোমার
রেখেছ যেথা (দিয়ে ভালবাসা।)
প্রতিটি খুঁটির পাশে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
করিলাম বিনীত তন্ময় হয়ে,
মাকাবে ইবরাহীমে কাঁদিলাম অঝোর
জান্নাতের প্রার্থনা লয়ে।

মাওলানা জামীর পরে প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি এবং ফার্সী কাব্যচর্চায় স্বকীয়তার অধিকারী মাদরাসায়ে ফিকির -এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক উরফী এই মাহফিলের সম্মুখে আসেন। আমার কাছে মনে হল, তিনি (মৃতঃ ৯৯৯ হি.) একজন রাজকবি এবং সুলতান ও উমারাদের স্তুতি ও প্রশংসাকারী। কিন্তু খুবই চমৎকার ভঙ্গিতে তিনি নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে বলেন– আমীর-উমারা, সুলতানগণ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের সর্দার এর প্রশংসা করা একই অভিলাষে কিভাবে হতে পারে! এক নিঃশ্বাসে দু'জাহানের বাদশার প্রশংসা করা এবং আরেক নিঃশ্বাসে উমরা ও রাজন্যবর্গের প্রশংসা করা চরম বেয়াদবী ও রুচিহীনতা বৈকি? তিনি বলেন,

اما نبود وصف اضافی ہنر ذات　　این فتویٰ ہمت بود ارباب ہمم را
دوران کہ بود تا کند آرائش مسند　　مداح شہنشاہ عرب را وعجم را
ہشدار کہ نتوان بیک آہنگ سرودن　　نعت شہ کونین ومدیح کے وجم را

বস্তুগত জ্ঞান-বুদ্ধি কিংবা প্রাকৃতিক
গুণ-বৈশিষ্ট্য নেই যে কিছুই মোর,
দিতে পারে সমাধান সাহসী বিদ্বান
খুলিতে পারে এ জটিল রহস্য দোর।
সেকালে যখন করত মুখরিত।
স্তুতি গায়ক দরবারী কবি,
আরব-অনারবের রাজমহল বাহবা
ফুল-চন্দন ছুড়িত সবি।
সাবধান একই মুখে একই সুরে
আদৌ কি সম্ভব দ্বৈত গান ধরা?
রহমতে আলম (সা) -এর নাত আর
কুলাঙ্গার রাজাদের প্রশংসা করা!

উরফী চলে যাওয়ার পর প্রখ্যাত না'ত গায়ক কবি কুদসী (মৃত্যু ঃ ১০৫৬ হি.) মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। কুদসীর ভাষ্যের শব্দ ঝংকার তাসাওউফের জগতে আজও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সেই কবিতা, সুর-তরঙ্গ, অভিলাষ ও ছন্দতাল কাব্যমান হিসেবে স্বকীয়তার দাবীদার। স্থানে স্থানে আরবী শব্দের সংযোজন তার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এ কারণেই গজল পাঠকগণ বেশিরভাগই তাঁর কথার প্রতিই অনুরাগী। কবিগণ এবং সূফীগণ অধিকাংশই তার না'তকে আলোচ্য বিষয় বানিয়েছেন। তিনি এসে আবৃত্তি করলেন তার নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ কবিতা-

مرحبا سید مکی مدنی العربی　　دل وجاں باد فدایت چہ عجب خوش لقبی
من بیدل بجمال تو عجب حیرانم　　اللہ اللہ چہ جمالست بدیں بو العجبی
چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر　　اے قریشی لقبی ہاشمی ومطلبی
ما ہمہ تشنہ لبانیم وتوئی آب حیات　　رحم فرما کہ زحدمی گذرد تشنہ لبی
عاصیا نیم زمانیکی اعمال مپرس　　سوئے ماروئے شفاعت بکن از بے سببی
سیدی انت حبیبی وطبیب قلبی　　آمدہ سوئے تو قدسی پئے درماں طلبی

মারহাবা হে সাইয়িদে মাক্কী-মাদীনী
আরব ওয়াল আজমী মারহাবা,
কুরবান হোক এই জন্ম-জীবন
হৃদয়ে কি যে সুখ বইছে আহা!
তোমার সৌন্দর্যে বিস্মিত হতবাক
আমার ধূসর মন-প্রাণ,
এই অনারবীর মুখে আরও
চমৎকার আল্লাহ আল্লাহ গান।
করুণাভরে এই অধমের তরে
ওগো, তাকাও না একবার,
বংশে কুরাইশী, হাশেমী মুত্তালেবী
বলে বিশ্বময় সুনাম যার।
প্রাণ সঞ্জীবনী সুধা তুমি
মোরা সবে তৃষ্ণাকাতর,
দয়া করে মেটাও সে পিয়াস
শুষ্ক মলিন মম ওষ্ঠাধর।
কত পাপাচারে লিপ্ত মোরা
করো না জবাবদিহি প্রিয়তম
উসীলা ছাড়া করো শাফা'আত
নতুবা রক্ষা নাহি।
ওহে মনীব
মনেরই ডাক্তার
এসেছি তোমার চরণ তলে
চমকায় যেন ললাটে আখতার।

পারসিক (ইরানী) কবিদের ধারাবাহিকতা শেষ হল। এবার এল হিন্দুস্তানের স্বীকৃত কবিদের পালা। হিন্দুস্তানের ফারসী কবিদের ইমাম আমীর খসরু ছিলেন, ফারসী ভাষী ও উচ্চস্তরের পারস্য কবিদের সমতুল্য কোন অংশেই তিনি তাদের থেকে কম ছিলেন না। সিরাজের বুলবুল শাইখ সাদীও তার কাব্য মাধুর্য ও ভাষা বৈচিত্রের মূল্যায়ন করতেন। তিনি তাঁর কাব্য কবিতা শুনেছিলেন। মির্জা গালিব হিন্দুস্তানী কবিদের সারি থেকে উঠে এলেন এবং এই সৌভাগ্য লাভের অনুমতি চাইলেন। তিনিও নিজের ফারসী কবিতায় আবেগ আপ্লুত হতেন। তার কতিপয় উচ্চস্তরের সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ এই দাবীকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখল। উপস্থিত

কোনও কোনও লোক এতে বিস্ময় প্রকাশ করলেন যে, এ বিষয়ের সাথে তার কী সম্পর্ক আছে? কিন্তু তিনি এসবের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে নিজের বক্তব্য শোনাতে শুরু করেন এবং নিজের সাধারণ অভ্যাস পরিপন্থী অত্যন্ত চমৎকার, সুখপাঠ্য, সহজবোধ্য ও সরল প্রশংসামূলক কবিতা পাঠ করলেন। যাতে কল্পনা-জল্পনা, স্পর্শকাতর ছবি অংকন এবং অতিরঞ্জনের স্থলে বাস্তবতা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। গোটা সমাবেশ তার সে কবিতা আনন্দ-বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। মাতৃভাষীগণও তাকে নির্দ্বিধায় মূল্যায়ন করেন। তিনি আবৃত্তি করেন–

به دستش کشاد قلم نارسا نه کلکش سواد قلم نارسا
برفتار صحرا گلستاں کنی به گفتار کافر مسلماں کنی
بدنیاز دیں روشنائی دہ به عقبی زآتش رہائی وہی
زبت بندگی مردم آزاد کن جہانے به یک خانه آباد کن
محراب مسجد رخ آرائے دیر به اندیش خویش ودعا گوئے خیر
تو گوئی ز بس دل ز دشمن رباست که سنگ ورش سنگ آہن رباست

কতনা অযোগ্যের চলেছে কলম
তোমার হাতের ছোঁয়াতে,
কত না শুষ্ক কলমে এসেছে কালি
তোমার মোবারক থুথু-দু'আতে।
তব পদধূলি পেয়ে হয়েছে
কত মরুভূমি ফুলবাগান,
তোমার যাদুময় কথা শুনে
কত কাফির হয়েছে মুসলমান।
করেছ দ্বীপ্তিময় দ্বীনের আলোয়
এই বিশ্বজাহান
দিয়েছ নাজাত অগ্নিশিখা থেকে
আর যত অপ্রমাণ।
মুক্ত করেছ অর্থব প্রতিমার
পূজা-অর্চনা থেকে
করেছ আবাদ কুল-জাহানকে
একই নূরের আলোকে।
কত না মন্দির গীর্জা শত
করেছ মসজিদে রূপান্তর,

তব চিন্তা-গবেষণা-দু'আয়
(সাজিয়েছ মানব অন্তর।)
বিশাল অন্তর থেকে নরম-কঠিন
তুমি ওগো বলেছ যাহা,
হোক না সে প্রস্তর খণ্ড আর
লৌহ দণ্ড পদ্মকোমল আহা।

মির্যা গালিবের পরে ফার্সীতে স্বল্পজ্ঞানী লোকদের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল খাজা আজীজুদ্দীন আযীয লখনবীর ওপর। যিনি ছিলেন প্রবীণ উস্তাদদের সাহচর্যপ্রাপ্ত এবং ফারসী সাহিত্যের শেষ রক্ষক। উপস্থিত লোকজন তার কাছেও রাসূলে কারীমের স্তুতি উপহারের আবদার জানালেন। মির্যা গালিব স্বয়ং সুপারিশ করলেন। তিনি না'তে রাসূল (সা) সংশ্লিষ্ট কবিতা থেকে কিছু পংক্তি আবৃত্তি করলেন। লোকজন মনযোগের সাথে শুনলেন–

می رسد در گوش من از دشت دور بانگ جرس
می روم از خود که نبود تیز رو تر زیں فرس

الله الله می روم راہے کہ باشد بے خطر
نے غمے از رہزناں نے گبر و وارے از عسس

چوں جمل دشت و جبل از شوق می آید برقص
خامہ در راہِ حجاز از باشد آہنگ جرس

ذوق شیریں کام باشد توشۂ منزل نورد
شوق بے پروا خرام آمد رفیق زود رس

می رسانم خویش را تا روضۂ سلطانِ دیں
چوں نسیم صبح ایں رہ طے کنم در یک نفس

شہسوار منزل اسریٰ کہ رفتی ہمرکاب
طرقوا گو جبرئیل از پیش واسرافیل پس

مرکبش با برگ وسازد منزلش دور دراز
مرکبش بس راہوار و راہ پاک از خار و خس

رفت از ہر پایۂ بالا تر و ہم پیشتر
ہیچو نقشِ پا زحیرت ہر دو عالم ماند پس

شد جدا آخر زتن بارفت تنہا زاں مقام
سر تہی از ہر خیال و دل تہی از ہر ہوس

جذبۂ شوق الٰہی آستین او گرفت
برد تا جائے کہ آنجا مے نگنجد پیش و پس

میزبانی آں چناں و میہمانی ایں چنیں
سیر شد چوں یافت بر خوان بادی دسترس

বাজিল কানে কোন সে বনের,
ঘণ্টাধ্বনি, মরমী সুর,
হারিয়েছি তায় নিজেকে আমি
তেজি অশ্বও ক্লান্ত, হেথা কতদূর?

আল্লাহ আল্লাহ গেয়ে বেড়াই
শান্ত কোমল শীতল মনে,
না আছে হেথা দুঃখ-শোক
ডাকাতির ভয় না প্রহরী কোনজনে।
সানন্দে মরুর উষ্ট্র ঘোড়াও যেন
নেচে গেয়ে লাফিয়ে চলে,
নয়ত কোন ঘণ্টাধ্বনি বরং
হেজাযী কলমের তালে।
মনোরথ পূরণের মধুর আগ্রহই
পাথেয় সেই মন্‌জিলের
অব্যর্থ উদ্দীপনাই নিবিড় সঙ্গী
ঐ শিক্ষালয় (ও মন দিলের।)
নিজেকে আমি পৌঁছে দিলাম
ধর্ম নবীর রওযা পাকে,
প্রভাতী হাওয়ায় ছুয়ে গেলাম
এক দমে সুদীর্ঘ সেই পথের বাঁকে।
মিরাজের সেই মহান তীর্থস্থান
যেথায় ভ্রমণ করেছ তুমি,
ছিলেন রাহবার জিব্রীল আ.
পিছনে মীকাইল (ধন্য আরবভূমি।)
বাহন ছিল তার অতি বরকতময়
সজ্জিত, মন্‌জিল বহুদূর
ছিল দ্রুতযান আর নিষ্কণ্টক পথ
(সর্বময় কি যে আনন্দ সুর।)
চলছিলে তুমি অতিক্রম করে
একে একে সব উচ্চ মাকান,
অলৌকিক সে পদচারণায়
বিস্ময়ে হয়রান কুলজাহান।
শারীরিক স্বাভাবিকতা মুক্ত হয়ে আরও
সম্মুখে গেলেন একাকী অবশেষে
কল্পনা-জল্পনা শূন্য মন-মানস
চিন্তা-গবেষণামুক্ত পবিত্র বেশে।

আল্লাহ্ প্রেমের আকর্ষণ তখন
ধরল যে তার আচল,
টেনে নিল তাঁরে দিগন্তহীন
পুতঃস্থানে ছাড়িয়া ধরাতল।
অতিথি যেমন মহান অতি
মেজবান অতি মহামহিম,
বড়ই তৃপ্ত তার আতিথেয়তায়
যিনি রহ্মানুর রাহীম।

খাজা আযীয লখনবীর নাম আসতেই লোকজনের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মুন্সী বেলায়েত আলী খান সফীপুরী (র) (মৃত্যু ঃ ১৩-০১-১৩৪৭ হিজরী) এর ওপর। তিনি বর্ষিয়ান ফার্সীর পুরোনো অভিজ্ঞ কবি সৃষ্টিশীলতা, ছন্দতরঙ্গ ও কথাশৈলীতে প্রবীণ হওয়া সত্ত্বেও চরম বিনয়-নম্রতা ও আদবের কারণে সমবেত লোকদের মাঝে এমনভাবে লুকিয়ে নিভৃতে বসেছিলেন, তার প্রতি কারও দৃষ্টি পড়াই মুশকিল ছিল। খাজা আযীয এবং স্বয়ং তার উস্তাদ মির্যা গালিব এই আবেদনে সমর্থন জানালেন। তার সে কথামালা, যাতে নাতের মাহফিল গরম থাকে, তা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মিষ্টি মধুর কণ্ঠের অধিকারী এ কবি যখন তার প্রশংসামূলক নাত পরিবেশন করলেন, যা কল্পনা জগতের স্পর্শকাতরতা ও উচ্চতার সাথে সংগীত সমুদ্রের শীতলতা ও শাব্দিক সৌন্দর্য ও ছন্দতাল সমৃদ্ধও ছিল, তখন গোটা মাহফিল আনন্দ-উচ্ছাসে মাতোয়ারা হয়ে গেল এবং এক নৈসর্গিক পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল। পারস্য কবিগণও অনিচ্ছায় বাহবা দিলেন। তার ফারসী ভাষাজ্ঞান ও সুদক্ষ কথাশৈলীর প্রাণখোলা প্রশংসা করলেন। অনেক সুহৃদ ব্যক্তিবর্গ মনে করলেন, এই গজল গোটা মাহফিলে ছেয়ে গেছে এবং মনের মণিকোঠায় বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

کشتۂ بے تیغم عشوہ ترک نازک پیکرے — خوش بیانے مہربانے، جان جانے دل برے
یاسمن، رشک سمن، جان چمن یا جان من — آشنائے دل ربائے خودنمائے خودسرے
کفر سوزے، دل فروزے، خوبرو، آہستہ خو — پاک دینے، پاک بینے، خوشتر از ہر خوشترے
ناز بینے، مہ جبینے، دل کشے، بے دل کشے — جاں گدازے، دل نوازے، گوہرے یا اخترے
سادۂ، آزادۂ، مستانۂ، جانانۂ — مست چشمے، دیر خشمے، طرفہ زیبا منظرے
بے قرارم، اشک بارم، سخت زارم اے عزیز — دل بردہ، جاں آوردہ، ہر دم بطرز دیگرے

প্রিয়তমের যাদুময় চলন এ হৃদয়
অসি ছাড়াই কাটিয়া দিল,

মধুর বাচনভঙ্গি, মনোলোভা অবয়ব
অজান্তেই মন কাড়িয়া নিল।
কুফরকে জ্বালিয়ে হৃদয় ভরিয়ে নূর
সুশ্রী মহান, কথায় ধীর গতি,
পুলকিত বদন, পবিত্র দৃষ্টি নয়ন
চরিত্র তার পুতঃ পূণ্য অতি।
মায়াবী মুখ, দৃষ্টিনন্দন ললাট,
চিত্তাকর্ষক, দর্শক আত্মহারা,
হৃদয় ব্যাকুল মন মাতোয়ারা
পরাজিত মুক্তা ও চাঁদ-সেতারা।
সততা, নির্বিঘ্নতা আর নির্মল
প্রেমময় ব্যবহার,
মনকাড়া চাহনী, বিরল পলক তার
(সকল সৌন্দর্যের সমাহার।)
প্রিয়তম হে, অস্থির ব্যাকুল আমি
বুক ফেটে মোর অশ্রু ঝরে,
তাই উড়ে গেছে হৃদয় হেথায়
স্বাদ পাই প্রতিক্ষণ নতুন করে।

জনাব আযীযের পর ওয়াকিফহাল সুধীবৃন্দ জনাব মৌলভী মাসউদ আলী মাহবী (র) -এর কাছে রচিত কোন ফার্সী না'তে রাসূল শোনানোর জন্য আবেদন করলেন। তিনিও এই মহতী মাহফিলে নিজের ফার্সী জ্ঞান, প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা এবং ইরানী কবিদের সুযোগ্য অনুসরণের দৃষ্টান্ত পেশ করেন। তিনি খানিক চিন্তাভাবনার পর মঞ্চে আসেন এবং তার না'তমূলক গজল, আবৃত্তি করেন। চতুর্দিক থেকে সাবাস সাবাস রব উঠে যায়। তাতে চমৎকারভাবে এবং সতর্কতার সাথে ইরানী কবিদের কণ্ঠও প্রতিধ্বনিত হয়।

فطرت بجلوہ آمد وکار بہار کرد　　از شرق تابہ غرب زمیں لالہ زار کرد
بیدار کرد سبزۂ خوابیدہ را ہزار　　بانگ نماز صبح چو از شاخسار کرد
تجدید کرد فاختہ لرزید شاخسار　　کر بہر او زمانہ بسے انتظار کرد
مسکین بعالم آمد ومسکیں بخلق زیست　　مسکیں صفت زعالم فانی گذار کرد
آں کاملے کہ از نظر کیمیا اثر　　خاک سیاہ رازر کامل عیار کرد
آں سرورے کہ بے مدد لشکر وسپاہ　　آوارگان بادیہ را شہر یار کرد

بنمود چہرہ ظلمت شب کشت یک طرف افشاند زلف بزم جہاں مشکبار کرد
بادوستاں نمود وفا جاں نثار ساخت بردشمناں فزود کرم شرمسار کرد
باہر کہ بست عقد ولا استوار بست باہر کہ کر عہد وفا پائدار کرد
گویم چرانہ صاف کہ در قید آب وگل بر خلق جلوہ رحمت پروردگار کرد
می خواست شوق سلسلۂ مدح را دراز آمد ادب اشارہ بسے اختصار کرد

محوی دریں دیار غریب است ودل فگار
باید نظر بحال چنیں دل فگار کرد

স্বভাবগত রূপে আসিয়া ধরায়
ছড়ালেন খুশবু বসন্ত বাহার,
প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্যের মাটিতেও
কত পুষ্পিত ফুলের সমাহার।
জাগালেন শত-সহস্র লোকদের
যারা ছিল নিদ্রাবিভোর,
তরঙ্গায়িত হল সবুজ বনানী
ধ্বনিল যবে ফজর আযানের সুর।
বিহঙ্গরা গাহিয়া উঠিল তাসবীহ্ খোদার
পত্রপল্লবে লাগিল হরষে দোলা,
কাবাক পাখিও তুলিল তাকবীর ধ্বনি
বজ্র বৃষ্টিও কাঁদিল মন খোলা।
আসিল এক মহান সাক্ষী (ধুলির ধরায়)
এ যে ফায়সালা এক আল্লাহর,
যে বসন্তের প্রতীক্ষায় ছিল বহুকাল
সকল মানব দানব মাঝি মাল্লার।
এলেন ধরায় জনদরদী, যার কাছে
বিনয় নম্রতার দীক্ষা পেল সৃষ্টিকূল,
নশ্বর এ জগতে চলতেন বিনয়ের সাথে
সকল আধার তিনি, (তিনি অতুল।)
সেই তো কামেল মহান পুরুষ
দৃষ্টিতে যার পরশ পাথর,

যার দৃষ্টিগুণে কৃষ্টিমানে
মাটিও হয় স্বর্ণ-আতর।
সে-ই তো যোগ্য নেতা মহাবীর
লাগেনি তার সেপাই-লস্কর,
ধ্বংস বিরান জনপদগুলো
বানালেন যিনি মিত্র শহর।
তিমির রাতি দূর অজানায়,
হারাল দেখিয়া তার চন্দ্রমুখ,
শোভিত তার জুলফি চুলে
বিশ্বজাহানে আসিল সুখ।
সহানুভূতি আর মহানুভবতায়
বন্ধুরা হল নিবেদিতপ্রাণ
দান-দক্ষিণায় শত্রুরা যে,
সম্মুখে তার লজ্জায় মূহ্যমান।
কোথাও কারও সাথে লেনদেন হলে
চুক্তি হত অতি মজবুত,
প্রতিশ্রুতি সব পূরণে তার
চেষ্টা থাকত বেজায় অদ্ভুত।
বলি, অধম, এই মন যে কেন
কলুষিত কাদা মাখা
করুণা খোদার সৃষ্টি সারা
প্লাবিত সব বৃক্ষশাখা।
মন তো চায় প্রিয়তমের
সুদীর্ঘ স্তুতি গাই,
স্মরণ হল তার শিষ্টাচার
সংক্ষেপিত করছি তাই।
মাহবী যে এক ব্যাকুল প্রাণ
এ পথের প্রেম ভিখারী,
দাও না উদার দৃষ্টি তোমার
এমন অধির অবস্থা যারি।

মাহবী সাহেবের পরে উপস্থিত লোকজন প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি উস্তাদ নিযাম দুকান শাইখ গোলাম কাদির ছালামীর কাছে আবেদন করেন। তিনি নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন–

ایں چہ شوخیست ویں چہ بے ادبی — من ونعت محمد عربی
دریکتائے درج مطلبی — سید ما محمد عربی

من وایں نشہ آں دماغ کجا — من وایں بادہ آں ایاغ کجا
نازش کارگاہ ارض وسپہر — حلقہ در گوش اوچہ ذرہ چہ مہر
شعلۂ نور و موسیٰ و سر طور — احمد از فرق تا قدم ہمہ نور
زدہ یونسؑ بہ بطن حوت قدم — زد محمدؐ بہ جدی وحوت علم
زکریاؑ بہ ارہ گشت دونیم — خواجہؐ را دل بذکر ارہ سلیم
باسلیماں زتخت باد دلیل — تخت احمدؐ زشہپر جبریلؑ
پور مریمؑ کہ خود نماند بسے — مردہ را زندہ کر از نفسے
خواجہؐ ما حبیب خاص خدائے — گمرہاں را بشرع راہ نمائے
رہ توحید را بسر پویاں — امی حرف امتی گویاں
مردہ را زندۂ احدی می کرد — زندہ را زندۂ ابد می کرد
یوسف از چاہ گر بماہ رسید — خواجہؐ ز انگشت جیب ماہ درید
نوح شد نا خدائے کشتی خویش — مرہمے چند بست بر دل ریش
علم افراز عرصۂ افلاک — جلوہ افروز کرسی لولاک

এ কেমন উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর
কত বড় বেয়াদবী!
কোথায় আমি আর নবী
মুহাম্মাদ (সা) আরাবী!
মুত্তালিবী দূর্গের কত না দামী
দুর্লভ মুক্তা তিনি,
মোদের মহান নেতা মুহাম্মাদ (সা)
পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব তিনি।
কোথা সে মন-মানস আমার
এই ভারী নেশা গ্রহণের
আছে কি সুরাহী (কিংবা বর্ম)
সহিবে যে জ্বালা দহনের।

কত না নির্মল তার চাল-চলন
কখনও পাথর, কখনও মাটি,
মাহফিলে তার কাছে ক্ষুদ্র কিংবা বড়
সবই যে সোনার চেয়েও খাঁটি।
কী তুলনা তার মূসা আ. আর
তূর পর্বতের নূরের ঝলক,
আহমদ (সা) আপাদমস্তক নূর যার
সৃষ্টিকূল চেয়ে থাকে অপলক।
মাছের পেটে থাকিয়া নবী
ইউনূস আ. করিলেন বিচরণ,
নবী মুহাম্মাদ (সা) জগতেরই মৎস
বকরীর উপর করিলেন আলো বিকিরণ।
যাকারিয়া আ. দ্বিখণ্ডিত হলেন
লৌহ করাত দিয়ে,
নবীজী মোর হৃদয় ভরিলেন
যিকরে খোদার শরাব পিয়ে।
সুলাইমান আ. এর সিংহাসন
ছিল হাওয়ায় ভাসমান,
নবীজীর আসন জিব্রীলের ডানা
সে যে বিশাল সুমহান।
মারইয়াম তনয় যিনি ছিলেন
ক্ষণকাল এ ধরাধামে
করিতেন মৃতকে জীবন দান
স্বয়ং আল্লাহর নামে।
নবীজী মোদের ছিলেন আল্লাহর
অতিপ্রিয় উচ্চাসনে স্বাধিষ্ঠ,
দেখালেন শরী'আতের পথ
ছিল যারা ঘোর পথভ্রষ্ট।
খোদায়ী রহমত আর স্বকীয় চিন্তায়
তাওহীদের পথ সুগমকারী,
ছিলেন তিনি নিরক্ষর তবু যে–
আখেরী উম্মতের কাণ্ডারী।
মৃতকে তিনি জীবিত করলেন
উহুদ প্রান্তরের যোদ্ধারূপে.
জীবিতকে করলেন চিরজীবী
বেঈমান যত রইল কূপে।

ইউসুফ যদিও কূপ থেকে উঠে
চন্দ্রোপম হয়েছিলেন,
নবীজী মোর অঙ্গুলি ইশারায়
চাঁদই দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।
নূহ আ. যদিও হয়েছেন সওয়ার
খোদায়ী কিস্তি নৌযানে,
মলম লাগালেন ব্যথিত প্রাণে
নিমজ্জিত জাতি যে তার প্লাবনে।
ইলম জ্ঞান সমুন্নতকারী, যুগ যুগ ধরে
মহাকাশের ঊর্ধ্বে আসীন,
তুমি বিনে কিছুই হত না সৃষ্টি
তুমি যে 'লা ওলাকা' এর আসনে সমাসীন।

ইরান ও হিন্দুস্তানের এসব সুদক্ষ কবি ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের পর সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় আল্লামা ইকবাল (র) -এর প্রতি। যার না'তমূলক কবিতা এবং যার এশকে রাসূল (সা) ইরান, আফগানিস্তান ও এশিয়া মহাদেশই নয় বরং গোটা মুসলিম বিশ্বকে এশক ও প্রেমের উষ্ণতা এবং ব্যাকুলতা ও উচ্ছাসে মাতোয়ারা করে দিয়েছে। যিনি না'তের জগতেও তার অভিনব পন্থা তৈরী করেছেন। তাতে গণজাগরণ ও বিপ্লবের খোরাক ও উপকারিতা সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম তার মছনবী 'আসরারে খোদী' থেকে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করেন, যাতে তিনি সীরাতে নববী (সা) এর সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সমুদ্রকে কূপে ভরে দিয়েছেন। তিনি যখন তার চমৎকার ভঙ্গিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সুরে এসব পংক্তি আবৃত্তি করলেন, তখন গোটা মাহফিলে এক আত্মহারা অবস্থা ছেয়ে যায়।

در دل مسلم مقام مصطفیٰ است　　آبروئے ما زنام مصطفیٰ است
بوریا ممنون خواب راحتش　　تاج کسریٰ زیر پائے امتش
در شبستان حرا خلوت گزید　　قوم و آئین و حکومت آفرید
ماند شبہا چشم او محروم نوم　　تابہ تخت خسروی خوابید قوم
وقت ہیجا تیغ او آہن گداز　　دیدۂ او اشکبار اندر نماز
در دعائے نصرت آمین تیغ او　　قاطع نسل سلاطیں تیغ او
در جہاں آئین نو آغاز کرد　　مسند اقوام پیشیں در نورد
از کلید دیں در دنیا کشاد　　ہمچو او بطن ام گیتی نزاد

আছে যে নবীজীর সুমহান মর্যাদা
অন্তরে মুসলিম জাতির,
মোদের এত ইজ্জত নিখিল ধরায়
সম্মানেই যে সেই নবীজীর।
খেজুর পাতার চাটাইয়ের পরে,
যিনি আরাম নিদ্রারত
কিসরার রাজমুকুটও যার
উম্মতের হয়েছে পদানত।
হেরার নির্জন গুহায় কাটালেন
ধ্যান-তন্ময় কত রজনী,
তার বংশ জাতিই করিল শেষে
শাসন এই বিশ্ব অবনী।
কত রাত কেটে গেছে, তার
ছিল না ঘুম চোখের পাতায়,
বিনিময়ে তার উত্তরসূরীর মাথায়
খসরুর রাজমুকুট শোভা পায়।
রণাঙ্গণে তার তরবারী হত
নরম লৌহজাত,
নামাযে তার আঁখিযুগল
করিত অশ্রুপাত।
সাহায্য প্রার্থনায় বলত আমীন
তার মোবারক অসি,
কাফির রাজবংশের নিধনে সে
বড়ই কঠিন সর্বনাশী।
নতুন আইন চালু করলেন
পঙ্কিল বিশ্বজাহানে
ভবিষ্যত জাতির সিংহাসন
সাজালেন সত্যের আহবানে।
দ্বীনের চাবি দিয়ে খুলিলেন
তিনি পৃথিবীর বদ্ধ দুয়ার,
কূল জাহানে নামিয়া আসিল
শান্তি সুখের অপূর্ব জোয়ার।

এ কবিতা শুনে মাহফিলের সর্বত্রই আনন্দ-সুখের বন্যা বয়ে যায়। আগ্রহী রুচিশীল উপস্থিত লোকজন তার প্রসিদ্ধ মছনবী 'পাছ সে বায়াদ কর্‌দ' গ্রন্থ

থেকে সেসব পংক্তি শোনানোর আবদার করেন, যেগুলো তিনি রাসূলে কারীম (সা) -এর সমীপে নিবেদন করেছেন। তিনি খুবই মনোত্তাপ ও অন্তর্জ্বালা নিয়ে পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন, যাতে ছিল কৃতজ্ঞতার উপহার, শ্রদ্ধা নিবেদন, দাসত্বের উপঢৌকন এবং বর্তমান মুসলিম বিশ্বের নিঁখুত বাস্তব চিত্র। তিনি নবীয়ে আরাবী (সা) -এর ভোলার নয় এমন অনুগ্রহ-দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেগুলো সকল মানুষের কাঁধে রয়েছে। যারা তার মাধ্যমে ঈমান ও একত্ববাদের দৌলত, হেদায়াত ও মুক্তির পথ পেয়েছে। যারা নিজের চেয়ে দুর্বল ও নগণ্যজনের সামনে সিজদাবনত হয়ে মানবতাকে লাঞ্ছিত করা থেকে ফিরে এসেছিল। সর্বপ্রকার দাসত্ব ও গোলামী থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। তিনি যেহেতু হিন্দু বংশোদ্ভূত এবং তার পূর্বপুরুষগণ কিছুকাল পূর্বে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, এজন্য তাদের এর উপর শোকরিয়া জ্ঞাপন করা অত্যন্ত অর্থবহ ও প্রভাবশালী ছিল। তারা মুহাম্মাদ (সা) -এর বরকতেই জীবজন্তুর পূজা-অর্চনা, পুরোহিতদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং মনগড়া প্রভুর দাসত্ব-উপাসনা থেকে মুক্তি পেয়েছে।

اے تو ما بیچارگاں را ساز وبرگ   وارہا ایں قوم را از ترسِ مرگ
سوختی لات ومناتِ کہنہ را   تازہ کردی کائناتِ کہنہ را
در جہان ذکر وفکر انس وجاں   تو صلوٰۃ صبح، تو بانگ اذاں
لذت سوزد سرور از لاالٰہ   در شب اندیشہ نور از لا الٰہ
نے خداہا ساختیم از گاؤ خر   نے حضورِ کاہناں افگندہ سر
نے سجودے پیش معبودانِ پیر   نے طواف کوشک سلطان ومیر
ایں ہمہ از لطف بے پایانِ تست   فکر ما پروردۂ احسانِ تست
ذکرِ تو سرمایۂ ذوق وسرور   قوم را دار دبہ فقر اندر غیور
اے مقام ومنزل ہر راہ رو   جذب تو اندر دلِ ہر راہ رو
سازما بے صوت گردید آنچناں   زخمہ برر گہاۓ او آید گراں
در عجم گردیدم وہم در عرب   مصطفیٰ نایاب وارزاں بو لہب

তুমি হে মহান! বানালে মোদের
নিঃস্ব অসহায়দের ধনবান,
মরণ যন্ত্রণা ভয় থেকে তুমি
আনিয়াছ এ জাতির পরিত্রাণ।

লাত-মানাত জীর্ণ প্রাচীন দেবতা যত
সবই জ্বালিয়ে দিলে তুমি,
সেকেলে বিরান পৃথিবীটারে ফের
গড়লে নতুন এক পুণ্যভূমি।
পৃথিবীতে জ্বিন ইনসানের
যিকর, ফিকর, গবেষণাবাণী,
আর তোমার ভোরের নামায
সুমধুর আযান ধ্বনি।
কী যে স্বাদ অন্তর্জ্বালায় আর
কী যে সুখ লা ইলাহা ইল্লাল্লায়
তিমির রাতেও জ্বালায় আলো
আছে কি তা গাইরুল্লায়?
চাই না খোদা গরু-গাধা
কিংবা বিশাল ধনাগার
চাই না সঁপিতে বেদিতে
সম্মানের এই মাথা আমার।
করিব না কুর্নিশ সামনে পীরের
কভু সিজদাবনত হয়ে
না চাই ছুটিতে রাজপ্রাসাদে
তোষামোদ-ভিক্ষের ঝোলা লয়ে।
এ সবই যে তোমার অসীম
করুণা-দয়ার দান,
মোদের জ্ঞান-গবেষণা সবই যে
তোমার অনুগ্রহ ইহসান।
তোমার স্মৃতি প্রেম-সুখের পুঁজি,
দিবসে কি নিশি শয্যায়,
উদ্বিগ্ন তবু কত জাতি
দরিদ্রতার লজ্জায়।
সকল স্থান ও সকল মন্‌জিলে
চলেছ তুমি থেমেছ হেথায়,
সকল পথিকের প্রতি ছিলে অনুরাগী
দাঁড়িয়েছ, ডেকেছে যে যেথায়।
অন্তর্জ্বালা মোদের সঙ্গোপনে
এমনরূপে করিল প্রস্থান,

প্রতিটি শিরা-উপশিরায় যেন
নিদারুণ কঠিন ক্ষতস্থান।
অনারবে ঘুরছি আমি ছন্নছাড়া
তবু যেন আরবেই আছি,
পায়নি সে স্বাদ আবু লাহাব,
থেকেও আরবে যেন তুচ্ছ মাছি।

তিনি যখন আবৃত্তি করতে করতে নিম্নোক্ত পংক্তিতে এসে বলেন, আমার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও মূলধন এবং আমার দুনিয়া হে নবী (সা) আপনারই এশক-প্রেম এবং আপনারই জ্ঞান-পরিচয়। এরপর বলেন, আপনি ছাড়া আমার মত ব্যর্থ ও পরাজিত লোকের কোন ত্রাতা এবং আমার মত লাঞ্ছিত অপদস্থ হরিণের শিকারী কেউ নেই। আমি সবচেয়ে হতভাগা হয়ে বড় আশা নিয়ে আপনার পদতলে এসেছি। তখন শ্রোতামণ্ডলী আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে। সকলের চক্ষু যুগল বরাবরই হয় অশ্রুসিক্ত।

شہسوار ایک نفس در کش عناں
حرف من آساں نیاید بر زباں

آرزو آید کہ ناید تا بہ لب؟
می نہ گردد شوق محکوم ادب

آں بگوید لب کشا اے درد مند
ایں بگوید چشم بکشا لب بہ بند

گرد تو گردد حریم کائنات
از تو خواہم یک نگاہ التفات

ذکر وفکر وعلم وعرفانم توئی
کشتی ودریا وطوفانم توئی

آہوئے زار وزبون وناتواں
کس بہ فتراکم نہ بست اندر جہاں

اے پناہ من حریم کوئے تو
من بامیدے رمیدم سوئے تو

দুরন্ত অশ্বারোহী চলিছে দুর্বার
শক্ত হাতে লাগাম ধরে,
সে-ও পারবে না মোর একটি হরফ
পড়তে মুখে সহজ করে।
আশা-স্বপ্ন আসুক কিংবা
না-ই আসুক ওষ্ঠাধরে
প্রিয়তমের আবেগ-উচ্ছাস তবু
কখনো কি কমতে পারে?
বলেন তিনি খোল তো তোমার
ওষ্ঠাধর হে বিরহকাতর,

এ যে বলে, চক্ষু খোল আর
বন্ধ রাখ তব ওষ্ঠাধর।
তোমার আশপাশের মাটি যেন
কুল জাহানের পূণ্যভূমি
প্রার্থনা তাই দরবারে তোমার
এক পলক তাকাও তুমি।
জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তা-চেতনা
মোর তুমিই যে সব,
তুমিই মোর নৌযান, সমুদ্র
আবার প্লাবন, এই তো অনুভব।
আমি দুর্বল অক্ষম-অসহায়,
মোর নেই তো কোন পারাবার,
বন্দি নয় এ জীবন দুনিয়া মোহে
বক্ষে পিয়াস মরু সাহারার।
ওহে মোর আশ্রয় শিবির আমি
তোমার গলি দর্শন বঞ্চিত,
যিয়ারতে তোমার ধন্য হব আমি
সুপ্ত মনে সে আশাই সঞ্চিত।

এরপর যখন তিনি বললেন, নিজের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমার নৈরাশ্যের কিছু নেই। ইলম ও জ্ঞানে অসম্পূর্ণ বটে। কিন্তু ছিন্নমূল, গোঁড়াই ভুল ও বিভ্রান্ত নই। গুনাহগার ও আমলে ত্রুটিযুক্ত মানুষ বটে। কিন্তু বাস্তবতা অজ্ঞাত ও অনুগ্রহ দান বিস্মৃত নয়। রিক্ত হস্ত ও সম্বলহীন ঠিক কিন্তু আমার একটি জিনিস আছে, যার নাম অন্তর। এই অন্তর আপনার চরণতলে ধূলিধূসরিত হওয়ার গৌরব লাভ করেছে। আপনার পথের পূর্ণ পথিক পূর্ণ অনুসরণে সদা সচেষ্ট। আজও তাই সে মনের কাছে সর্বোচ্চ পাথেয়।

مومنم از خویشتن کافر نیم — برفسنم زن کہ بد گو ہر نیم
گرچہ کشت عمر من بے حاصل است — چیز کے دارم کہ نام او دل است
درمش پوشیدہ از چشم جہاں — کزسم شبدیز تو دارد نشاں

নিজ দাবীতে মুমিন আমি
অর্ধাংশ কাফির তবু
আমার বক্ষে আঘাত হেনে
মুছে দাও মন্দ হে প্রভূ!

যদিও নিষ্ফল কেটে গেছে মোর
ছোট্ট এ জীবনখানি,
নামটি তাঁর রেখেছি সযতনে
সাজিয়ে হৃদয়দানী।
রেখেছি তারে লুকায়ে আমি
কুলজাহানের দৃষ্টির আড়ালে
আদৌ হেথায় পারবে কি যেতে
সম্রাট খসরুর শাবদীজ হাঁকালে।

এরপর তিনি এই উপমাহীন কবিতা মানবজাতিকে সেসব দু'আমূলক ছন্দ দিয়ে শেষ করেছেন। আর উপস্থিত সকলেই তার সাথে সাথে আমীন বলেন।

اے کہ وادی کرد را سوز عرب — بندۂ خود را حضور خود طلب
بندۂ چوں لالہ داغے در جگر — دوستانش از غمہاو بے خبر
بندۂ اندر جہاں نالاں چو نے — نغمہ جاں از نغمہ ہائے پے بہ پے
در بیابان مثل چوب نیم سوز — کارواں بگذشت ومن سوزم ہنوز

কে সে মহান! দিল যে কুর্দিদের
আরবের হৃদয়জ্বালা,
আপন দাসেরে ডাকিল শিয়রে
মিটিল তার প্রেমজ্বালা।
গোলামের মনমিনারে লেগেছে
ভীষণ ব্যথার দাগ,
বন্ধুরা তার কেউ না জানে
না নিল কেউ দুখের ভাগ।
ভবের এই খেলা ঘরে আজি
এই গোলাম কাঁদিছে অঝোর,
পোড়া মনের বিষাধ নিয়ে চলে
তবু যে তার প্রেম বিভোর।
এখনও পড়ে আছি ব্যর্থ চৌচির
বনের পোড়া কাঠের মত,
কৃতকার্য বন্ধুরা যে চলে গেলেন
বক্ষে বিরহ অনল জ্বলছে শত।

আল্লামা ইকবালের মধ্য দিয়ে ফার্সীর যুগ সমাপ্ত হয়। এরপর আদৌ কেউ ফারসীতে কিছু শোনানোর না সাহস করেছেন, আর না সমবেত কেউ আবেদন করেছেন।

উর্দু কবিদের শ্রদ্ধা নিবেদন

ফার্সী কবিদের পর এবার উর্দু কবিদের পালা এসেছে। অজান্তেই তাদের দিকে দৃষ্টি চলে যায় এবং উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী নীরব হয়ে বসে পড়ে। না'ত পরিবেশন, এশকে রাসূল (সা) এবং মদীনার প্রতি আবেগ-উচ্ছাস হিন্দুস্তানী কবিদের প্রিয় বিষয়বস্তু হয়ে গিয়েছিল। ফার্সী কবিত্বের পর সবচেয়ে প্রভাবশালী না'ত উর্দু ভাষাতেই পাওয়া যায়। এশকে রাসূল (সা) এবং মদীনা হিজাযের পূণ্যভূমির সাথে গভীর হৃদ্যতা ও সম্পৃক্ততা হিন্দুস্তানী মুসলিম জাতির মন-মানস ও স্বভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। এরই বদৌলতে তারা আটশত বছর পর্যন্ত স্বীয় রত্নের হেফাযত করেছে। এ কারণেই গোত্রপূজা বা পরিবার পূজার উচ্চ আন্দোলন কিংবা ধর্মহীনতার প্লাবন কখনও তাদেরকে খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। রাসূলে কারীম (সা) এবং পবিত্র হিজাযের সাথে তারা তাদের হৃদ্যতা ও সম্পৃক্ততাকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন, অনেক সময় জাতি ও বংশপূজার তোড়জোড় আন্দোলনকারী নেতৃবর্গ তাদেরকে অভিসম্পাত করে বলেছে, এ জাতির দেহ থাকে ভারতের মাটিতে আর অন্তরাত্মা থাকে হিজাযে। এখানে জন্মগ্রহণ এবং মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও তারা মদীনার অলিগলিরই স্বপ্ন আঁকে। চোখে মুখে কেবল সব সময়ই এ কথাই প্রতিধ্বনিত হতে থাকে যে,

خاک یثرب از دو عالم خوشتر است
اے خنک شہرے کہ آنجا دلبر است

দু'জাহানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জানি
ঐ পাক মদীনার মাটি,
ওরে হিমশীতল শহুরে মানুষ
হেথায় আছে মনচোরা পরিপাটি।

ভারতীয় মুসলমানদের হিজাযের পূণ্যভূমির সাথে সাধারণতঃ আর মদীনার মাটির সাথে বিশেষতঃ এমন গভীর সম্পর্ক ও আত্মিক হৃদ্যতা রয়েছে যে, সবসময় তারা সেখানে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। উনিশ খৃস্ট শতকের এক প্রসিদ্ধ উর্দু কবি কারামত আলী শহীদী (র) (মৃত্যু ঃ ১২৫৬ হি.) এর ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, তার লাশ যদি সেখাননকার পবিত্র মাটিতে সমাহিত হওয়ার

যোগ্য না হয়, তাহলে অন্তত সেখানকার মরু অঞ্চলের জীবজন্তুর আহার্যই যেন হয়ে যায়। তার সেই ঐতিহাসিক কবিতার দু'টি চরণ নিম্নরূপ-

مدینہ کی زمیں کے گر نہ لائق ہو مرا لاشہ — کسی صحرا میں واں کے طعمہ ہوں میں دام اور دد کا
تمنا ہے درختوں پر ترے روضہ کے جا بیٹھے — قفس جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا

পাক মদীনার মাটির যোগ্য যদি
নাই বা হয় আমার লাশ,
দাফন করো মোরে হেথায় অরণ্যে
হোক না এ দেহ বন্য গ্রাস।
বাসনা যে, রওযা পাকের বৃক্ষ শাখে
বসব আমি ওগো সাকী,
ভাঙবে যবে বদ্ধ খাঁচা
যাবে উড়ে এই প্রাণপাখী।

মাহফিল শুরু হলে সর্বপ্রথম আমীর মীনাঈকে আসন দেওয়া হয়। তার না'তমূলক সেসব পংক্তিমালা, যাতে গঠনমূলক বিষয়, ভাষাবিদগণের সাহিত্যালংকার, প্রবাদ ইত্যাদির স্বাদসহ বিশেষ ছন্দময়তা ও সমুদ্রের তরঙ্গমালা বিদ্যমান ছিল, তা আবৃত্তি করা হলে বিশেষ এক অবস্থার সৃষ্টি হয়। গোটা মাহফিল আপ্লুত হয়ে পড়ে।

خلق کے سرور، شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم — مرسلِ داور، خاص پیمبر، صلی اللہ علیہ وسلم
نورِ مجسم، نیر اعظم، سرور عالم، مونس آدمؑ — نوحؑ کے ہمدم، خضر کے رہبر، صلی اللہ علیہ وسلم
دولتِ دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر — مالکِ کشور، تخت نہ افسر صلی اللہ علیہ وسلم
چشمۂ جاری، خاصۂ باری، گردسواری، بادبہاری — آئینہ داری، فخر سکندر صلی اللہ علیہ وسلم
مہر سے مملو ریشہ ریشہ نعمت امیر اپنا ہے پیشہ — ورد ہمیشہ دن بھر شب بھر صلی اللہ علیہ وسلم

সৃষ্টিকূলের নেতা, হাশর দিনের সুপারিশকারী
মানবতার মুক্তিদূত, শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর
নূরানী বদন, জ্যোতিষ্ক, জগতের নেতা, আদমের প্রিয় বন্ধু
নূহের সহযাত্রী, খিযির আ. এর রাহবার।
পার্থিব সম্পদে মাটিতুল্য রিক্ত হস্ত, হৃদয়ের ধনী,
সাম্রাজ্যের অধিকারী, নয় সিংহাসনের অফিসার।
প্রবাহমান ঝর্ণাধারা, আল্লাহর খাস বান্দা,
দুঃখের আরোহী, বসন্তবায়ু
হৃদয়ের দর্পণ, ফখরে সেকান্দর।

ভালবাসায় ভরা শিরা-উপশিরা
না'ত গাওয়া যে আমীরের পেশা,
সর্বদা ব্যথা ভারাক্রান্ত নিশিদিন কি অমানিশা!

আমীর মীনাঈর পরে তার সমসাময়িক ও বিখ্যাত উর্দু না'ত পাঠক জনাব মুহসিন কাকুরাবীর পালা আসে, যিনি তার গোটা জীবন মেধা-মনন, জ্ঞান-বিদ্যা ও সাহিত্য যোগ্যতাকে না'ত রচনায় ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছিলেন। এমনকি প্রসিদ্ধ আছে, তিনি যখন ডান হাতে না'ত লিখতেন, দুনিয়ার অন্য কিছু লেখা পছন্দ করতেন না। সমবেত লোকজন সম্মানের সাথে আরয করলেন, হযরতের কথা শৈল্পিকতা, বৈচিত্রতা, তথ্যজ্ঞান ও মধুরতায় এতটাই পরিপূর্ণ ছিল যে, বিদ্যাসাগর উলামায়ে কিরাম, বিজ্ঞ পণ্ডিত ও দূরদর্শী সাহিত্যিকগণ ব্যতীত কেউ পুরোপুরি স্বাদ গ্রহণ করতে পারত না। কাজেই এমন কোন খণ্ড কবিতা আবৃত্তি করুন, যা ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রবাদের চমৎকারিত্বের সাথে আমাদের পুরোপুরি বোধগম্য হয়ে যায়।

জনাব মুহসিন সে পংক্তিমালা আবৃত্তি করলেন, যাতে জিবরাইল আ. এর আগমন, নবীজীকে জাগ্রত করা ও বুরাকে আরোহন করিয়ে মিরাজে নিয়ে যাওয়ার চিত্র অংকিত হয়েছে। উপস্থিত শ্রোতাগণ ভাষার মাধুর্য, সাবলীলতা ও বর্ণনাশৈলীতে খুবই অভিভূত হলেন। তিনি পড়লেন-

آداب سے آپ کو اٹھایا — یا اپنے نصیب کو جگایا
بیدار ہوئی جو چشم حق میں — آہو ہوئی شکل خواب شیریں
دیکھا کہ عجیب ماجرا ہے — گھر برج قمر بنا ہوا ہے
انشائے رموز غیب مخبر — ہونے کا نہیں یہ دن کبھی پھر
سونا کبھی ہو نہ ہو جگانا — لیتا رہے کروٹیں زمانہ
طالع میں نہیں یہ شب کسی کے — اختر سو بار سو کے جاگے
ہوگی نہ یہ پھر زمیں کی توقیر — مٹی ہو ہزار بار اکسیر
انوار کا ہے ورود پیہم — تاروں کی برس رہی ہے شبنم
جبریل ہیں اور براق بھی ہے — قاصد بھی ہے، اشتیاق بھی ہے

সসম্মানে উঠালেন আপনাকে কিংবা
চমকালেন নিজের ভাগ্য রবি,
সজাগ হল যবে সত্যদর্শী আঁখি যুগল
দোষী হল মধুর ঘুমের ছবি।

দেখিল কী বিস্ময়কর দৃশ্যপট,
গৃহ হল চন্দ্র তারার কক্ষপথ।
অদৃশ্য রহস্যের রচনাবলীর খবর
আর কোনদিন হবে না ফের।
শয়ন হবে কখনও না হবে জাগরণ
যুগ সময় কত হচ্ছে আবর্তন।
কারও কপালে নেই তো লেখা এ রাত,
শতবার তারকা ঘুমিয়ে করেছে প্রভাত।
পাবে না সে সম্মান পৃথিবী পুনঃবার
হয়ত হবে মাটি রসায়ন সহস্রবার।
অনবরত নূরের বিচ্ছুরণ আলোর ফোয়ারা
বহিয়া চলিছে শিশির ঝর্ণাধারা।
আছেন জিব্রাইল, সাথে বুরাক আরও
আছে দূত, আছে আবেগ-আগ্রহ।

মাওলানা মুহসিনের পর খাজা আলতাফ হুসাইন হালীর পালা আসে। যার ছয় পংক্তির কবিতা শিশুসুলভ ভাষায় রচিত। উপস্থিত লোকজন আরয করলেন, হালীর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের ছয় পংক্তির না'তমূলক কবিতা যদিও হাজারবার শুনেছি, তথাপি আরো একবার শুনতে চাই। কারণ, তার সাদাসিধে ক্রোধের প্রভাব বরং এই কবিত্বে ঘটনাবলী ও বাস্তবতার নিঁখুত চিত্র রয়েছে। এই আবদার রক্ষা করা হয়। তার সেই বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের প্রসিদ্ধ কবিতামালায় মাহফিল নেচে উঠল। যার অর্থ নিম্নরূপ-

فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوی
یتیموں کا والی، غلاموں کا مولی

خطاکار سے درگزر کرنے والا — بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا — قبائل کو شیر و شکر کرنے والا

اتر کو حرا سے سوئے قوم آیا
اور اک نسخۂ کیمیا ساتھ لایا

مس خام کو جس نے کندن بنایا — کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا
عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا — پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا

رہا ڈر نہ بیڑے کو موجِ بلا کا
ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

پڑی کان میں دھات تھی ایک نکمی — نہ کچھ قدر تھی اور نہ قیمت تھی جس کی
طبیعت میں جو اس کے جوہر تھے اصلی — ہوئے سب تھے مٹی میں مل کر وہ مٹی

یہ تھا ثبت علم قضا وقدر میں
کہ بن جائے گی وہ طلا اک نظر میں

নবীদের মাঝে যিনি খ্যাত রহমত নামে
পূর্ণ করেছেন দুঃখীদের আশা,
দুঃখ ব্যথায় সকলের সহযোগী
আপন সঙ্গীসাথীর শেষ ভরসা।
আশ্রয় হতদরিদ্রের, অসহায় দুর্বলের
এতিমের অভিভাবক, মনিব গোলামের।
অপরাধীকে ক্ষমাকারী, বিজয়ী বিদ্বেষীদের মন
অনাচার নিশ্চিহ্নকারী, জাতিকে করেন সৌহার্দ্যপরায়ণ।
হেরা গুহা থেকে নেমে এলেন,
ঘৃণ্য এক জাতির কাছে,
সঙ্গে নিয়ে এক মহৌষধ,
তারা হয়েছে সেরা তাই পাছে।
কাঁচা তাম্রকে বানালেন নিঁখুত সোনা
দেখালেন পৃথক করে ভেজাল-খাঁটি,
যুগ যুগ ধরে যে আরবে ছেয়ে ছিল মুর্খতা
মুহূর্তে বদলে দিলেন কায়া তার একেবারে পরিপাটি।
না রইল বকরী ভেড়ার চিতার ভয়
চারদিকে বয়ে গেল অপূর্ব মলয়।
কানে পড়েছিল এক অকর্মা ধাতু
ছিল না যার মূল্য না ছিল দাম,
মন মানসে ছিল যে আসল রত্ন
সবই ছিল ধূলিমলিন, হল সফলকাম।
এই তো ছিল লিখা নিয়তি ও খোদায়ী জ্ঞানে
হয়ে যাবে তা রত্নমানিক একই দৃষ্টি-দর্শনে।

মাওলানা হালীর পরে তরুণ এক উদীয়মান কবি মঞ্চের দিকে এগিয়ে এলেন। তার পোশাক-পরিচ্ছদ ও আকার আকৃতি দেখে মনে হল, পাঞ্জাবের অধিবাসী। কিন্তু মাওলানা হালী এই তরুণকে সম্ভাষণ জানালেন যুবকদের থেকে সামনে এগিয়ে গিয়ে। তাকে মহব্বত ও মর্যাদার সাথে বসালেন। মাহফিলের কোন কোন প্রান্তে বলাবলি হতে থাকে, তিনি উর্দু ভাষার সবচেয়ে বড় না'ত

গায়ক কবি। তার কথা অপেক্ষা অন্য কারও উর্দু না'তে শব্দাবলীর আবেদন ও ছান্দিকতার উচ্ছাস পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন যাফর আলী খান আলীগ। প্রথমে লোকজন তার কাছে তার সেই কবিতা শোনার আবদার করেন, যা ছিল তার প্রথম দিকের রচনা। কিন্তু যুগ যুগ ধরে ইসলামী বিদ্যালয়, মাদরাসা ও মাহফিল এর দ্বারা উদ্বোধন করা হয়।

وہ شمع اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں
اک روز جھلنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں
گر ارض وسما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو
یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا
وہ راز ایک کملی والی نے بتلادیا چند اشاروں میں
وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانِ فلسفہ سے
ڈھونڈھے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں میں
ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی بوبکرؓ وعمرؓ عثمانؓ وعلیؓ
ہم مرتبہ ہیں یاران نبیؐ کچھ فرق نہیں ان چاروں میں

যে প্রদীপ তিনি গিরিগুহায়
জ্বালালেন চল্লিশ বছর ধরে,
সে তো চমকাবেই একদিন
জানে বিশ্ব এই জগত পরে।
আকাশ-মাটির এই মাহফিলে যদি
না হত 'লাওলাকা লামা' এর সুর ধ্বনি,
হত না এত সুন্দর পুষ্প বাগিচা
না পেত আলো তারকা দিনমানী।
যে জট খোলেনি কো দার্শনিকদের দ্বারা
না হয়েছে সমাধান তাত্ত্বিকের হাতে,
ঘোর রহস্য এক মোটা ভূষণ পরা
লোক খুলে দিলেন কয়েক ইশারাতে।
দার্শনিক স্টোরে আছে কি সে
মহারত্ন যা দানিয়াছে ঈমান,

খুঁজিলে তা পাবে জ্ঞান-বিবেক
কুরআনের পাতায় দীপ্তিমান।
একই প্রদীপের জ্যোতি আবু বকর
উমর, উসমান, আলী
সকলেই সমান নবীজীর বন্ধু মহান
নেই ভেদাভেদ মন কালাকালি।

এই কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে উপস্থিত লোকজন তার কাছে আরেকটি না'ত শোনার আবদার জানান। তা নিম্নরূপে মাহফিলে গুঞ্জরিত হয়-

اے کہ ترا جمال ہے زینت محفل حیات
دونوں جہاں کی رونقیں ہیں ترے ترے حسن کی زکوٰۃ

تیری جبیں سے آشکار پر تو ذات کا فروغ
اور ترے کوچہ کا غبار سرمۂ چشم کائنات

بارگہ الست سے بخش دیئے گئے تجھے
سب ملکی تصرفات، سب فلکی تجلیات

چہرہ کشا کرم تراقات سے تابہ قیرواں
لطف ترا کرشمہ سنج کعبہ سے تابہ سومنات

تیرے سلام کے لئے گلشنِ قدس کے طیور
گھوم رہے ہیں ڈال ڈال جھوم رہے ہیں پات پات

دیکھتے ہی ترا جلال کفر کی صف الٹ گئی
جھک گئی گردنِ ہبل ٹوٹ گیا طلسم لات

آنکھ کے ایک اشارہ سے تو نے معا بدل دیئے
ذہن کے سب تصورات قلب کے سب تاثرات

چوں دچگونہ وچراتا کجا وتا بکے
حل کئے ایک بات میں تو نے یہ سرمدی نکات

غیر کو خویش کردیا نیش میں نوش بھر دیا
پل میں درست کردیئے بگڑے ہوئے تعلقات

کیا ہی وہ انقلاب تھا ڈھل گئے جسمیں ایک ساتھ
لزبن وپیرس ودمشق پیکن ودہلی وہرات

از سر نو کیا گیا دودۂ آدم ارجمند
اٹھ گئی قید خون ورنگ مٹ گیا فرق نسل وذات

شانِ خدائے پاک تھی پیغمبروں کی سادگی
جس پہ نثار ہوگئے سب عجمی تکلفات

تیری ثنا میں تر زباں ہوگیا جو مری طرح
اس کے قلم میں آگئی شانِ روانی فرات

پست وبلند کے لئے عام ہیں تیری رحمتیں
عرش سے اور فرش سے تجھ پہ سلام اور صلوٰۃ

اے کہ رواں رواں ترا درد میں ہے بسا ہوا
کس کو ترے سوا سنائیں جا کے ہم اپنی مشکلات

سر پہ اندھیری رات ہے گھر گئی بھنور میں ناؤ
موج بلا ہے تاک میں دور ہے ساحلِ نجات

تھام کے پایہ عرش کا کر بہ ادب یہ التجا
اے کہ ہے مبدءِ فیوض ایک فقط تری ہی ذات

بندے بھلے ہوں یا برے تو تو ہے اے خدا کریم
قطع ہو کیوں کریم کا سلسلۂ نوازشات

مورد لطف خاص پر کس لئے آج یہ عتاب
ہم سے پھرا ہوا ہے کیوں گوشۂ چشم التفات!

ওহে তোমার রূপ-মাধুরী জীবন সংসারের সৌন্দর্য
উভয় জাহানের শোভা তোমার রূপের সৌকর্য।
ললাটে তব দৃশ্যমান তুমি সত্তার শাখা,
তব পথের ধূলি জগতের চোখে সুরমা মাখা।
'আলাসত এর দরবার হতে তোমায় দানিয়াছেন রব
জাগতিক কর্মক্ষমতা, আসমানী দীপশিখা সব।
মায়াবী মুখ, তব দান কাফ থেকে কায়রোয়ান
অনুগ্রহ তব কী অপার কাবা থেকে সোমনাথ বিস্ময়ে পেরেশান।
তোমায় জানাতে সালাম পাক বাগিচার কোকিল পাপিয়া
ডালে ডালে উড়ে যায় ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ হরষে নাচিয়া।
তোমার মাহাত্ম্য দেখি উল্টে গেল কাফিরের কাতার
নুইয়ে গেল হাবলের মাথা, ভাঙল লাতের ভেল্কি সমাচার।
চোখের ইশারায় তুমি বদলে দিলে এক সাথে
মেধার যত চিন্তা-কল্পনা হৃদয়ের যত ক্ষত সিদ্ধ হাতে।
যত কি ও কেন আর কোথায়-কিভাবে
সমাধান করেছ তুমি এ চিরন্তন রহস্য একই জবাবে।
পরকে করলে আপন বিষে দিলে ভরে অমৃত সুধা
মুহূর্তেই গুধরে দিলে তিক্ত সম্পর্ক না রহিল পর জুদা।
কী মহা বিপ্লব, একসাথে যেথায় সব পড়ল ঝুঁকে,
কাযবীন, প্যারিস, দামেস্ক, ব্যাকন, দিল্লী হেরা সুখে।
মানবজাতির জীবনধারা হল ফের সুসংহত
উঠে গেল রক্ত-রঙের দাসত্ব মুছিল ফারাক বর্ণ-বংশগত।
মহান আল্লাহ চেয়েছিলেন মদীনাবাসীর পবিত্রতা
নিবেদিত প্রাণ যার পরে সব অনারবী বীর-বিজেতা।
তোমার প্রশংসায় সচল জবান আমার মত
তার কলমে ফোরাতের স্রোতধারা হচ্ছে প্রবাহিত।
উঁচু-নীচু সকলের তরে তোমার রহমত আম
আরশ-মাটি থেকে তোমার প্রতি দরূদ-সালাম।
ওহে জীবন্ত আত্মা আছি বেঁচে তোমার ব্যথায়
তুমি বিনে কে আছে মোদের দুঃখ শোক বলব যেথায়?
মাথায় অন্ধকার রাত ঘূর্ণিপাকে ঘরে ফৌরকার
বিপদ তরঙ্গ পদে পদে বহুদূরে মুক্তির দুয়ার।
লুটায়ে আরশের নিচে যাচ আদবের সাথে
ওহে সফলতার উৎস কেবল সত্তা তোমার।

বান্দা ভাল হোক বা মন্দ তুমি তো আল্লাহ মহান
ছিন্ন হবে কেন করুণার ধারা হে দয়ার পাথার।
আজ কেন এই ভর্ৎসনা করুণার খাছ উৎস পরে
মোদের দ্বারা কেন ফের মনোযোগিতা নড়বড়ে।

যুফার আলী খান সাহেবের কথার সাবলীলতা, ফার্সী বিন্যাসের গতি এবং শব্দমালার আবেদন শুনে মাহফিলে সমবেত লোকদের অনিচ্ছায় ইকবাল আহমদ খান সোহাইলের কথা স্মরণ হয়ে গেল। তারা উভয়ই একই বিদ্যাপীঠ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং একই উস্তাদের ছাত্র। দুজনেই তাঁর থেকে ফার্সীতে সুস্থ বিনোদনের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন। উপস্থিত লোকজন তার কাছে তার প্রসিদ্ধ না'তমূলক কবিতা, যার উৎস–

کرے تارِ شعاعی لاکھ اپنی سعی امکانی
رو ہوتا نہیں اب صبح کا چاک گریبانی

"করো নিজের সাধ্য শ্রমের লক্ষ রশ্মি তার
হবে না রিফু আজ প্রভাতের বিদীর্ণ কলার।"

এর থেকে কিছু পংক্তি শোনার আবেদন করেন। তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন। সুবোধ সমবেত সুধীমণ্ডলী এর আবেগপূর্ণ মূল্যায়ন করেন-

محمدؐ یعنی وہ حرفِ نخستیں کلکِ فطرت کا — محمدؐ یعنی وہ امضائے توقیعات ربانی
وہ فاتح جس کا پرچم اطلس زنگاری گردوں — وہ امی جس کے آگے عقل کل، طفل دبستانی
وہ رابط عقل و مذہب کو کیا شیر و شکر جس نے — وہ فارق، زہد سے جس نے مٹایا داغِ رہبانی
وہ ناطق، جس کے آگے مہر بر لب بلبل سردہ — وہ صادق، جس کی حق گوئی کا شاہد نطق ربانی
وہ عادل جس کی میزان عدالت میں برابر ہے — غبار مسکنت ہو یا وقارِ تاج سلطانی
وہ جامع، جس نے یکجا کردیئے بکھرے ہوئے دانے — منادی جس نے آکر باہمی تفریق انسانی
وہ گنجورِ معارف جس کے اک اک حرف میں پنہاں — نکات فلسفی، اسرارِ نفسی، رازِ عمرانی
وہ کشاف سرائر جس نے کھولا چند اشاروں میں — علوم اولین وآخریں کا گنج پنہانی

মুহাম্মাদ তথা স্বভাগত কঞ্চির প্রারম্ভির বর্ণমালা
মুহাম্মাদ তথা খোদায়ী ফরমান অন্তর্জ্বালা।
সেই বিজয়ী যার রশ্মি ঝাণ্ডা মুছে দিল মরিচা যত
সেই নিরক্ষর সম্মুখে যার সকল জ্ঞানী স্কুলশিশুর মত।

সেই জ্ঞান-ধর্মের সমন্বয়কারীর কী আছে প্রতিদান?
যিনি প্রভেদকারী, দুনিয়া বিমুখতা মেটালের কলঙ্ক শয়তান।
সেই বাগ্মী, সম্মুখে যার আসমানী বুলবুলের মুখে তালা
সেই সত্যবাদী, আরশী কুরআন যার সত্যবাদীতার সাক্ষীমালা।
সেই ন্যায়বিচারক, যার ইনসাফের মানদণ্ডে সদা সমান
হতদরিদ্রের লাঞ্ছনা কিংবা রাজমুকুটের অপূর্ব সম্মান।
সেই সমন্বয়কারী, বিক্ষিপ্ত অঙ্কুর দান করলেন এক সমেত
মিটিয়ে দিলেন পারস্পরিক মানবীয় যত মতভেদ।
সেই জ্ঞানের আমীর, যার এক একটি হরফে লুকায়িত,
দার্শনিক তত্ত্ব, মূল সত্তার রহস্যাবলি সামজিক তথ্য কণিকা শত।
সেই তত্ত্ববিশারদ, খুলিলেন যিনি কয়েক ইঙ্গিতে জানি
প্রবীণ-অনুজ সকল জ্ঞানীর সঞ্চিত জ্ঞানের খনি।

উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলী তাকে তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতা 'মউজে কাউসার' এর কিছু পংক্তি আবৃত্তি করার আবেদন করেন। আমির মিনায়ী এবং মাওলানা জফর আলী খানও জোর দাবী জানান। তিনি নিম্নের পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন। গোটা মাহফিল 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের' গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে ওঠে।

احمد مرسل، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم — مظہر اول، مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم
جسم مزکی روح مصور قلب محلی نور مقطر — حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
کفر کی ظلمت جس نے مٹائی، دین کی دولت جس نے لٹائی — لہرایا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم
باغ جہاں کا حارسِ نامی جس نے مٹائی رسم غلامی — پھر سے سنوارا گلشنِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم
بزم ملل تھی نظم سے خالی، بکھرے ہوئے تھے حق کے لآلی — اس نے کئے سب آکے منظم صلی اللہ علیہ وسلم
وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا — شرک کی محفل کردی برہم صلی اللہ علیہ وسلم
فرد و جماعت امر اطاعت، کسب و قناعت عفو و شجاعت — حل کئے جو اسرار تھے مبہم صلی اللہ علیہ وسلم
ربط و تصادم، طوع و تحکم فقر و تنعم عدل و ترحم — سب کے حدود بتائے باہم صلی اللہ علیہ وسلم
حفظ مراتب، پاس اخوت، سعی و توکل، رفق و فتوت — تلک حدود اللہ میں منضم صلی اللہ علیہ وسلم
ارض و سما میں آئینہ رحمت روز جزا میں سایۂ رحمت — اس کے لوائے حمد کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم
راہ میں کانٹے جس نے بچھائے گالی دی پتھر برسائے — اس پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم
فقر و غنا دونوں کا سلطاں، روح و جسد دونوں کا درماں — دین کا اور دنیا کا سنگم صلی اللہ علیہ وسلم

প্রশংসিত নবী গর্ব দু'জাহানের
প্রথম প্রতিবেদন প্রেরিত সবশেষে,
পবিত্রকায়, পূণ্যাত্মা বিদূষী অন্তর নূর ঠিকরে পড়ে,
আপাদমস্তক সুন্দর, সৃষ্টির সেরা কে সে?
মিটালেন যিনি কুফরের যুলমাত
দানিয়া দীনের দৌলত উড়ালেন তাওহীদী নিশান,
বিশ্ব অরণ্যের প্রহরী, দাসত্ব প্রথা করলেন অবসান
নতুন করে সাজালেন মানব বাগান।
পৃথিবী ছিল শৃঙ্খলা শূন্য সত্যের মুক্তা এলোমেলো
সাজালেন সবি তিনি এসে,
সংশয়ের সকল শৃংখল বাঁধিলেন এক আল্লাহর সাথে
শিরকের সমাবেশ ভণ্ডুল করে নিমিষে।
ব্যক্তি ও দল, আদেশ-আনুগত্য কামাই-অল্পে তুষ্ট
ক্ষমা ও বীরত্ব, সমাধান করলেন যত ভেদ অস্পষ্ট।
সম্পর্ক-সংঘাত, সন্তুষ্টি-আজ্ঞাদান, দৈন্যতা-ধনাঢ্যতা
ইনসাফ-অনুগ্রহ সব কিছুর আপোস বলেন সুস্পষ্টতা।
মর্যাদা রক্ষা, ভ্রাতৃত্ববোধ, শ্রম-ভরসা, নম্রতা-বীরত্ব
আল্লাহতে সুশৃংখল সকল সীমা
আকাশ মাটিতে রহমতের দর্পণ বিচার দিবসে ছায়া
তার প্রশংসার ঝাণ্ডা (নিরাপদ খিমা)।
বিছাল যে পথের কাঁটা, গালি দিল, করল পাথর বর্ষণ
তার উপর ছিটালেন শিশির ভালবাসার,
দৈন্য-ধনী উভয়ের নেতা, দেহ-আত্মা উভয়ের পথ্য
দীন-দুনিয়ার মোহনা তিনি (আশ্রয় নিরাশার)।

এরপর মাহফিলে উপস্থিত লোকজন জনাব আমজাদ হায়দারাবাদীর কাছে কিছু শোনার আবেদন করেন। যেসব লোক তার কথা শুনেছিলেন, তারা সেই কবিতা (যাতে তিনি হিজরতের ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এবং সাদাসিধে ও সততার একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন) থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনানোর আবদার করেন। জনাব আমজাদ সাহেব নিম্নোক্ত পংক্তিমালা শোনান-

چلی صحنِ کعبہ سے بادِ بہاری مدینہ کو جاتی ہے گل کی سواری
ہوئی رخصت رحمت رب باری ہر اک غم میں کرتا ہے فریاد وزاری
کوئی کہہ رہا ہے جگر کو سنبھالے ادھر دیکھ لینا ادھر جانے والے
ہے دریائے خوں چشم زمزم سے جاری سوادِ حرم میں ہے ایک سوگواری
ہر اک دل میں ہے برق سی بے قراری ہر اک کی صدا ہے کہ سن لے ہماری
نہ جا ہم سے منہ موڑ کر جانے والے یہاں کون ہم بیکسوں کو سنبھالے
صفا مروہ کا دل ہوا پارہ پارہ وہ بجلی گری پھٹ گیا سنگِ خارا
ہوا غم سے کعبہ سیہ پوش سارا تڑپ کر یہ غارِ حرا نے پکارا
کہاں تو چلا میرے نازوں کے پالے پھر آمیری آغوش میں جانے والے

কা'বার আঙ্গিনা থেকে বইছে বসন্ত হাওয়া
চলছে পুষ্পযান মদীনার পথে,
বিদায় নিয়েছে মহান প্রভুর রহমত
কাঁদিছে সবাই বিরহ মনোরথে।
বলছে যেন কে, প্রাণ সামলে নাও
সে পথের পথিক এদিকে তাকাও!
যমযম কূপ থেকে বইছে রক্ত সাগর
হারামের কোমল ঘাসে এক শোকাতর।
বিজলীর মত ব্যাকুলতা সবার মনে
আক্ষেপ সবার যাও কথা মোর শুনে।
হে অভিযাত্রী, যেও না মোদের ভুলে
মোরা অসহায়, কে এখানে নেবে তুলে।
ফেটে হল চৌচির সাফা-মারওয়ার দিল
বিদ্যুৎ সে নিপতিত প্রস্তরখণ্ড কষ্টে নীল।
বাতাস যেন কা'বা ভ্রমণ ছেড়েছে ব্যথায়
হেরা গুহাকে ডাকছে কাতর হেথায়।
বলছে, মোর গর্বপুরুষ তুমি যাচ্ছ আজি
এসো ফিরে আমারই কোলে (হয়ে বীর-গাজি)।

এরপর মানুষের নজর গিয়ে পড়ে হাফিয জলন্দরীর ওপর। সমবেত শ্রোতামণ্ডলী ইসলামের শাহানশাহের সালাম শোনানোর আবদার করেন, যা আম-খাস সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। হাফিজ তার কয়েকটি পংক্তি চিত্তাকর্ষক ও প্রভাবময় ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেন। অমনি গোটা মাহফিল নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی
سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی
سلام اے ظل رحمانی، سلام اے نورِ یزدانی
ترا نقشِ قدم ہے زندگی کو لوحِ پیشانی
سلام اے سر وحدت اے سراج بزم ایمانی
زہے یہ عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی
ترے آنے سے رونق آگئی گلزار ہستی میں
شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی
سلام اے صاحب خلق عظیم انساں کو سکھلائے
یہی اعمال پاکیزہ یہی اشغالِ روحانی
تری صورت، تری سیرت تر نقشۂ ترا جلوہ
تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی
اگر چہ فقر فخری رتبہ ہے تیری قناعت کا
مگر قدموں تلے ہے فر کسرائی وخاقانی
زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا
بہت کچھ ہوچکی اجزائے ہستی کی پریشانی
زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہوجائے
ترے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرہ کو تابانی
حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے دامن دولت
عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی
ترا در ہو، مرا سر ہو، مرا دل ہو، ترا گھر ہو
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی
سلام اے آتشیں زنجیر باطل توڑنے والے
سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے

সালাম ওহে আমেনার ধন, খোদার প্রিয়
সালাম হে সৃষ্টিকূলের গর্ব বিশ্ব মানবের গৌরব,
সালাম হে দয়াময়ের ছায়া আসমানী নূর
তোমার পদাঙ্ক জীবন ললাটের মোহনীয় সৌরভ।
সালাম হে একত্বের ভেদ ঈমানী চেতনার দীপশিখা
সম্মান বাড়ালেন কোথাও, আগমন সহজ বেশ,
তোমার শুভাগমনে ফুলে ফুলে ছড়াল মাধুরী
সহযোগী ভাগ্যবান খোদার করুণায় ভরিল অবশেষ।
সালাম হে মহামানব উত্তম চরিত্র শিখালে মানুষেরে
এই তো পুণ্যকর্ম, এই তো আত্মিক মিশন,
তোমার রূপকায়া, চরিত্র মাধুরী, নকশা, উজ্জ্বলতা
মুচকি হাসি, কথোপকথন, মানবসেবা, হাস্যমুখ-নয়ন।
তোমার অল্পে তুষ্টি দীনতা যদিও গর্বের কাজ
পদতলে তবু রোম পারস্যের তখ্ত-তাজ
নতুন শৃঙ্খলাবন্দীর প্রতীক্ষায় আজ যুগ-সময়
কেটেছে তাঁর বহু দুঃখ-শোক দুঃসময়।
মাটির পরতে পরতে ভরে যাবে নূরের ঝলক
রশ্মিতে তব অনুকণা সব আলোময় অপলক।
অসহায় হাফিজও আছে রিক্ত হস্তে ভিখারীজন
প্রেমের ললাট তব মহানুভবতায় নূরের প্রস্রবণ।
তোমার মূল্য, আমার মাথা, এ হৃদয় তোমার ঘর
ছোট্ট একটু আশা আর ভূমিকা দীর্ঘ কলেবর।
সালাম লও হে অগ্নিপূজক বাতিলের শৃঙ্খল ছিন্নকারী
সালাম ওহে মাটির ভাঙা মন জোড়াদানকারী।

হাফিযের পর শ্রোতামণ্ডলীর দৃষ্টি পড়ে মাহের কাদেরী সাহেবের প্রতি। লোকজন তার কাছে তার সেই প্রসিদ্ধ না'তমূলক কবিতা আবৃত্তির আবেদন করেন। যাতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে মুহসিনে আলম (বিশ্বজগতের ত্রাতা) এর বিশ্বব্যাপী অনুগ্রহ-দান এবং মুহাম্মাদ (সা) -এর শুভাগমনের বৈপ্লবিক চিত্র অংকন করা হয়েছে। যাতে জোরালো কবিত্ব ও চমৎকার বাচনভঙ্গির সাথে কোথাও ঘটনার বৃত্তান্ত ও সত্যতার আচল হাতছাড়া হয়নি। মাহের সাহেব আবেদন রক্ষা করেন এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

کچھ کفر نے فتنے پھیلائے کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے
سینوں میں عداوت جاگ اٹھی انسان سے انساں ٹکرائے
پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے
جب ظلم وستم حد سے گزرے تشریف محمدؐ لے آئے
رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں بر آئیں
اکرام وعطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے
تہذیب کی شمعیں روشن کیں، اونٹوں کے چرانے والوں نے
کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے
اللہ سے رشتہ کو جوڑا، باطل کے طلسموں کو توڑا
خود وقت کے دھارے کو موڑا طوفاں میں سفینے تیرائے
تلوار بھی دی، قرآں بھی دیا، دنیا بھی عطا کی عقبیٰ بھی
مرنے کو شہادت فرمایا جینے کے طریقے سمجھائے
مکہ کی زمیں اور عرش کہاں دم بھر میں کہاں پل بھر میں کہاں
پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے
مظلوموں کی فریاد سنی، مجبوروں کی غم خواری کی
زخموں پہ خنک مرہم رکھے، بیچین دلوں کے کام آئے
عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا غازہ بھی بخشا
شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے
توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا
کفار بہت کچھ جھنجھلائے شیطاں نے ہزاروں بل کھائے
اے نام محمدؐ صلی علی ماہرؔ کے لئے تو سب کچھ ہے
ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے

কত কুফর ফিৎনা ছড়াল, জ্বালিল আগুন জুলুম-লড়াই
তেতে ওঠে শত্রুতা বুকে, মানুষে মানুষে লড়াই।

দুর্বলেরে নিষ্পেষিত নির্বাসিত করেছে সবল জাতি
আখের এলেন ধরায় যখন জুলুম-শোষণ আত্মঘাতি।
তরঙ্গায়িত হল রহমতের ধারা পৃথিবীর পুরিল আশা
দান-সম্মানের বৃষ্টি হল, চারিত্রিক মুক্তার হল বরষা।
জ্বালিয়েছে সভ্যতার প্রদীপ ছিল যারা উটের রাখাল
লভিল কাঁটা পুষ্পমূল্যে চমকাল যত ধূলি মাকাল।
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক জুড়িল, ভাঙিল বাতিলের যাদুগরি
ঘুরালেন স্বয়ং সময়ের গতি, ভাসালেন তুফানে তরী।
দিলেন অসি-কুরআন দানিলেন দুনিয়া-আখেরাত
মৃত্যু সে তো শাহাদাত, বুঝালেন বাঁচার সওগাত।
মক্কার মাটি আর আরশ, কোথায় মুহূর্তে, কোথায় পলকে
দানিলেন পাথরে বাকশক্তি দ্বিখণ্ডিত চাঁদ মুজিযার ঝলকে।
শুনেছেন মজলুমের ফরিয়াদ সহানুভূতি জানান অসহায়ের
জখমে লাগান শীতল মলম সহযোগী অস্থির-বিষণ্ন প্রাণের।
নারীকে দিলেন লজ্জা ভূষণ আত্মমর্যাদার প্রসাধন
আনিলেন দর্পণে কোমলতা, করিলেন কত অসাধ্য সাধন।
রুখতে পারেনি তাওহীদের গতি, পারেনি নোয়াতে ইসলামী ঝাণ্ডা,
কাফিরের দল করল জ্বালাতন, শত শক্তি দেখিয়েছে শয়তান পাণ্ডা।
হে মুহাম্মাদ নাম তোমায় দরূদ সালাম তুমিই সব মাহেরের,
ঠোঁটে মুচকি হাসি, দু'চোখে নীর বিরহে পিতা আবু তাহেরের।

বড় বড় জননন্দিত কবিদের মুখ থেকে এসব নির্বাচিত না'তে রাসূল (সা) শুনে অলৌকিকভাবে উপস্থিত লোকজনের মনে সাহেবে মদীনার সাথে মদীনার কথা স্মরণ হয়ে যায়। যা সেখানে হাজির ছিল। তাদের পুরোনো ক্ষত নতুন করে জীবন্ত হয়ে উঠল। যাদের আজও সেই সৌভাগ্য লাভ হয়নি, তাদের ভেতর সেখানে হাজির হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা উদ্বেলিত হতে থাকে। এই সুবাদে লোকজনের দৃষ্টি পড়ে হামীদ সিদ্দীকী সাহেবের ওপর, যিনি বহুবার মদীনায় হাজির হওয়া এবং এই হাজির হওয়ার যাতায়াত বৃত্তান্ত বারবার শোনানোর কারণে 'যায়েরে হারাম' বা হারাম যিয়ারতকারী নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। লোকজন তার কাছে তার স্বরচিত এমন কোনও কবিতা শোনানোর আবেদন করেন, যাতে সেখানে হাজির হওয়ার আনন্দ ও বিচ্ছেদ বিরহের বিবরণ রয়েছে। মানুষের জোর পীড়াপীড়িতে তিনি মঞ্চে উঠে আসেন এবং নিজের চিত্তাকর্ষক ও জ্বালাময়ী ভঙ্গিতে স্বরচিত নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

وہ عجب سماں تھا جدا ہوئے تھے جو آستانِ حضور سے
بصد اضطراب درود پڑھنا مرا وہ کیف وسرور سے
کبھی جالیوں کے قریب سے کبھی ہٹ کے سامنے دور سے
وہ نظر نواز تجلیاں وہ سکوت دل وہ سکونِ جاں
یہ کسے مجال ملا سکے جو نظر کو پردۂ نور سے
وہ خنک نسیم وہ صبح دم، وہ اذاں کے نغموں کا زیروبم
جسے دیکھئے وہ کھڑا ہے شوق میں محو ذکر حضور سے
کرم اور کرم کی وہ بارشیں، وہ عنائتیں وہ نوازشیں
جو کسی کو جلووں کی تابشیں، نظر آئیں حجلۂ نور سے
کبھی مجھ کو محو نہ کرسکے یہ رباب وچنگ کے زمزمے
کہ دل اپنا مست ہے باغ طیبہ کے نغمہ ہائے طیور سے
ہے میری نگاہ میں آج بھی وہ دل کشی شب ماہ کی
وہ فضا میں چھٹکی ہے چاندنی جو ضیائے قبۂ نور سے
مجھے بیر غرس کی چاہ ہے مری تشنگی ہی گواہ ہے
یہ وہ تشنگی نہیں تشنگی جو بجھے شراب طہور سے
جبل احد کے نظارہ کی ہے نگاہِ شوق کو آرزو
نہ خیال باغ نعیم کا، نہ ہے ذوق منظر طور سے
کبھی زائرین حرم اگر، سوئے دشت بدر بھی ہو گزر
تو سلام کہنا مری طرف سے وہاں کے اہل قبور سے
کہوں کس سے رازِ غم نہاں کہ ہے اشک آنکھوں سے کیوں رواں
وہ سکون قلب نہیں یہاں جو وہاں تھا قرب حضورؐ سے
جو تڑپ حمیدؔ ہے آج کل اسی دھن میں آئے مجھے اجل
مرے لب پہ ہوگی یہی غزل جو اٹھوں گا شور نشور سے

চলেছি যবে সুরভী ও আলোর দেশে ছিল সে এক আজব লগন
বড় বিস্ময়কর প্রস্থান সে দরবার বিরহে কাঁদে হৃদয় গগন।
শত ব্যথা নিয়ে পড়েছি দরূদ কি যে আনন্দ কি যে সুখ!
কভু কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে কভু সরিয়া সম্মুখ।
সেই নয়নাভিরাম আলো প্রভা প্রশান্ত মন-প্রাণ
মিলাতে পারে তা কোন শক্তি, পাছে নূরের আবরণ।
সেই শীতল হাওয়া প্রভাতী বায়ু আযানের সুরতরঙ্গ
দেখবে তারে দাঁড়িয়ে অধীর স্মরণে নবীর কাতর বিহঙ্গ।
দয়া-অনুগ্রহের বারিধারা অনুরাগ-দান সবার তরে
কারও তা দীপ্তিপ্রভা, দেখবে আলো সজ্জিত ঘরে।
বেহাল ঘন্টির যমযম কভু রহিত করেনি মোরে
এমন মাতোয়ারা পাক মদীনার বিহগের সঙ্গীত সুরে।
এই নয়নে আজো সেই মনোহর রাতের ছায়া
নূরানী গম্বুজ থেকে ঠিকরে পড়ে চাঁদের জ্যোৎস্নামায়া।
'বীরে গারস' চাই আমার, সাক্ষী সেই তৃষ্ণা মোর
এ নয় সে পিয়াস, পাক শরাবে হয় যা দূর।
উহুদ পাহাড়ের দৃশ্যপট দেখিতে চায় এ প্রেমের আঁখি
না চায় রত্ন উদ্যান, নয় আগ্রহী তূর পর্বতে ওগো সাকী!
কভু যদি যাও হারামের অনুরাগী বদর প্রান্তরের পাশ দিয়ে
জানিও মোর দরূদ-সালাম পূণ্যময় সমাধির শিয়রে দাঁড়িয়ে।
বলব কারে সুপ্ত ব্যথা কেন দু'চোখে অশ্রু ঝরে
নাই সে মনের সুখ ছিল, যা প্রিয়নবীর কবর পরে।
আজ হামীদের যে ব্যথা, কাল যেন তায় হয় গো মরণ
এ গজল থাকবে ওষ্ঠাধরে, খুলবে যবে হাশর তোরণ।

শূরে নুশুর শব্দ শুনে জনাব নুশূর ওয়াহেদী'র কথা স্মরণ হয়। কিছু লোক যারা তার "কাহুনাহ গালীমে তাজা পায়ামে" শুনেছিলেন– তারা নিবেদন করলেন, তিনিও যেন মঞ্চে আসেন এবং শূরে নুশূর তথা কিয়ামতের চিৎকার দ্বারা এই মাহফিলে সতেজতা ও আনন্দ সৃষ্টি করে দেন। তিনি দীর্ঘক্ষণ যাবৎ আদবের সাথে নামাযের সুরতে জড়োসড় হয়ে বসেছিলেন। নুশুর সাহেব তার বিশেষ ছন্দ নান্দনিকতার সাথে নিম্নোক্ত না'ত আবৃত্তি করলেন-

ذکر اس کا ہے اور باچشم پرنم نازاں ہے جس پر تاریخ آدمؑ
ایمان مطلق ارشادِ محکم نور مجسم، جانِ دو عالم

روحِ ہدایت احمدؐ بہ نامے
یثرت مقامے، بطحا خرامے

ابھرا ہے جب سے ہستی کا تارا طوفاں بکف ہے عالم ہی سارا
بے سود کشی، جھوٹا کنارا ختم رسل کا بس اک سہارا

ذات رفیقش، خاصے بہ عامے
کہنہ گلیمے، تازہ پیامے

ہوتا نہیں گر فیض الستی دنیا اجڑ کر شاید نہ بستی
ظل نبی سے یہ نور ہستی جس نے مٹائی باطل پرستی

مہتاب دستے، خورشید گامے
صبحش چہ صبحے، شامش چہ شامے

نغمہ جنوں نے گایا نہیں تھا رمز نبوت پایا نہیں تھا
خلوت میں کوئی آیا نہیں تھا جلوہ تھا، لیکن سایا نہیں تھا

صدیق اکبرؓ قائم مقامے
در دین احمد، اول امامے

خاموشیوں میں اعلانِ ایماں کوئے طلب میں سروِ چراغاں
شمشیر عریاں تدبیر رخشاں تقویم عالم، قیوم دوراں

فاروق اعظمؓ مردِ عوامے
حرفے جدیدے، نقشے دوامے

عثمانیت ہے غم کوش رہنا صبر ورضا میں پر جوش رہنا
جس نے سکھایا ذی ہوش رہنا خنجر کے نیچے خاموش رہنا

خوں در گلوئے قرآں بہ کاے
محوِ کلام وخود لاکلاے

جسم علیؓ میں تھی جانِ کامل علم وعمل کی اک شانِ کامل
ایمانِ کامل عرفانِ کامل نانِ جویں اور انسانِ کامل

আশাভরা অঙ্গীকার আর স্মৃতিচারণ তার
গর্বিত মানব ইতিহাস যার পরে,
শর্তহীন বিশ্বাস, সুদৃঢ় আদেশ নূরানীকায়
দু'জাহানের (কে আর এমন বিশ্ব চরাচরে?)
পূণ্যাত্মা প্রশংসিত নাম
মক্কায় বিচরণ, মদীনা তার মাকাম।
সেকালে যবে আসিলেন এ মহামানব
উঠিল বাঁধার ঝড় বিশ্ব জুড়ে।
নিষ্ফল কুস্তি, মিথ্যে দূরত্ব শেষনবীর
কেবল এক ভরসা (কোন সে দূরে)!
তার সত্তা প্রিয়তম অনুপম সবার তরে জানি,
পুরনো কম্বল, সজীব প্রাণবন্ত বাণী।
না হত যদি তোমার আবির্ভাব
বিশ্ব জুড়ে হয়ত থাকত না কেউ,
নবীর ছায়ায় এই আলোকিত মানব
মেটালেন যিনি মূর্তিপুজা কুফরের ঢেউ।
চন্দ্রহাত, সূর্যচরণ, তার প্রভাত–
সে কি! মহাবিস্ময় তার সন্ধ্যারাত!
গায়নি পাগলামী গান
পায়নি নবুওয়াতের রহস্যভেদ,
নির্জনতায় আসেনি কেউ
আলো ছিল, না ছায়া সফেদ।
সিদ্দীকে আকবর যার কায়েম মাকাম
মুহাম্মাদী দীন ধর্মের প্রথম ইমাম।
নীরবে হয় ঈমানের ঘোষণা
কণ্ঠে অসীম দৃঢ়তা শত প্রদীপের সমাহার,
বেদুঈনের অসি দীপ্তিমান কৌশল
বিশ্বের স্থপতি যুগশ্রেষ্ঠ (উপমা কি তাহার)?

ফারুকে আযম জনতার প্রিয়জন
ভাষা নতুন, বর্ণ-নকশা চিরন্তন।
উসমানী গুণ দুঃখ সংবরণ
ধৈর্য-খোশে উর্মি হবে,
শেখালেন যিনি সচেতনতা
খঞ্জরের নিচেও নীরব রবে।
কণ্ঠে দৃঢ়তা কুরআন কর্মকাজ
মোহিত বাণী নির্বাক সে মানবরাজ।
ছিল আলীর মাঝে কামেল প্রাণ
ইলম-আমলের এক পূর্ণাঙ্গ রূপ,
পূর্ণ ঈমান, পূর্ণ আত্মশুদ্ধি
যবের রুটি কামেল মানুষের স্বরূপ।
আগ্রহ অসীম-মহান চিন্তা গভীর, খাঁটি
পকেটে অপূর্ব সুগন্ধি কাওছার ভরা পেয়ালাবাটি।
ঈমানের আলো জ্বলছে ফের
বিশ্ব কাঁপে থরথর,
চলছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি
কা'বার পাশে মানুষ ভরভর।
জাগায় জাগায় একের পর এক দলে দলে
মুসাফির কাফেলা চলছে কা'বার ছায়াতলে।

অবশেষে শ্রোতামণ্ডলীর যেহেনে জনাব আযীয সফীপুরীর ফারসী না'তের কথা মনে পড়ল। যার উৎস হল-

کشت بے تیغم بعشوہ ترک نازک پیکرے خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے

এসময় একজন রুচিশীল আগ্রহী ব্যক্তি স্মরণ করিয়ে দিলেন, মাওলানা মুহাম্মাদ ছানী হাসানী সাহেব উর্দু ভাষায় এ বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে এই মাহফিল সমাপ্ত করা হবে। স্পিকার মুহাম্মাদ ছানীর সামনে আসে। তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন-

خاک کا یہ ذرہ ذکر مہو شان کیسے کرے
یشق کے راز نہاں کو یہ عیاں کیسے کرے
مدح آقا کی گدائے بے نشاں کیسے کرے
مشک سے دھوئے زبان کو پھر بیان ایسے کرے
کشت بے تیغم بعشوہ ترک نازک پیکرے
خوش بیانے مہربانے جان جانے دل برے

نعت کہتاہوں تری آقائے من شاہ زمن
نام پیارا کتنا تیرا پاک تن پاکیزہ من
خندہ رو، روشن جبیں، غنچہ دہن شیریں سخن
بکہت زلف معنبر پر فدا مشک ختن
یاسمن رشک سمن جانِ چمن یاجان من
آشنائے دلربائے خود نمائے خود سرے

تو ہے بحر بیکراں اور میں ذرا سی آبجو
اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو
مرحبا صلی علی جان جہانِ رنگ وبو
قیصریت تیری آمد سے ہوئی زرد رو
کفر سوزے دل فروزے خوب رو آہستہ خو
پاک دینے پاک بینے خوشتر از ہر خوشترے

اختر تاباں کہوں یا مہ کامل تجھے
میں کہوں کون ومکاں کی جان یا پھر دل تجھے
میں سمجھتا ہوں نشان جادۂ ومنزل تجھے
دل کھچیں بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے
ناز بینے مہ جبینے دل کشے یا دل کشے
جان گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے

کوچہ جاناں گئے تو بن کے دیوانہ گئے
بادۂ عشق ومحبت پی کے مستانہ گئے
صبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانہ گئے
نعت یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے
شادۂ آزادۂ مستانہ جانا نہ
مست چشمے دیر خشمے طرفہ زیبا منظرے

اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دلعزیز
تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل وتمیز
تیرے در کی خاک ہی سرمہ بنانے کی ہے چیز
توڑنا دم تیرے در پر جان ودل سے ہے عزیز
بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز
دل برد جاں آورد ہر دم بطرز دیگرے

কিভাবে এই ধূলিকণা করে মহানের আলোচনা?
প্রেমের রহস্য কিভাবে করিবে প্রকাশ?
মনিবের প্রশংসা কি করবে আনাড়ী ভিখারী
মেশক দ্বারা ধুয়ে রসনা পেতে পারে সে অবকাশ!
মরেছি আমি অসি বিনে হেরি তোমার অপূর্ব সুশ্রী মুখ
মহানুভব তুমি প্রাণের প্রাণ প্রেমাস্পদ মনে আজ অপার সুখ।
তব স্তুতি গাই ওহে মনিব যুগশ্রেষ্ঠ জন
কত যে প্রিয় নামটি তোমার পবিত্র সে তনুমন।
হাসিমুখ, দীপ্ত ললাট, পুষ্পচেহারা মিষ্টি বচন
চুলের গোছার সুবাসে আম্বর যেন নববধূর মেশকে জুড়ায় মন।
হে ঈর্ষার সমন, পুষ্পিত হৃদয় জমি, ওহে প্রিয়তম,
প্রেমাস্পদের ভালবাসা চির অম্লানা স্বচ্ছ সত্যসম।
তুমি অকুল দরিয়া, আমি অতি ক্ষুদ্র ঝিল
আপাদমস্তক দীপ্তিমান তুমি দু'জাহানের সম্মান।
সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ, রং ও সুরভীর প্রাণ
আগমনে তোমার ধূলিস্যাৎ পারস্য-ইরান।
কুফর ধ্বংসকারী, মনজয়ী, সদাচারী, নম্র চলন
পবিত্র ধর্ম, পুতঃদৃষ্টি, সকল ভালর চেয়ে ভালজন।
বলব কোথায় উজ্জ্বল নক্ষত্র নাকি পূর্ণিমা চাঁদ
কাওন ও মাকানের প্রাণ নয়ত মন আযাদ।
আমি বুঝি তোমায় পথ ও গন্তব্যের দিশা
অকৃত্রিম মন কেড়ে নেয় তব আকর্ষণ ভেদি অমানিশা।
কমনীয় দৃষ্টি চন্দ্র-কপাল মনোলোভা মনোহর
কোমল প্রাণ, চিত্তাকর্ষক নক্ষত্র মুক্তা-গওহর।
হয়েছি পাগলপারা প্রেমাস্পদের মহল্লায় গিয়ে
হয়েছি মাতোয়ারা এশক-প্রেমের শরাব পিয়ে।
তৃপ্তি আসেনি মোর, প্রত্যেহ গেলাম তাই।
অজান্তে অনিচ্ছায় এ না'ত আমি গেয়ে যাই।
সুখী স্বাধীন প্রেমাস্পদের কত পাগলপারা
নয়নবিভোর, দীর্ঘ উত্তেজনা, বিরল সুন্দর দৃশ্যভরা।
ওগো মহান চরিত্রধারী তুমি যে সবার প্রায়প্রিয়
তোমার উসিলায় দানিয়াছেন প্রভু বুদ্ধিজ্ঞান মানবীয়।

তব দুয়ারের মাটি যে এ গোলামের সুরমা আদরনীয়
দুয়ারে তোমার জীবন দান মন-প্রাণের চেয়েও প্রিয়।
প্রিয়তম হে দু'চোখ মোর অশ্রুসজল কষ্ট অতি বুকে
প্রতিটি নিঃশ্বাসে গাই তব গান অপূর্ব অপার সুখে।

রাত অধিক হয়ে গিয়েছিল। সৃজনশীল মেজবান এই আলোকিত মাহফিল সর্বশেষ প্রশংসামূলক কবিতার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত করলেন, যা ছিল এই মাহফিল সমাপ্তির জন্য অত্যন্ত গুরুত্ববহ। এই কবিতা প্রসিদ্ধ ফারসী পংক্তি- "আল্লাহর পরে আপনিই শ্রেষ্ঠ। ব্যাস" এর মত যথার্থ পূর্ণাঙ্গ ও চূড়ান্ত এবং স্বকীয় সাহিত্যালঙ্কারের পাশাপাশি এমন সত্যতা ও ঘটনাবহুল, যাতে বড় থেকে বড় সচেতন ও সুদক্ষ সাহিত্য পণ্ডিতেরও কলম ধরার অবকাশ নেই। এটি আসি গাজীর পূর্ণ কবিতা। যার মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক এই সাহিত্য সভা সমাপ্ত হয়েছে। আর উপস্থিত লোকজন তা আবৃত্তি করতে করতে ফিরে গেছেন নিজগৃহে। কবির ভাষায়–

صبا یہ جاکے تو کہو مرے سلام کے بعد
کہ تیرے نام کی رٹ ہے خدا کے نام کے بعد

ওহে পুবালী হাওয়া, বলো গিয়ে
তুমি জানিয়ে মোর সালাম,
মহান আল্লাহর নামের পরে
আজ মুখে মুখে তোমারই নাম।

সমাপ্ত